কুয়াশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

ভলিউম ৩

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

ভলিউম ৩

সেবা প্রকাশনী

কুয়াশা ৭, ৮, ৯

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুয়াশা ৭

এক

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সকাল ন'টা বেজে পঁয়ত্রিশ। ঢাকা এয়ারপোর্টে সগর্জনে ল্যাণ্ড করলো একটা বৃহদাকার পি. আই. এ. জেট বিমান। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে লাগলো যাত্রীরা। বাইরে নানা বয়সের নারী-পুরুষ অপেক্ষা করছে। বিমান থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় আসাদুজ্জামানের চোখ-মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে দেখলো অদূরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে তার ভাই, বোন, ছোটো চাচা, বন্ধু শফি আর পুরানো চাকর হায়দার। মাকে দেখা গেল না। বোধহয় ভিড়ের আড়ালে পড়ে গেছেন।

তিন বছরের জন্যে বিলাতে গিয়েছিল জামান। কেমিস্ট্রিতে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী নিয়ে সবেমাত্র আজ সে দেশের বুকে ফিরে এলো।

এই যে তোমরা সব...জামান হাসিমুখে এগিয়ে যায়। ছোটো বোন লিলির মাথায় হাত দিয়ে আদর করে। সালাম করে বড় ভাই কামরুজ্জামানকে আর ছোটো চাচাকে। বন্ধু শফি হাসতে হাসতে বলে, 'তোর স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়েছে জামান। এখন তোকে আর ঝুলের লাঠি বলে কেউ ঠাট্টা করতে পারবে না।'

'রঙটাও বেশ ফর্শা ধবধবে হয়েছে...' কামরুজ্জামানের কথার স্বরে স্নেহের আভাস। বলেন, 'এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চল...গাড়িতে গিয়ে ওঠা যাক্।'

মা তাহলে আসেননি। জামানের অভিমান উথলে উঠলো।

তিন বছর ধরে মাকে দেখবে বলে এই মুহূর্তটির জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে সে অথচ মা এয়ারপোর্টেই এলেন না। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে, 'মা ভালো আছেন তো?'

সহসা কেউ একথার জবাব দিলো না। লিলি চোখ ফিরিয়ে নিলো। কামরুজ্জামানের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো শফির। ছোটো চাচা কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠলেন।

অবাক হয়ে জামান বললো, 'তোমরা কথা বলছো না কেন? মায়ের কি অসুখ?'

কামরুজ্জামান বললেন, 'না, মা ভালোই আছেন।'

'তাহলে তিনি এলেন না যে?'

বিব্রত হয়ে উঠলেন কামরুজ্জামান। কি বলবেন ভেবে আমতা আমতা করতে লাগলেন। শফি বললো, 'জামান, আগে বাড়ি চল···সব কথা শুনবি!'

'তার মানে?'

জামান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু একটা দুঃসংবাদ আঁচ করে তার বুক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। সে বলে, 'ছেলেমানুষী করো না তোমরা। মায়ের কি হয়েছে বলো।'

ওরা গাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। কামরুজ্জামান বলেন, 'আসাদ, তুই গাড়িতে ওঠ···সব বলছি।'

ছোটো চাচা বললেন, 'হ্যাঁ, জামান, তুই গাড়িতে আগে ওঠ। কামরু তুই গাড়ি চালা। আমি আসাদকে সব কথা বুঝিয়ে বলছি।'

'না, না···তুমি ওকে ঠিকমতো বলতে পারবে না। তুমি খামোকা ওকে খেপিয়ে দেবে···'

ছোটো চাচা বললেন, 'তুই মিথ্যে ভয় করছিস কামরু। আসাদ ভেঙে পড়ার ছেলে নয়। সব কথা তাকে খুলে বলাই উচিত।'

এই প্রথম দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লো কামরুজ্জামানের চোখ থেকে। লিলি অনেকক্ষণ আগে থেকেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'আজিমপুর হয়ে যা···' ছোটো চাচা শান্ত কণ্ঠে বললেন। কামরুজ্জামান নিঃশব্দে চোখ মুছে অনেকটা শান্ত হয়ে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসেন। পাশে লিলি। পেছনে ছোটো চাচা, জামান আর শফি।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

জামান সবই আন্দাজ করতে পারলো। তার বুক ভেঙে গেল দারুণ দুঃখে। মা নেই। মা মারা গেছেন!

কিছু বলতে হলো না। তার বুক ঠেলে উঠতে লাগলো কান্না।

ছোটো চাচা বলেন, 'মা তো তোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসতে পারলেন না জামান, তুই-ই চল মায়ের কবর জিয়ারত করবি।'

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো জামান। কেউ বাধা দিলো না। শফি শুধু জামানের হাতটা চেপে ধরে। কান্না চেপে কোনমতে জামান বলে, 'মায়ের অসুখের কথা আমাকে জানালে পারতে।'

'আসাদ···'

ছোটো চাচার গলা খশখশ করে উঠলো. 'তোর মায়ের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

তার মাকে খুন করা হয়েছে।'

গাড়িটা বাঁক ঘোরার সময় আর একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগতে লাগতে কোনরকমে বেঁচে গেল। জামানের শরীরের সব ক'টা ইন্দ্রিয় তছনছ হয়ে গেল একটা তীব্র যন্ত্রণায়। সে প্রথম চমকে উঠলো, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইলো।

ছোটো চাচা নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে যান, 'মাস দুই আগের কথা। সেদিন শুক্রবার। সকালবেলা লিলি তোর মায়ের ঘরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। উত্তর দিকের জানালার শিক গলানো। ঘরে কেউ নেই। বাড়ির সর্বত্র খোঁজা হলো। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবার কাছে খোঁজ খবর নেয়া হলো। তোর মাকে পাওয়া গেল না। অনুমান করা হলো জানালার শিক গলিয়ে ভেতরে যে বা যারা ঢুকেছিল এটা তাদেরই কীর্তি। সারা বাড়িতে শোকের ঝড় উঠলো। ঠিক এর দু'দিন পর তোর মায়ের মৃতদেহ পাওয়া গেল গুলশান এলাকার একটা বিলের ধারে। সারা শরীর কাটাচেরা, রক্তাক্ত।'

জামান মাথাটা এলিয়ে দেয় পেছনের গদিতে। সভয়ে তার কাঁধ চেপে ধরলো শফি। জামান বাধা দিলো না। কয়েক মিনিট মৃতের মতো পড়ে রইলো পিছনে হেলান দিয়ে। গাড়ি ছুটে চলেছে হাতিরপুলের উপর দিয়ে। কামরুজ্জামানের হাত দুটো একবার কেঁপে উঠলো।

চোত মাসের রোদ, এরই মধ্যে চারদিকে ধবধব করছে। গাড়ি এসে থামলো আজিমপুর গোরস্তানের গেটে। নিঃশব্দে সবাই নেমে এলো গাড়ি থেকে। জামানকে শফি ধরতে যাচ্ছিলো। জামান অস্থির গলায় বললো, 'I am all right. Shafi. Please don't worry.'

বোরকা পরা ক'জন মহিলা গেটের পাশে কোরান শরীফের আয়াত পাঠ করছে। দুজন বুড়ো ভিখারী ভিক্ষা চাইছে আল্লার নামে। লোবান আর আতরের গন্ধ পাওয়া গেল। রোদের ভেতরে ছোটো বড় অসংখ্য কবর সারা পরিবেশটাকে বিষণ্ণ আর নির্জন করে তুলেছে।

হাত তুলে সবাই দোয়া প্রার্থনা করলো হতভাগিনী মায়ের জন্যে। জামান কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মায়ের মিষ্টি-হাসির স্নেহ-ভরা মুখটা স্মরণ করলো। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে আস্তে আস্তে বললো, 'মা, তোমার খুনের প্রতিশোধ আমি নেবোই। তোমার নামে প্রতিজ্ঞা করলাম।'

দুই

শফি বিকেল পর্যন্ত জামানের সঙ্গে থাকলো। তারপর সে অস্থির হয়ে উঠলো ফেরার জন্যে। লিলি বললো 'শফি ভাই, তুমি না হয় আমাদের এখান থেকেই কিছুদিন অফিস

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

করো। তুমি কাছে থাকলে ভাইয়া একটু সুস্থির থাকবে।'

শফি প্রায় বলতে যাচ্ছিলো সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলায়। বলে, 'না লিলি আমার পক্ষে রাতে এখানে থাকা সম্ভব হবে না। আমি বরং রোজই একবার করে আসবো।'

কথাটা রূঢ় শোনালো। লিলি আর কিছু বললো না, পাশের ঘরে চলে গেল। জামানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শফি রাস্তায় নামলো। বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে। গুলশানের আকাশে গোধূলির রঙ লেগেছে। গত রাতের কথা ভেবে মন তার চঞ্চল হয়ে উঠলো।

গত রাতে যে তার ঘরে এসেছিল তাকে চিনতে পারেনি শফি। অবশ্য অতো অল্প সময়ে কাউকে চেনা সম্ভবও নয়। লোকটা ছিলো আপাদ-মস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা। সে চুপি চুপি ঘরের ভেতর ঢুকলো। কি করে দরজা খুললো আল্লা মালুম। বই পড়ছিল শফি, মুখ তুলে তাকিয়ে কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটাকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। লোকটা ধীর গলায় শফিকে চেঁচামেচি করতে নিষেধ করলো। পকেট থেকে বের করলো লম্বা একটা খাম। খামটা সে টেবিলের উপর রাখলো। তারপর বললো, 'শফি, যে তোমার উপকার করে, কখনো তার অনিষ্ট করো না। চলি, গুডনাইট।'

শফি কিছু বলার আগেই লোকটা ঘর ছেড়ে চলে গেল। লোকটা কে তার কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল শফি। সে হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো। সংবিৎ ফিরে আসার পর সে উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো। ভয়? না ছোটবেলা থেকে রহস্যের সাথে তার পরিচয় আছে। তার জীবনই একটা রহস্য। ভয় সে সহজে পায় না।

গুলশানের আকাশে গোধূলির রঙ লেগেছে। বড় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ায় শফি। গত রাতের ঘটনার কথা ভেবে মন তার চঞ্চল হয়ে উঠলো। আজ রাতে তার জীবনের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু তার ঘরে আসবে। খামের চিঠিতে সেই কথাই লেখা ছিলো। শফি স্কুটারে চেপে বসে। ঢাকেশ্বরী কলোনি যাবে। স্কুটার উদ্দাম বেগে ছুটতে লাগলো। শফি নিজের কথা ভাবলো। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক ঠেলে।

পৃথিবীতে একমাত্র আপনজন ছিলেন মামা। বাবা-মা তার জ্ঞান হওয়ার আগেই মারা গিয়েছিলেন। মামা ছিলেন মুহুরী। শফিকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলা তাঁর জীবনের একমাত্র সাধ। পাছে সংসারের ঝামেলায় পড়ে যান এজন্যে তিনি বিয়ে করেননি। শফি ছিলো তাঁর আদরের দুলাল। জীবনের স্বপ্ন। মামার স্নেহে, আদরে বড় হয়ে উঠেছিল শফি। মামার স্বপ্ন সফল করে তুলতেই হবে এ ছিলো তার কঠোর প্রতিজ্ঞা। কতো কষ্ট করেই না তাকে পড়াশোনা করতে হয়েছে। তার পুরস্কারও সে যথাসময় পেলো। ম্যাট্রিকে রেকর্ড মার্ক পেয়ে প্রথম হলো। মামার কি আনন্দ সেদিন। গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠেছিল। কিন্তু এই আনন্দ তাঁর স্থায়ী হয়নি। আই. এস. সি.

পরীক্ষার ঠিক চার মাস আগে করোনারী থ্রম্বসিস হয়ে হঠাৎ মারা গেলেন মামা। ভেঙে গেল আশা-ভরসা। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল অসহায় শফির স্বপ্ন।

সেদিন ছিলো রবিবার। আজও শফির স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে বহুদূরের নদী দেখছিল সে, আর নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিল। আগামীকাল পরীক্ষার ফি জমা দেবার শেষ তারিখ। হাতে একটা পয়সা নেই। কোনও সংস্থানও নেই। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অবশ্য পরীক্ষার ফি'র টাকাটা পুওর ফাণ্ড থেকে দেবার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু এই রকম অভাব-অনটন আর দুশ্চিন্তার ভেতর কি পড়াশোনা হয়? মামা মারা যাবার পর ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় তার মন ভেঙে গেছে। এই মন নিয়ে আর যাই হোক পড়াশোনা হয় না।

শফি উদাস চোখ মেলে দূরের অস্পষ্ট নদী আর আকাশের তারা দেখছিল। ঠিক এই সময় সে টের পেলো কে একজন তার পাশে বসে আছে। শফি তার দিকে তাকাতেই লোকটা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, 'শফি, খুব মন খারাপ তোমার?'

শফি বলেছিল, 'তা হোক। আপনি কে?'

'ফ্রেণ্ড। তোমার বন্ধু। কি বিশ্বাস হয় না?' লোকটা হেসেছিল একটু।

অতীতের ঘটনা থেকে শফির মন ফিরে এলো বাস্তবে। স্কুটার এসে থেমেছে বাসার কাছে। ভাড়া মিটিয়ে সে নেমে এলো গাড়ি থেকে। না, সেই লোকটা সত্যি শফির বন্ধু। কে সেই লোক, কি তার পরিচয় কিছুই জানে না শফি। অন্ধকারে লোকটার চেহারাও ভালো করে দেখতে পারেনি। শুধু তার গলার ভরাট, গম্ভীর স্বর শুনেছিল। লোকটা বলেছিল, 'আমি কে তা তোমার জানার কিছু প্রয়োজন নেই। আমি তোমার বন্ধু। তোমার মামার মতোই একজন হিতৈষী। আমি চাই তুমি লেখাপড়া শিখে বড় হও। দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করো।'

শফি অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন। লোকটা বলেছিল, 'আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে তোমার কাছে এসেছি। তুমি হোস্টেলে থাকবে।'

'ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে তোমার নামে চল্লিশ হাজার টাকা জমা দেয়া হয়েছে। প্রতি মাসে যা তোমার প্রয়োজন তা নিজে সই করে ব্যাঙ্ক থেকে তুলবে। অলরাইট?'

রূপকথার গল্প মনে হয়েছিল শফির। সবটা ব্যাপার স্বপ্ন মনে হয়েছিল। কে এই লোক, কথা নেই বার্তা নেই তার নামে চল্লিশ হাজার টাকা রেখে দিয়েছে ব্যাঙ্কে? লোকটা চলে যাবার পর সবকিছু আজগুবি মনে হয়েছিল তার। উদ্ভট লেগেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিবার পরীক্ষা পাসের পর এক টুকরো চিঠি আসতো তার নামে, 'কনগ্রাচুলেশন, শফি।' প্রেরকের নাম ঠিকানা কিছুই থাকতো না। শুধু লেখা থাকতো বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে সে প্রথম হয়েছিল। পাস করার সঙ্গে সঙ্গে কাজ জুটে গিয়েছিল বিশ্ব-

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

বিদ্যালয়ে। ঠিক এই সময় সেই অজ্ঞাতনামা বন্ধুর চিঠি পেয়েছিল শফি। চিঠিতে লেখা ছিল, 'চাকরি নেয়া তোমার পক্ষে উচিত হবে না, শফি। তোমার নামে আরো কিছু টাকা জমা দেয়া হয়েছে ব্যাঙ্কে। তুমি কেম্‌ব্রিজ ইউনিভারসিটিতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ ডিগ্রি নিয়ে এসো। আমার বিশ্বাস তোমার পড়াশোনা এই পর্যায়ে বন্ধ করা ঠিক নয়। ইতি—বন্ধু।'

বন্ধুর কথাই রক্ষা করেছিল শফি। Nuclear Physics পড়ার জন্যে সে বিলেত গিয়েছিল এম. এস. সি. পাস করার পর পরই। দু'বছর কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। আরো দু'বছর গবেষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্রে। ফিরে এসে চাকরি নিয়েছে অ্যাটোমিক অ্যানার্জি কমিশনে। প্রায় দু'বছর চাকরি করেছে শফি। আশ্চর্য, দু'বছরের ভেতর একবারও সেই অজ্ঞাতনামা বন্ধুর কোনো নির্দেশ পায়নি। ভেবেছিল অজ্ঞাতনামা সেই রহস্যময় বন্ধু বোধহয় তার বর্তমান অবস্থায়ই খুশি, ঠিক এই সময় চিঠি এলো তার। লেখা, 'শফি, গিভ আপ জব। চাকরি ছেড়ে দাও। এখানে তোমার ভবিষ্যৎ সংকীর্ণ। ইতি—বন্ধু।'

আশ্চর্য হয়েছিল শফি। লোকটা কি জাদুমন্ত্র জানে? অ্যাটোমিক অ্যানার্জি কমিশনে সে যে তার সঠিক গবেষণার সুযোগ আর সরঞ্জামাদি পাচ্ছে না তা সেই রহস্যময় বন্ধু জানলো কি করে? শফি একবারও ইতস্ততঃ করেনি। চিঠি পাওয়ার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সে চাকরি ছেড়ে দিলো। সবাই খুব অবাক হয়েছে। তাতে শফির কিছু যায় আসে না। যে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তার জীবনকে চালিত করছে, তার ইচ্ছাই শফির কাছে সবচে' মূল্যবান। শফি সেই রহস্যময় লোকটিরই হাতে তৈরি একটা ইচ্ছার মূর্তিমান রূপ মাত্র।

ঘরে এলো শফি। কাল যে লোকটি চিঠি নিয়ে এসেছিল সে তার উপকারী বন্ধু নয়। বন্ধু আজ রাতে আসবে।

শফি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো।

রাত তখন দুটোর কম নয়। ঢাকেশ্বরী কলোনি অন্ধকারে নিমজ্জিত। এখানে ওখানে দু'একটা বাতি জ্বলছে। একটা ছায়ামূর্তি রাস্তার পাশের দেয়াল পার হয়ে কলোনির ভিতরে ঢুকলো। একটা কুকুর ঘেউঘেউ করে উঠলো কোথাও। মূর্তি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলো না। সে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো। তারপর কলোনির তিন নম্বর বাড়ির বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

শফি শোবার ঘরে বসে বই পড়ছিল। রাত জাগা অভ্যাস আছে। তবু থেকে থেকে ঢুলুনি আসছিল তার। তন্দ্রা ভাবটা জোর করে কাটিয়ে মাথা তুলতেই চমকে উঠলো সামনের দিকে তাকিয়ে।

দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠ এক মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। মূর্তিটার মুখে কালো মুখোশ। চোখ দুটি মুক্ত। শফি দেখলো মূর্তিটার দু'চোখে ঝরে পড়ছে অপরূপ এক উজ্জ্বলতা।

মূর্তি বললো, 'শফি, আজ রাতে তোমার ঘরে যার আসার কথা আমি সেই ব্যক্তি।'

শফি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। কোনো কথা বলতে পারলো না।

আগন্তুক বললো, 'আসাদুজ্জামান বুঝি তোমার বন্ধু?'

জামানের সঙ্গে এই রহস্যময় ব্যক্তিটির তাহলে কোনো একটা সম্পর্ক আছে, শফি ভাবলো। এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আপনি বসুন। আপনার অপেক্ষায়ই আমি এতক্ষণ বসেছিলাম।'

আগন্তুক গম্ভীর হয়ে রইলো। শফি চেয়ার এগিয়ে দেয়। বিন্দুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে স্থিরভাবে আগন্তুক বললো, 'আমার সময় অল্প। তোমার সঙ্গে আমার গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আছে। তুমি বসো শফি। শোনো।'

তিন

সকাল বেলায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একটা বিশিষ্ট ইংরেজি দৈনিকের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন মি. সিম্পসন। তৃতীয় পৃষ্ঠার দিকেই তাঁর আগ্রহ অধিক। প্রায় মাস দুই ধরে এই দৈনিকটির তৃতীয় পৃষ্ঠায় বিচিত্র ধরনের খুন আর রাহাজানির খবর ছাপা হচ্ছে নিয়মিত।

তৃতীয় পৃষ্ঠা ওল্টালেন মি. সিম্পসন। সেদিনও একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছিলো। সংবাদটা বাংলা করলে এরকম দাঁড়ায়ঃ

'বগুড়া, বারো ফেব্রুয়ারী। গতকাল রাত্রিবেলা পল্টন রোডে বিখ্যাত চৌধুরী বাড়িতে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। চৌধুরী বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি, তাঁহার বয়স একশত পঁচিশ বৎসর। গত বৎসর সরকারি রিপোর্টে তাঁহাকেই দেশের প্রবীণতম ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এই প্রবীণতম ব্যক্তিটির নাম ইব্রাহিম চৌধুরী। ইনি এই বয়সেও নিয়মিত শরীর চর্চা করিতেন। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ইব্রাহিম চৌধুরী স্বাস্থ্য সৌন্দর্যে অনেক যুবকেরও ঈর্ষার পাত্র ছিলেন। এই বয়সেও তাঁহার দুই পাটি দাঁত অটুট রহিয়াছে। দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রহিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গতকল্য রাত্রিবেলা ইব্রাহিম চৌধুরী তাঁহার শয়ন কক্ষ হইতে নিখোঁজ হইয়াছেন। কে বা কাহারা জানালার শিক গলাইয়া ঘরে ঢুকিয়া জনাব চৌধুরীকে

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

অপহরণ করিয়াছে। এই ঘটনায় শহরব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। গত কয়েক মাস ধরিয়া এইরূপ ঘটনা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় প্রত্যহই ঘটিয়া চলিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এইভাবে যাহাদের অপহরণ করা হইতেছে তাহারা প্রায় সকলেই বৃদ্ধ ব্যক্তি। অপহরণ–কারীরা বৃদ্ধ ব্যক্তিদের কি উদ্দেশ্যে অপহরণ করে তাহা বোঝা না গেলেও একথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে টাকা আদায়ের ফন্দি হিসাবে এইসব অপহরণ কার্য সংঘটিত হয় না। অপহরণকারীরা এই পর্যন্ত কোথাও তাহাদের শিকার গুম করিয়া টাকা দাবি করে নাই। আশঙ্কার বিষয় অপহরণকারীরা অপহরণকৃত ব্যক্তিদের বেশ কয়েকজনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যাও করিয়াছে। হত্যা করিয়া মৃত ব্যক্তির লাশ তাহারা প্রকাশ্যে ফেলিয়া দেয়। তদন্তে দেখা গিয়াছে প্রতিটি লাশেই রহিয়াছে অসংখ্য ক্ষত আর কাটা চেরার দাগ। কিছুদিন পূর্বে গুলশান এলাকায় অনুরূপ অবস্থায় এক মহিলার লাশ পাওয়া গিয়াছিল। পুলিস এই ব্যাপারে তদন্ত করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু তাহাদের তদন্তে এই বিচিত্র ডাকাতি আর খুনের রহস্য এতটুকু উদঘাটিত হয় নাই। পুলিস বিভাগের অক্ষম কর্তাদের পক্ষে এই প্রকার পরাজয় অবশ্য নতুন ব্যাপার নহে। কিন্তু যাহারা শান্তিপ্রিয় আর নিরীহ নাগরিক তাহারা এই বিচিত্র ডাকাতি লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। অপহরণকারীদের পরবর্তী শিকার কে তাহা কে বলিবে? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে তাহাদের যথাযথ কর্তব্য পালন করিবেন এখন পর্যন্ত আমরা সেই আশাই পোষণ করিতেছি।'

মি. সিম্পসন বার দুই খবরটার উপর চোখ বুলান। তাঁর চোখ মুখ চিন্তাকীর্ণ হয়ে ওঠে। এই বিচিত্র ব্যাপারে পুলিস বিভাগ থেকে স্পেশালভাবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলার সংশ্লিষ্ট পুলিস কর্মীরা তাঁর কঠোর নির্দেশে এই বিচিত্র ব্যাপারে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রক্ষা করছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই অন্তহীন রহস্যের কিছুমাত্র কিনারা করা সম্ভব হয়নি।

মি. সিম্পসন চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরান।

তাঁর চিন্তাকীর্ণ মুখে ফুটে ওঠে স্থির গাম্ভীর্য। তিনি টেলিফোনের কাছে এগিয়ে যান। একটা নাম্বার ঘুরিয়ে সহকারী তরিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

'হ্যাল্লো, তরিক...'

'ইয়েস, স্যার...'

'তোমাকে যা বলেছিলাম, করেছো?'

'করেছি, স্যার। বলেন তো এখনই রিপোর্টটা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিই।'

সিম্পসন বলেন, 'রিপোর্টটা নিয়ে তুমি নিজেই চলে এসো। ওকে?'

'ইয়েস, স্যার।'

কিছুক্ষণ পর তরিক হোসেন একটা ফাইল নিয়ে ঘরে ঢোকে। ফাইল থেকে পিন-আপ করা সেন্‌সাস অফিসের কয়েক শীট কাগজ সে এগিয়ে দেয় মি. সিম্পসনের হাতে। গভীর মনোযোগের সাথে রিপোর্টটা দেখতে থাকেন মি. সিম্পসন।

কয়েকটা নাম তিনি রিপোর্ট থেকে টুকে নেন আলাদা কাগজে। ডেথ্ রেকর্ড মিলিয়ে দেখা গেল তিন বছরে তেত্রিশজন প্রবীণ মানুষের ভেতর বাইশজনের মৃত্যু হয়েছে, এগারজন এখনো জীবিত। বাইশজনের মধ্যে বিশজনেরই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। বাকি দু'জনের একজন হাঁপানীতে আর একজন ক্যানসারে মারা গিয়েছে।

দুটো নাম লাল কালিতে দাগ দিলেন মি. সিম্পসন। এক, হাজী মুহিবুল্লা, ১০৮ ডেঙ্গু খাঁ লেন, ওয়ারী, ঢাকা। দুই, জন প্যাটিস···পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিটি দেশী খৃষ্টান, চাকমা উপজাতির ভূতপূর্ব সর্দার।

এই সময় ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠলো। মি. সিম্পসন গিয়ে টেলিফোন ধরেন। তাঁর চোখ মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে ওঠে। তাঁর গলা চিরে বেরিয়ে আসে একটা কাতর ধ্বনি।

মি. সিম্পসন শুধু বলেন, 'এ আমি জানতাম, মি. আহমদ!'

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে এসে গুম হয়ে বসেন মি. সিম্পসন। তরিক হোসেন চিন্তাকীর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ এসেছে।

মি. সিম্পসন আস্তে আস্তে সহজ হয়ে ওঠেন। বলেন, 'পাহাড়তলীর সি. আই. ট্র্যাঙ্ককল করেছিল তরিক। যা ভেবেছিলাম, তা-ই। মি. প্যাটিসকে কাল ভোর রাতে অপহরণ করা হয়েছে।'

'বলেন কি, স্যার···'

মি. সিম্পসন ম্লান হেসে বলেন, 'খবরটা এখনো সংবাদপত্র অফিসের লোকদের কানে যায়নি। নেকস্ট্ ভিকিটিম ইজ প্রবেবলি হাজী মহিবুল্লা। এসব কার কীর্তি আমি বুঝেছি তরিক।'

'কার, স্যার?'

'কুয়াশা।'

'কুয়াশা!'

মি. সিম্পসন উত্তর না দিয়ে নতুন একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করেন। নীরবে ধূমপান করতে থাকেন।

 www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

চার

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

ক'দিন পরের কথা।

আসাদুজ্জামান সকাল আটটায় শফির ঘরে ঢোকে। তার পরনে একটা ছাইছাই রঙের সামার সুট। হাতে একটা ছড়ি। চোখ-মুখ প্রফুল্ল। ঘরে ঢুকে কৃত্রিম কোপে চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'শফি, এই বুঝি তোর বন্ধুত্ব···সেই যে বিকেল বেলা ডুব দিয়েছিস আর কোনো পাত্তা নেই। জানিস এর কি শাস্তি···'

জামান ঠাট্টাচ্ছলে কথাগুলো বলছিল। কিন্তু জামানকে দেখে, তার কথা শুনে কেন যেন প্রবলভাবে চমকে উঠলো শফি। তার চোখ-মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায়। সে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে···কোনো কথা বলতে পারে না। জামান অবাক হয় এইবার। আরো কাছে এসে বলে, 'কিরে, তোর চোখ-মুখ এরকম শুকনো কেন? কি ব্যাপার, অসুখ-বিসুখ করেছে?'

'না, না···অসুখ-বিসুখ করেনি। ভালোই আছি।'

'বেশ, ভালো থাকলেই ভালো···'

ফুর্তিবাজ ছেলে জামান এ ব্যাপারে আর কথা বাড়ায় না। সে পকেট থেকে এক টুকরো চিঠি বের করে শফির হাতে দেয়। বলে, 'এই দ্যাখ, তোর মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। শ্রীমতি লিলির চিঠি। দু'দিন তুই যাসনি বলে তার মনে হচ্ছে গুলশান এলাকায় জনতা আছে, মানুষ নেই। আমার উপর শ্রীমতির আদেশ হয়েছে জীবিত অথবা মৃত শফিকুর রহমানকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার সামনে হাজির করা চাই।'

শফি কোনো জবাব দেয় না। নিঃশব্দে চিঠিটা পড়ে। লিলি লিখেছেঃ শফি ভাই, ভারি একটা মানুষ তুমি, যাহোক। আমাদের এমন অবস্থায় দু'দিনের ভেতর একটা সংবাদ নেয়ারও প্রয়োজন বোধ করলে না তুমি? যাকগে, কারো ইচ্ছার উপর জোর খাটাতে চাই না। যদি ইচ্ছা হয় আজ দুপুর বেলা আসতে পারো। ভাইয়া বাজার করবেন, ছোটো চাচা নাকি জোগান দেবেন, আর আমি রান্না করবো। সবাই মিলে একটা যাতনা ভোলার চেষ্টা করছি বোধহয় এইভাবে।

ইতি—লিলি।

চিঠি পড়ে চুপ করে রইলো শফি। চোখ দুটি উদাস হয়ে উঠলো কেন যেন। জামান বললো, 'নে, নে···ওঠ··· আজ রোববারটা আমাদের ওখানে কাটাবি। দেরি করিসনে।

ফিরতি পথে লিলির দু'একজন বান্ধবীকে আবার খবর দিয়ে যেতে হবে।'

শফির বুঝতে বাকি রইলো না জামান আজ মুডে আছে। তার মানে আজ জামানের সব কথায় ঠাট্টার রঙ লাগবে। হাসি হয়ে উঠবে অট্টহাসি। জীবন-রসে ভরপুর জামানের সঙ্গে জুটে যেতে উদগ্র ইচ্ছা হলো। কিন্তু দেখতে দেখতে কেন যেন চোখ-মুখ শক্ত আর কালো হয়ে উঠলো।

'জামান, আজ আমি ব্যস্ত আছি। আজ তোদের বাড়িতে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না।'

সব আনন্দ নিভে যায় জামানের। দুঃখিত হয়ে বলে, 'খুব ব্যস্ত আছিস বুঝি? তাহলে তো তোর যাওয়া সত্যি হয় না। ঠিক হ্যায়, দোস্ত, তাহলে চলি। লিলিকে পরে তুই সামাল দিস।'

জামান চলে গেল। এক দৃষ্টে তার যাত্রা পথের দিকে তাকিয়ে রইলো শফি। জামান সম্পূর্ণ দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর সে অস্থির পায়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো। তার একটা জীবন শেষ হয়ে গেল। শুরু হলো নতুন আর এক ধরনের জীবন। সে কি ভুল পথে পা দিচ্ছে? সে কি জেনেশুনে একটা অন্যায়কে মাথা পেতে তুলে নিচ্ছে না?

শফি ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো। হঠাৎ তার চেকটার কথা মনে পড়লো। চেকটা ভাঙাতে হবে বাইশ মার্চ, মঙ্গলবার সকাল দশটায়। সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত একটা ছাইরঙের ছোটো অস্টিন সেদিন ব্যাঙ্কের উত্তর মুখো গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাইশ তারিখ, মঙ্গলবার। শফি থমকে দাঁড়ায় আর ভেতরে ভেতরে একটা যন্ত্রণা বোধ করে।

বাইশ মার্চ, মঙ্গলবার। সকাল দশটা।

দেশের বিখ্যাত ধনপতি সুখলাল মনোহারিয়ার যুবকপুত্র যদুপতি মনোহারিয়ার মার্সিডিস বেঞ্জ গাড়িটা এসে দাঁড়ায় কুমিল্লা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সামনে। গাড়ি থেকে হাসিমুখে নেমে আসে যদুপতি মনোহারিয়া। তার পরনে পাতলা যোধপুরী ধুতি। দামী সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর কালো জহর কোট। পায়ে লাল পাতলা পাম্প-সু। ধুতির কোঁচাটা পাঞ্জাবীর পকেটে ঢোকানো। গেটের দারোয়ান প্রথমটা তাকে চিনতে পারেনি। চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি সালাম ঠুকলো। যদুপতি হাসিমুখে এগিয়ে গেল ম্যানেজার মি শেখের ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকতেই মি. শেখ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায় যদুপতিকে।

যদুপতি বলে, 'আমার সেক্রেটারির টেলিফোন পেয়েছিলেন?'

'পাবো না কেন, স্যার? তারপর কি ব্যাপার?'

'আর বলবেন না। কয়েকটা ব্রাঞ্চ অফিস ওপেন করতে হচ্ছে। বাবা ক'দিনের জন্য করাচী গেছেন। আমাকেই সব ব্যাপারে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।'

ম্যানেজার শেখ যদুপতিকে খুশি করার জন্য আকর্ণবিস্তৃত হেসে বলেন, 'তা করতেই হবে। আপনিই হলেন সুখলালের বিপুল ধনসম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী। হেঃ, হেঃ, কলেজ-টলেজ গিয়ে খামোকা সময় নষ্ট করে লাভ কি? তারচে' ব্যবসাটা এখন থেকে বুঝে নিন···কি বলে, আখেরে সেটাই ভালো।'

'তা বটে।'

যদুপতি ঘড়ি দেখলেন। একটু যেন ব্যস্ততা ফুটলো চোখে-মুখে। বললো, 'মি. শেখ···আমার চেকটা ক্যাশ করে দিন তাড়াতাড়ি। দি সুনার দি বেটার।'

'দিচ্ছি, দিচ্ছি···'

চেকটা হাতে নেন মি. শেখ। 'টাকার পরিমাণ একটু বেশি দেখছি। দু'লাখ টাকা···ও. কে···'

মি. শেখ কলিংবেল টেপেন। তকমা আঁটা বেয়ারা এলে তিনি তার হাতে যদুপতির চেক আর ক্যাশিয়ারের কাছে একটা ব্যক্তিগত নোট দিয়ে পাঠান। হুকুম নিয়ে বেয়ারা চলে যায়।

মি. শেখ যদুপতির দিকে ফিরে তাকিয়ে বসে মি. মনোহারিয়া···আপনার কি কোনো অসুখ হয়েছিল?'

'কেন বলুন তো?'

'আপনার গলার স্বর একটু যেন অন্যরকম। দেখতেও একটু রোগা লাগছে।'

যদুপতির চোখে একটা অস্পষ্ট ভয়ের রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। সে বেশ খানিকটা গম্ভীর হয়ে বলে, ঠিকই বলেছেন মিঃ শেখ। কিছুদিন আগে অ্যাকিউট থ্রোট ট্রাবল থেকে উঠেছি। এখনো সম্পূর্ণ সেরে উঠিনি।'

'আশাকরি শীঘ্রি সেরে উঠবেন।'

মি. শেখ বিনীত ভাবে হাসেন। বলেন, 'বলুন কি খাবেন, চা না কফি?'

'নাথিং মি. শেখ। সব রকম ড্রিঙ্ক কিছুদিনের জন্য পরিহার করতে আমার চিকিৎসক উপদেশ দিয়েছেন।'

'তাই নাকি...'

মি. শেখ শুধু একটু হাসেন।

এই সময় ক্যাশিয়ার স্বয়ং বেয়ারাসহ ভেতরে ঢোকে। টাকা ভর্তি এনভেলাপটা

 www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

নিয়ে হাসতে হাসতে যদুপতি বলে, 'মি. শেখ…এবার তাহলে উঠি। Already I am late…'

টাকা ভর্তি লম্বা এনভেলাপটা পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে দেয় যদুপতি। করমর্দন করে ম্যানেজার শেখের সঙ্গে। মি. শেখ যদুপতির সঙ্গে কাউন্টারের দরজা পর্যন্ত আসেন। যদুপতি ঘনঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। আর যেন সে অপেক্ষা করতে পারছে না। যতোই সে সরে পড়তে চাইছে মি. শেখ ততোই নানা কথায় দেরি করে দিচ্ছেন। যদুপতি কোনো মতে বিদায় নিয়ে মাত্র দরজার দিকে আসছে ঠিক এসময় পেছন থেকে খসখসে গলায় কে যেন বললো, 'ঐ লোকটাকে আটকান, মি. শেখ। ও যদুপতি নয়। He is a fraud…'

যদুপতি যেন এই ঘটনার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। কথা শেষ হবার আগেই কাউন্টারে দাঁড়ানো একটা লোক চকিতে প্যান্টের পকেট থেকে ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে আনে। পিস্তলের মুখ দিয়ে অগ্নি বন্যা ছুটে যায় অদূরে দাঁড়ানো বন্দুকধারী সান্ত্রীর ডান কাঁধে। লোকটা আর্তনাদ করে পড়ে যায় আর চোখের পলক না পড়তেই পিস্তলটা গর্জে ওঠে দ্বিতীয় সান্ত্রীর বুক লক্ষ্য করে। তারপর যদুপতি নামধারী লোকটা আর পিস্তলধারী এক ছুটে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

পেছনে চিৎকারের ঝড় ওঠে। যদুপতি ও তার সঙ্গী ততক্ষণে গিয়ে উঠে পড়েছে দরজার বাঁ' দিকে অপেক্ষমাণ বেবী অস্টিনের ভিতর। এঞ্জিন চালু করাই ছিলো। নিমেষে গাড়ি ছুটে চললো মতিঝিল ছাড়িয়ে জনবহুল জিন্না অ্যাভিনিউর দিকে। গাড়িতে বসেই ক্ষিপ্রহাতে ছদ্মবেশটা খুলে ফেলে শফি। মুখে একটা কসমেটিক জাতীয় তেল ব্যবহার করতেই আশ্চর্যভাবে বদলে গেল মুখের রঙ, আদল। সঙ্গী লোকটা এসব কিছুই করলো না। সে ধীরস্থির ভাবে বসে পাইপ টানতে লাগলো। এদিকে পেছনে সিগন্যাল দিতে দিতে এগিয়ে আসছে একটা তীব্র গতি পুলিসের গাড়ি।

'You have done well…'

পাইপধারী লোকটা অনুত্তেজিত গলায় বললো। তাকে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত মনে হলো না। কে বলবে এই লোকটা একটু আগে দু'দুটো লোককে নিজের হাতে গুলি করেছে? তার ভাব দেখে মনে হয় ভরপেট খেয়েদেয়ে বাড়ি থেকে অফিসে যাচ্ছে। লোকটাকে শফি চেনে না। সেই রাতে কুয়াশা কোনো ব্যাপারে দুশ্চিন্তা না করতে বলেছিল। শফি বুঝলো কুয়াশার প্ল্যান মাফিক লোকটা কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল। যথা সময় সে শফিককে কাউন্টার থেকে উদ্ধার করে গাড়িতে নিয়ে এসেছে। উত্তেজনায় সারা শরীর তার টগবগ করে ফুটছিল। কিভাবে গাড়ি নিরাপদ স্থানে গিয়ে পৌঁছবে তা

সে বুঝতে পারছিল না।

লোকটা যেন তার মনের কথা টের পেলো। বললো, 'আপনি তৈরি হয়ে থাকুন, মি. শফি। রেল গেটের পাশে আপনাকে নামিয়ে দেয়া হবে। কিছুদূর এগিয়ে একটা স্কুটার পাবেন। ড্রাইভারের পরনে দেখবেন হলুদ রঙের একটা জামা। ড্রাইভারকে আপনি ৩৩২ এই নম্বরটা বলবেন। তারপর স্কুটারে চেপে বসে আপনি সোজা আপনার বাড়ি চলে যাবেন। কেউ আপনার টিকিরও নাগাল পাবে না।'

শফি নিঃশব্দে টাকা ভর্তি এনভেলাপটা তুলে দেয় লোকটার হাতে।

শফি বললো, 'আর আপনি?'

লোকটা পাইপের পাতলা ধোঁয়া ছেড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, 'আমার সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আর ড্রাইভার ঠিক উতরে যাবো। যাকগে, আপনি দেরি করবেন না, আপনার সময় এগিয়ে আসছে কাছেই...'

পেছনে এগিয়ে আসছে পুলিসের গাড়ি। ক্ষিপ্রহাতে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। একটা ফলের দোকানের সামনে গাড়িটা মুহূর্তকাল থামলো। শফি চকিতে নেমে এলো গাড়ি থেকে। চোখের পলক না পড়তেই গাড়িটা ছুটে চললো সামনের দিকে। শফি জিনিস কেনার ভান করে এগিয়ে গেল দোকানের দিকে। তার পরনে নতুন পোশাক। রঙ আর পেন্টিং মুছে ফেলার পর তার নিজস্ব চেহারা ফিরে এসেছে। আবার সে শফিকুর রহমানে রূপান্তরিত হয়েছে। পেছন ফিরে সে ফল কিনতে লাগলো।

ফল কিনে বেশ কিছুক্ষণ পর সে রাস্তার দিকে ফিরে তাকালো। পুলিসের গাড়ি অন্ততঃপক্ষে পাঁচশো গজ পেছনে ছিলো। ইতিমধ্যে সেটা নিশ্চয়ই এগিয়ে গেছে সামনে। সে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। নতুন মনে হলো পৃথিবীটা। আর দ্বিধা না করে সে পাশের গলিটা ধরে কিছুদূর এগোলো। দেখলো একটা খালি স্কুটার দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। ড্রাইভারের পরনে হলুদ রঙের জামা। সে স্কুটারে চেপে বসলো। ড্রাইভার ফিরে তাকাতেই চাপা গলায় বললো, '332.'

মুহূর্তেই বিনয়ী হয়ে উঠলো ড্রাইভার। বললো, 'কোথায় যাবো, স্যার...'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো শফি। তারপর বললো, 'গুলশান।' স্কুটার ছুটে চললো।

পাঁচ

জামানের বাড়িতে গিয়ে উঠলো শফি। জামান বাড়ি ছিলো না। লিলিকে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে সারাদিন সে ঘরে শুয়ে কাটিয়ে দিলো। বিছানা থেকে উঠলো একেবারে রাতের খাবারের সময়। ছোটো চাচা শফির শরীর অসুস্থ দেখে

ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলেন খাবার পর। শফি নিষেধ করলো। ছোটো চাচা যতো না অবাক হলেন তার চেয়ে বেশি অবাক আর মনোক্ষুণ্ণ হলো লিলি। শফি এদের স্নেহ আর মমতায় কিছুটা বিব্রতবোধ করলো। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সহজ হতে পারলো না। সে অপেক্ষা করলো জামানের জন্যে। রাত এগারটায়ও যখন জামান ফিরলো না তখন সে শুতে গেল। তার ঘুম হলো না সারারাত। সকালের দিকে ভারি একটা তন্দ্রা নামলো চোখে। বিছানা ছেড়ে উঠতে বেশ একটু দেরি হলো তার। চা খেয়ে যখন উঠলো তখন বেলা ন'টা বেজে গেছে।

শফি সব ক'টা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়ে নিজের ঘরে এলো। উদগ্র আগ্রহে সংবাদপত্রের পাতা উল্টে গেল। দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ঈপ্সিত খবরটা দেখতে পেলো। খবরটা এরকমঃ

দেশব্যাপী বিচিত্র উপায়ে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি!

ঢাকা ২২ মার্চ। গতকল্য ঢাকায় দুইটি বৃহৎ ব্যাঙ্কে একই সময় এক বিচিত্র উপায়ে টাকা অপহরণ করা হইয়াছে। ব্যাঙ্ক দুইটির একটি দি কুমিল্লা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, অপরটি দি প্রভিন্‌শিয়েল ব্যাঙ্ক। শুধু এই দুইটি ব্যাঙ্কেই নহে দেশের বৃহত্তম বন্দর চট্টগ্রাম, জনবহুল নগরী খুলনা এবং উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম শহর রাজশাহীতেও একই সময় একই ভাবে সম্ভবতঃ একই দলের দ্বারা অনুরূপ লুণ্ঠন কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহীর ব্যাঙ্ক লুটের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে গতকল্য দুপুর একটার বিশেষ ট্র্যাঙ্ককল যোগে। দেখা যায় সব কয়টি ক্ষেত্রে দুষ্কৃতিকারীরা একই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। দি কুমিল্লা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মি. শেখের সহিত আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার হইতে জানা যায় যে, গতকল্য প্রদেশের বিখ্যাত ধনপতি সুখলাল মনোহারিয়ার একমাত্র পুত্র যদুপতি মনোহারিয়ার সেক্রেটারি সকাল ন'টা পনেরো মিনিটের সময় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মি. শেখকে টেলিফোন করেন। টেলিফোনে সেক্রেটারির মাধ্যমে মি. যদুপতি জানান যে বিশেষ প্রয়োজনে দুই লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তোলা দরকার বিধায় তিনি নিজেই ব্যাঙ্কে আসিতেছেন। মি. যদুপতি শেখের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। স্বয়ং যদুপতি যেখানে ব্যাঙ্কে আসিতেছেন সেখানে টাকা তোলার ব্যাপারে মি. শেখের কোনো সন্দেহই জাগে নাই। মি. শেখ টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়া যদুপতির আগমন অপেক্ষায় নিজের ঘরে বসিয়া থাকেন। বেলা দশটায় যদুপতি মি. শেখের কক্ষে প্রবেশ করেন। যদুপতির কণ্ঠস্বর কিছু অচেনা ঠেকিতেছিল বটে কিন্তু চেহারায় ও আচার–আচরণে যদুপতি নামধারী দস্যু এমন নিখুঁত ছিলো যে মি. শেখ একবারও অন্য কিছু সন্দেহ করিতে পারেন নাই। মি. শেখ স্থির বিশ্বাসে দুই লক্ষ

টাকার চেক ভাঙাইয়া তাহা যদুপতির হাতে অর্পণ করেন। যাহা হউক, মি. শেখের কক্ষ ত্যাগ করিয়া যদুপতি নামধারী ব্যক্তি টাকাসহ দরজার দিকে আগাইয়া যায়। যদুপতি দামী মক্কেল বিধায় মি. শেখ দরজা পর্যন্ত যুদপতিকে আগাইয়া দিতে যান। দরজার পাশে দাঁড়াইয়া মি. শেখ ও যদুপতির মধ্যে ব্যবসা–সংক্রান্ত ব্যাপারে দু'একটা সাধারণ মন্তব্যের বিনিময় হইতেছিল, ঠিক সেইসময় ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার আলী আশরাফ এন্‌ট্রি বইয়ে চেক রাখিতে গিয়া ভয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করিয়া উঠে। যদুপতির চেক শেষবারের মতো পরীক্ষা করিতে গিয়া ক্যাশিয়ার আলী আশরাফ যাহা দেখিয়াছে তাহা সত্যি বিস্ময়জনক। পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল সইয়ের জায়গা হইতে যদুপতির সইটি বেমালুম উবিয়া গিয়াছে। প্রথমে নিজের চক্ষুকেও সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ভালরকম পরীক্ষা করিয়া সে দেখিলো সত্যি–সত্যি চেকে কারো সই নাই। তখনও কাউন্টারের দরজার কাছে যদুপতি দাঁড়াইয়া মি. শেখের সঙ্গে কথা বলিতেছে। ক্যাশিয়ার আলী আশরাফ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠে, 'ঐ লোকটাকে ছাড়বেন না স্যার, ও একটা প্রতারক…যদুপতি নয়।' ঠিক এই সময় কাউন্টারে দাঁড়ানো একটা লোক দুই দরজার বন্দুকধারী দুই সান্ত্রীকে চোখের নিমেষে গুলি করে এবং যদুপতি নামধারী প্রতারক আর সে ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। বাহিরে অপেক্ষমাণ একটি অস্টিন গাড়িতে চড়িয়া দুষ্কৃতকারীরা মতিঝিল এলাকা হইতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া আসে। তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দেয়ায় কয়েকটা দ্রুতগামী পুলিসের গাড়ি মতিঝিল এলাকায় বিভিন্ন রাজপথে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে পুলিস ইন্সপেক্টর মোবারক আলীর গাড়িটি বর্ণিত গাড়িটাকে নাজ সিনেমা হলের নিকটস্থ প্রদর্শনীয় কামানের কাছে দেখিতে পায়। তখন দুইটা গাড়ির দূরত্ব অনুমান চারশো গজ। অস্টিন গাড়িটি জনবহুল নওয়াবপুর রোডের ভিতর দিয়া আশ্চর্য কৌশলে কোনো একটি গলির ধাঁধায় হারাইয়া যায়। ইহার পর কোথাও গাড়িটিকে দেখা যায় নাই।

দেশের তিনটি শহরেও একই পদ্ধতিতে জালিয়াতির কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। এক মাত্র কুমিল্লা ট্রেডিং ব্যাঙ্কেই দুষ্কৃতকারী প্রায় ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে। তাছাড়া আর সব কয়টি ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ গজাইবার পূর্বেই দুষ্কৃতকারীরা নির্বিঘ্নে টাকা লইয়া সরিয়া পড়িতে সমর্থ হইয়াছে। সব ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতকারীরা ডিপোজিটারের নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের চোখে ধূলি দিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা অনুমান করা সহজ যে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা এই ব্যাঙ্ক–জালিয়াতির পিছনে কাজ করিয়াছে। এই বিচিত্র জালিয়াতিতে ছদ্মবেশ ও সই করার ব্যাপারে অত্যন্ত উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সর্বমোট পাঁচ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে অপহৃত হইয়াছে। এই ব্যাপারে জোর পুলিসী তদন্ত

চলিতেছে।

সব ক'টি কাগজেই এই সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয়েছে। সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলিয়ে শফি যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়। কিন্তু তার বুকের অস্থিরতা আর উদ্বেগ এতটুকু কমেনি। জামান আর লিলির কথা ভাবলে নিজেকে তার হীন বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হয়। নিজেকে সে কখনো ক্ষমা করতে পারে না। কুয়াশার হাতছানি শেষ পর্যন্ত তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা ভাবতে পারে না শফি। যদি পারতো তাহলে নিজেকে নিজে সে বাধা দিতো। কিন্তু কৃতজ্ঞতাবোধের কাছে বিবেক হেরে গেছে। কুয়াশার ঋণ শোধ করতে গিয়ে অনেকদূর সে এগিয়ে গেছে। আর পেছনে ফেরা যায় না।

কিছুক্ষণ পর লিলি এলো। বললো, 'জামান ভাই তোমাকে ডাকছে।'

'জামান ফিরেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, অনেক রাতে ফিরেছিল। এইমাত্র ঘুম ভেঙে উঠে তোমার কথা শুনেছে।'

'আমি যাচ্ছি।' শফি একটু ইতস্ততঃ করে বললো।

লিলির কি যেন বলার ছিলো। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তার বাসন্তী রঙের শাড়ির আঁচল উড়তে লাগলো বাতাসে। লিলির নিটোল চোখে–মুখে রক্তিম হয়ে উঠেছে কি এক গোপন ভাষার পরশ।

শফি বললো, 'তুমি কিছু বলবে লিলি?'

লিলি জবাব দিলো না এ কথার।

শফি ডাকলো, 'লিলি।'

'বলো।'

'আমার ব্যবহারে তোমরা খুব ক্ষুব্ধ হয়েছো, না?'

লিলি হাসলো। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো শফির দিকে। বললো, 'যাক ওসব কথা। তুমি ভাইয়ার ঘরে যাও···আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।'

লিলি চলে যায়।

শফি একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করলো। যা হয়েছে বেমালুম যদি ভুলে থাকা যেতো। যা হবে তার পরিণাম সম্পর্কে মনে যদি কোনরকম চিন্তা না আসতো!

জামান কাপড় পরছিল। গম্ভীর চোখ মুখ। শফিকে দেখে একটু হাসলো।

'আয়···'

'তুই কোথাও যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'ভদ্রলোকের নাম মি. সিম্পসন। শহীদ খানের কথা তোর নিশ্চয়ই মনে আছে? তিনিই আমাকে আই. বি. বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মি. সিম্পসনের সাহায্য নিতে

বলেছিলেন। ভদ্রলোক খুবই নির্ভরযোগ্য। তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি।'

ক্ষত-বিক্ষত শফির চোখ-মুখে নিদারুণ হতাশার ছায়া ফুটে ওঠে। তা লক্ষ্য করে জামান বিস্মিত হয়। ক'দিন থেকে শফির আচার-ব্যবহার অত্যন্ত সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। সে নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, অনেক রাতে বাসায় ফেরে…আর সর্বক্ষণ কি এক অস্থিরতায় ছটফট করে বেড়ায়। ব্যাপার কি?

কাপড় পরা শেষ হয়েছে জামানের। সে এগিয়ে আসে শফির কাছে। শফির কাঁধে একটা হাত রেখে বলে। "তোর কি হয়েছে শফি?'

শফির একবার ইচ্ছে হলো ছেলেবেলার বন্ধু জামানকে সব কথা খুলে বলে। বিবেকের দংশন সে আর সহ্য করতে পারছে না। কুয়াশার গম্ভীর, ভয়াল অথচ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কণ্ঠস্বর সেই মুহূর্তে কানে বাজতে লাগলো তার। নিজেকে সে সামলে নিলো। বললো, 'কিছু হয়নি তো।'

'কিছু লুকোবার চেষ্টা করিস নে, দোস্ত। সব কথা আমাকে খুলে বল।'

শফি জোর করে হেসে বললো, 'জামান, জীবন একটা রূঢ় বাস্তব। ইচ্ছে করলেই সব কিছু যদি করা যেতো তাহলে আর কিছু দুঃখ থাকতো না। আমাকে নিয়ে বৃথা চিন্তা করিস নে ভাই। আমি জন্ম-দুঃখী। দুঃখ আমার কপাল।'

জামান আর কথা বাড়ালো না। কিন্তু তার মনে সন্দেহ জেগে উঠলো। কী হয়েছে শফির? তার নির্ঝঞ্ঝাট জীবনে হঠাৎ কি হলো?

সে প্রসঙ্গ বদলিয়ে বললো, 'যাকগে, তোর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করে তোর বিরক্তির কারণ হতে চাই না। তুই আমার সঙ্গে যাবি?'

'কোথায়?'

'মি. সিম্পসনের কাছে?'

শফি কি যেন ভাবলো। তার মন বললো এক পা বাড়িয়ে বসে আছে শফি। সময় আছে, অবস্থার সঙ্গে তাল মেলাও। নতুবা দু'নৌকায় পা দিতে গিয়ে ডুবে মরবে।

শফি বললো, 'যাবো।'

ছয়

মাটির নিচে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বিভিন্ন কক্ষে আলো-বাতাসের নিখুঁত ব্যবস্থা। প্রত্যেক কক্ষেই একটি করে বৈদ্যুতিক ঘন্টা। অট্টালিকাটি তিন ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগে গবেষণা কেন্দ্র, দ্বিতীয় ভাগটি রহস্যময় অট্টালিকার অধিবাসীদের বিশ্রামস্থল। অট্টালিকার তৃতীয় অংশ বাকি দু'টি অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন।

অধিবাসীদের সকলেই জানে অট্টালিকার তৃতীয় অংশে এই বিপুল গবেষণা কেন্দ্রের যিনি পরিচালক তিনি বাস করেন। তাঁর বিষয়ে অধিবাসীদের আর প্রায় কিছুই জানা নেই।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। গবেষণা কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক ঘড়ির কাঁটা অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন কক্ষে গবেষকরা তাদের নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত।

গবেষণা কেন্দ্রের একটি বৃহৎ কক্ষের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় এক বৃদ্ধ। তার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। বারবার বৃদ্ধ ঠোঁট কামড়াচ্ছিল আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল।

এই সময় মুখোশধারী এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকলো। পেছনে আর এক ব্যক্তি। মুখোশ নেই। চ্যাপ্টা মুখ। পাতলা ধূসর রঙের দাড়ি। চোখ দুটি ভাবলেশহীন। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ দেহ।

বৃদ্ধ মুখোশধারীকে দেখে উঠে বসে বিছানা থেকে। আক্রোশ ফেটে পড়ছে তার চোখ দু'টি থেকে। চেঁচিয়ে বললো, 'শয়তানের দল, কেন আমাকে এভাবে চুরি করে এনেছো? তোমাদের মতলবটা কি?'

মুখোশধারী স্থির শান্ত কণ্ঠে বললো, 'চিৎকার করবেন না চৌধুরী সাহেব। চিৎকারে কোনো ফল হবে না। আপনি এখন পাঁচশো ফিট মাটির তলায় আছেন। আপনার চিৎকার কেউ শুনতে পাবে না।'

'কিন্তু কেন? কেন আমাকে এভাবে আমার শান্তির সংসার থেকে ছিনিয়ে এনেছো? কি আমার অপরাধ?'

মুখোশধারী বললো, 'আপনাকে ছিনিয়ে আনার উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে। তা কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি জানতে পারবেন।'

বৃদ্ধ ইব্রাহিম চৌধুরী রাগে, দুঃখে কেঁদে ফেলে। বলে, 'দোহাই বাবা! আমাকে তুমি দয়া করে ছেড়ে দাও। আমাকে এভাবে আর কষ্ট দিয়ো না।'

মুখোশধারী কোনো উত্তর দিলো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তার মনে পড়ছিল বহুদিন আগের আর এক বৃদ্ধের মরণ–চিৎকারের কথা। বৃদ্ধ চিৎকার করে বলেছিল, 'মেরে ফেলো। পায়ে পড়ি। আমায় মেরে ফেলো!' সেই বৃদ্ধ ছিলো তারই জনক! মুখোশধারী মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সে নিজেকে সামলে নেয়। পেছনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, 'মান্নান, ডক্টর ক্রিনসবার্গ তৈরি আছেন?'

মান্নান বললো, 'তিনি তাঁর ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

'ওকে নিয়ে যাও।'

মান্নান এগিয়ে যায় বৃদ্ধের দিকে। বৃদ্ধ ইব্রাহিম চৌধুরী চিৎকার করতে থাকে। মান্নানের চোখ–মুখ নির্লিপ্ত, কঠোর। সে সুইচবোর্ডের 05 সুইচটা টিপে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা সুদ্ধ ইব্রাহিম চৌধুরী তলিয়ে যায় নিচে।

মুখোশধারী বলে, 'তুমি এবারে যাও, মান্নান।' মান্নান মাথা নুইয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

মুখোশধারী একা। সে ঘর থেকে বেরিয়ে সরু বারান্দায় নামলো। দীর্ঘ বারান্দাটি উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। দু'পাশে নানা আয়তনের কক্ষ। প্রতিটি কক্ষই ভিতর থেকে বন্ধ।

মুখোশধারী হাঁটতে লাগলো। দীর্ঘ বারান্দা পার হয়ে উপরে ওঠার সিঁড়ি। নিচে বাঁ'দিক জুড়ে হল-ঘর। মুখোশধারী সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে উঠে গেল। কোথায় গেল বোঝা গেল না।

ডক্টর ক্লিন্‌সবার্গ তাঁর ঘরে বসে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছিলেন। সামনের টেবিলে কৃত্রিম উপায়ে অজ্ঞান করা ইব্রাহিম চৌধুরীর দেহ শায়িত। একটা লম্বা কাঁচের শেল্‌ফের উপর লেখা আছে Immortal Cell. শেল্‌ফের ধূসর রঙের টিউবের ভেতর খানিকটা তরল পদার্থ। একপাশে ইংরেজিতে লেখা deoxyribonucleic acid.

ড. ক্লিন্‌সবার্গ যন্ত্রপাতি ঠিক করেন। তাকে দু'জন সার্জন আর দু'জন নার্স সাহায্য করছে। সারা ঘরে বিরাজ করছে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। এই সময় ঘরের দেয়ালের পাশে একটা গোলাকৃতি বাল্‌ব লাল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তকালের জন্যে তীব্র হিস্ হিস্ একটা শব্দ শোনা গেল। ড. ক্লিন্‌সবার্গ, সার্জন ও নার্স দু'টি বিনীত ভদ্রতায় নিঃশব্দে সামান্য মাথা নোয়ান।

লাল বাল্‌বটি জ্বলে ওঠার অর্থ দেয়ালের ভিতর গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালকের দু'টি অদৃশ্য চোখ সক্রিয়।

ড. ক্লিন্‌সবার্গ ও সার্জন দু'টি উঠে দাঁড়ান। প্রথমে পেট পর্যন্ত চিরে ইব্রাহিম চৌধুরীর ফুসফুস টেনে বার করা হলো। ড. ক্লিন্‌সবার্গ একটা যন্ত্রের সাহায্যে ফুসফুসের রক্তচাপ আর ক্রিয়াশক্তি টুকে নেন। তাঁর নির্লিপ্ত চোখজোড়ায় কেন যেন এক টুকরো উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। নিপুন হাতে ছুরি চালিয়ে এরপর তিনি হাত, তলপেট আর ঘাড়ের পেছনকার কিছু মাসল, চামড়া আর সেল কেটে নেন। ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়া হলো অনুরূপ সামর্থ্যের মাসল, চামড়া আর সেল। এরপর ড. ক্লিন্‌সবার্গ যন্ত্র চালিতের ন্যায় ইব্রাহিম চৌধুরীর শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে শরীরের DNA পরীক্ষা করেন। যথাসময় শরীরের ক্ষতস্থানগুলো সেলাই করে ওষুধ দিয়ে বেঁধে দেয়া হলো। ড. ক্লিন্‌সবার্গ একটা কাঁচের জার থেকে বেরিয়ে আসা রবার টিউব সংযুক্ত করেন ইব্রাহিম চৌধুরীর গায়ে।

সেদিনকার মতো তাঁর কাজ শেষ হয়। ড. ক্লিন্‌সবার্গ এগিয়ে যান ঘরের এককোণে রাখা একখানা বেতারযন্ত্রের দিকে। দেয়ালের গোল লাল বাল্‌বটা তখনো

জ্বলছে। ড. ক্লিন্‌সবার্গ আস্তে আস্তে সেই বেতারযন্ত্রের কাছে মুখ নিয়ে বলেন, 'Examination is over, 20% cells are dead. Enormous vigours in tissues found. Full reports will be sent three hours later.'

লাল বাল্‌বটা মুহূর্তকাল পরেই নিভে যায়। তীব্র হিস্‌হিস্ শব্দটা একবার উঠেই মিলিয়ে গেল।

সাত

হাজী মুহিবুল্লার বাড়ি।

রাত এগারোটা। গলির মোড়ে ল্যাম্প পোস্ট জ্বলছে। নিচে ঘুমিয়ে আছে আপাদমস্তক কাঁথা মুড়ি দিয়ে একটা ভিখারী। গলির মোড়ে একটা বিকল ভাড়াটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে তোবড়ানো দেহ নিয়ে। গলি নির্জন হয়ে এসেছে এতক্ষণে। বিটের পুলিস টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

মি. সিম্পসন, তাঁর সহকারী তরিক হোসেন, কয়েকজন পুলিস অফিসার আর জামান নিঃশব্দে বসে আছে হাজী মুহিবুল্লার ড্রয়িংরুমে।

জামানের হাতে একটা চিঠি। চিঠিটা মি. সিম্পসনের কাছে লিখেছে কুয়াশা। সংক্ষিপ্ত চিঠি। কুয়াশা লিখেছে, 'মি. সিম্পসন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার পরবর্তী শিকার হাজী মুহিবুল্লাই বটে। আমার গবেষণা কাজের জন্যে হাজী মুহিবুল্লার মতো আরো বহু লোক দরকার। আস্তে আস্তে সব লোকই সংগ্রহ করে চলেছি এবং গবেষণার শেষ পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমার কাজ আমি করে যাবোই। হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক লুটও আমার কাজ। ব্যাঙ্ক লুট করে অতি সামান্য টাকা পাওয়া গেছে। এ টাকায় আমার প্রয়োজন মেটার নয়। শিগগিরই নতুন উপায়ে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করবো। আপনাদের সাধ্য থাকে বাধা দেবেন। মি. সিম্পসন, আমি আপনার উন্নত চরিত্রের একজন ভক্ত বটে। কিন্তু আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আমি আপনাকে এখনো মনে করি না। ১ এপ্রিল রাত্রিবেলা আমি হাজী মুহিবুল্লাকে তার বাড়ি থেকে অপহরণ করবো। পারেন তো বাধা দেবেন। আপনি আমাকে ধরার জন্যে ফিরছেন। আপনাকে একটা সুযোগ দেয়া প্রয়োজন মনে করলাম।

ইতি—কুয়াশা।

জামান চিঠি পড়ে শেষ করে সেটা মি. সিম্পসনের হাতে ফেরত দিলো। মি. সিম্পসনের ঠোঁটে মৃদু হাসি। বললেন, 'আমার বিশ্বাস কুয়াশার দিন শেষ হয়ে

এসেছে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস মৃত্যুর কারণ হয়, কুয়াশারও তাই হয়েছে।'

একজন পুলিস অফিসার, নাম মোজাম্মেল হক, বললো, 'লোকটা স্যার, আমার মনে হয়, ধাপ্পা মেরে আমাদের 'এপ্রিল ফুল' করতে চাইছে।

'কুয়াশা কখনো কোনো বাজে কথা বলে না। দেখা যাক কি হয়...'

'কিন্তু স্যার...'

মোজাম্মেল হক বললেন, 'বাড়ির চারদিকে পুলিস পাহারা, আশেপাশের সব ক'টা গলির মোড়ে পুলিস, হাজী সাহেবের ঘরে পর্যন্ত দু'জন প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে...এ অবস্থায় কিভাবে কুয়াশা তার কাজ হাসিল করবে?'

'ব্যাপারটা অসম্ভবই মনে হচ্ছে...'

মি. সিম্পসন স্বভাবসিদ্ধ মৃদু কণ্ঠে বলেন, 'কিন্তু কুয়াশা চিরকাল অসম্ভবকেই সম্ভব করে এসেছে। ধরুন এমনও হতে পারে আপনিই কুয়াশা...পুলিস অফিসার মোজাম্মেল হক সেজে আমাদের চোখে ধুলো দিতে এসেছেন।'

'কি যে বলেন স্যার...'

মোজাম্মেল হক হেসে ফেলে, 'আপনার নিশ্চয়ই রাত জেগে চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। চা আনতে হুকুম দিই স্যার, কি বলেন?'

'খুবই চমৎকার প্রস্তাব।'

মি. সিম্পসন মৃদু হাসেন। জামানের দিকে তাকান। বলেন, 'আমার কথাগুলো খুবই হালকা বটে। কিন্তু সত্যের কাছাকাছি।'

রাত বেড়ে চললো। বাইরে টুপ টুপ শিশির ঝরছে। জানালার ফাঁকে অন্ধকার আমগাছের উপর কৃষ্ণপক্ষের রক্তিম চাঁদ শেষ রাতের হাওয়ায় কাঁপছে। মাঝে মাঝে টহলদার পুলিসের হুইসেল শোনা যায়। কোথাও রাতের নির্জনতা ভেদ করে কুকুর ডেকে ওঠে। ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে আসে পুলিস অফিসার মোজাম্মেল হকের চোখ। বারবার হাই ওঠে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। সিগারেট টানতে টানতে মি. সিম্পসনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'রাত তো চারটে বাজতে চললো, স্যার। কোথায় আপনার কুয়াশা?'

তরিক হোসেনের দিকে তাকিয়ে মি. সিম্পসন শুধু হাসেন। মি. হক বলে, 'চোর-ছ্যাঁচোড়দের আস্ফালন একটু বেশিই হয়, স্যার। একবার আমি যখন টাঙ্গাইলের ও. সি. তখন এক ডাকাত ব্যাটা এই রকম বড়াই করে চিঠি ছেড়েছিল। আমি স্যার দারুণ খেপে গেলাম। ব্যাটাকে অবশ্য 'ক্যাচ' করতে পারিনি। যদি পারতাম, খোদার কসম স্যার, ওর হাড়-গোড় আস্ত রাখতাম না। বেআদবির একটা সীমা থাকা দরকার।'

তরিক হোসেন উঠে হাজী মুহিবুল্লা যে ঘরে আছে সে ঘরের দিকে চলে গেল। জামান দেখলো মি. সিম্পসন কথা বলছেন না। নিঃশব্দে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

জামানের অস্বস্তি লাগছিল। সে ঘর থেকে বাইরে এলো। বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলো।

শফি সঙ্গে থাকলে ভালো হতো। গল্প করা যেতো। অবশ্য শফি এখন বহু বদলে গেছে। আগের মতো গল্পগুজব জমবে না। এই নিঝুম রাত শেষ হলেই ভালো। সবটা ব্যাপারই জামানের কাছে কেবল একটা ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে। গত রাতে মি. সিম্পসন ও তার সহকারী তরিক হোসেন রাজশাহী গিয়েছিলেন। এয়ারপোর্টে গিয়ে ওদের সি-অফ করেছিল জামান। আজ রাত দশটায় হঠাৎ মি. সিম্পসনের টেলিফোন।

'জামান, আমি আর তরিক ১৬৮, ডেঙ্গু খাঁ লেনে হাজী মুহিবুল্লার বাড়িতে বসে আছি। তুমি চলে এসো।'

টেলিফোন পেয়ে অবাক হয়েছিল জামান। বলেছিল, 'ব্যাপার কি? এই না কাল আপনি রাজশাহী গেলেন?'

টেলিফোনে হাসির শব্দ পওয়া গিয়েছিল, 'তাতে কি হয়েছে? রাজশাহী থেকে আমি ফিরে আসতে পারি না? শোনো জামান, হাজী মুহিবুল্লার বাড়ি আজ আক্রান্ত হবে। আমি আজ সাড়ে আটটায় প্লেন থেকে নেমে বাড়ি এসেই কুয়াশার চিঠি পেয়েছি। তুমি আর দেরি করো না। চলে এসো। বেশ ক'জন পুলিস অফিসারও এসেছেন। ইচ্ছা করলে তোমার বন্ধুটিকেও নিয়ে আসতে পারো। কুয়াশার নাম করে রাতটা এসো উপভোগ করি।'

হেসেছিলেন মি. সিম্পসন।

দেরি করেনি জামান। চলে এসেছে হাজী মুহিবুল্লার বাড়িতে। শফিকে সঙ্গে আনতে চেয়েছিল। শফি আসতে রাজি হয়নি। হাজী মুহিবুল্লার বাড়ি এসে মি. সিম্পসনসহ আরো দু'একজন, পরিচিত অফিসারও দেখতে পেয়েছে জামান। সব দেখে-শুনে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে এটা কুয়াশার একটা ভাঁওতা। বিপুল পুলিস বেষ্টনী থেকে হাজী মুহিবুল্লাকে অপহরণ করা শুধু অসুবিধাজনক নয়, অসম্ভব। মি. মোজাম্মেল হকের কথাই সত্য। কুয়াশা চিঠি দিয়ে ১ এপ্রিলে একটা উঁচু দরের মজা করতে চায়।

সে পায়চারি করতে লাগলো। হঠাৎ দেখলো পাঁচিলের কাছে একটা লাল বাতি জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল। জামানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'কে?'

কোনো প্রতি উত্তর এলো না। শুধু মনে হলো কি একটা ভারি বস্তু যেন নিচে পড়ে গেল।

জামান কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর দ্রুত পায়ে হাজী মুহিবুল্লার ঘরের দিকে গেল। যা দেখলো তাতে ভয়ে, বিস্ময়ে সে অভিভূত হয়ে রইলো। দেখলো পাঁচজন গুণ্ডামার্কা লোক হাজী মুহিবুল্লাকে নিয়ে ভাঙা জানালা দিয়ে সরে পড়ছে। কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারার দুর্বৃত্ত চারদিকে পাহারা দিচ্ছে। পুলিসের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। দুর্বৃত্তদের একজন ছুটে এলো জামানের দিকে। জামানের প্রচণ্ড একটা লাথি গিয়ে পড়লো লোকটার তলপেটে। লোকটা 'ক্যাক' করে একটা শব্দ করে ঘুরে গিয়ে পড়লো মাটিতে। পিছনে তাকাতেই চোখে পড়লো জনা দুই। ছুরি হাতে একজন ছুটে এলো···চকিতে বাঁ পাশে সরে গিয়ে লোকটার ডান হাত মুচড়ে ভেঙে দিলো জামান। নিঃশ্বাস ফেলার জো নেই। পরমুহূর্তে মুখোমুখি হতে হলো হান্টার হাতে দ্বিতীয় লোকটার। হান্টারের একটা বাড়ি লাগলো জামানের কাঁধে। মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিল বলে কাঁধে লাগলো, নতুবা তখুনি মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যেতো। কাঁধটা অবশ হয়ে গেল···ঝিম ঝিম করতে লাগলো সারা শরীর। লোকটা আবার হান্টার ওঠাতেই চোখের পলকে জামান অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর উপর। দুটো বিরাশী সিক্কার ঘুসি খেয়ে হান্টার ছেড়ে টলতে টলতে নেতিয়ে পড়লো লোকটা। লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। মাথা তুলে বোধহয় চেঁচাতে যাচ্ছিলো, জামানের বুটসুদ্ধ পায়ের লাথি পড়লো ওর মুখে। মুখটা থেতলে গেল। আর কোনো শব্দ পাওয়া গেল না।

হাঁপাচ্ছিল জামান। সবটা ব্যাপার তার কাছে ভৌতিক মনে হচ্ছিলো। মি. সিম্পসন, মি. হক, ডজন ডজন পুলিস···কোথায় সব?

পিস্তলটা সে হাতে নিয়েছে এতক্ষণে।

কাঁধটা অবশ হয়ে আছে। জামানের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কুয়াশা কি তাহলে এসেছে? সে মুহিবুল্লার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মেয়েরা আছে উত্তর দিকের বড় বারান্দার ওপারের ঘরগুলোতে। বিশাল, নির্জন বাড়িতে এতো বড় কাণ্ডটা হয়ে গেল, অথচ কারো সাড়া শব্দ নেই। মুহিবুল্লার ঘরে গিয়ে দেখলো বিছানা শূন্য। পাশের দুটো বড় বড় জানালার শক্ত, মোটা শিকগুলো গোড়া থেকে কাঁটা।

কুয়াশা তাহলে তার কথা রক্ষা করতে পারলো?

সে আবার ফিরে এলো বারান্দা ধরে ড্রয়িংরুমে। ড্রয়িংরুমের সোফায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন মি. সিম্পসন, মি. মোজাম্মেল আর চারজন পুলিস অফিসার। মাথার উপর ফ্যানটা ঘুরছে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নক্ষত্রখচিত শেষ রাতের শান্ত আকাশ।

অনেক ডাকাডাকির পর মি. সিম্পসন উঠলেন। মোজাম্মেল হক উঠতেই চায় না। মোটা মানুষ···ঘুমকাতুরে। ঠেলা খেয়ে প্রথম ভাবলো বুঝি মশা কামড়াচ্ছে। সে কাঁধে

একটা চাপড় লাগালো। তারপর ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে মশার গুষ্ঠি উদ্ধার করতে লাগলো। বেশ কয়েকটা জোর ধাক্কার পর উঠলো। চোখ রগড়াতে লাগলো বিরক্ত মুখে। বললো, 'কি সায়েব, কি হয়েছে···চিৎকার করছেন কেন?'

জামান বললো, 'হাজী মুহিবুল্লাকে নিয়ে গেছে···'

'নিয়ে গেছে, বলেন কি?'

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে পুলিস অফিসার মোজাম্মেল হক। এতক্ষণে অন্যান্য অফিসারেরাও উঠে বসেছে। মি. সিম্পসন আগেই উঠে বসেছেন, তাঁর চোখ-মুখ গম্ভীর।

মোজাম্মেল হক বললো, 'আশ্চর্য!'

আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম···Why?

আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম কেন? কি হয়েছিল আমাদের? পাগলের মতো পায়চারি করতে লাগলো মি. মোজাম্মেল হক। বললো, 'ও বুঝেছি, রাত চারটের দিকে একবার চা পান করেছিলাম।'

'আর সে চায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন আপনি···' মি. সিম্পসনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর থমথম করে ওঠে।

'আমি!'

মোজাম্মেল হক বিভ্রান্ত হয়ে ছটফট করে। '···হ্যাঁ, পাশের স্টোর রুমে গিয়ে একটা পিয়নকে ডেকে আমিই চা দিতে বলেছিলাম বটে। আর দেখতে পাচ্ছি চা খেয়েই আমরা সবাই ঢলে পড়েছি ঘুমে! কিন্তু তাই বলে আমি ···কি বলছেন আপনি···চা খাওয়াবার পেছনে আমার কি মতলব ছিলো? আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেন, মি. সিম্পসন?

জামানের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে একটুকরো তির্যক হাসি। পিস্তলটা সে তুলে ধরে মি. সিম্পসনের দিকে। বলে, 'হ্যাণ্ডস আপ কুয়াশা···হাত তুলে দাঁড়াও···'

মুহূর্তে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায় মি. সিম্পসনের চোখ-মুখ, তার হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ওপরে ওঠে।

'তোমার চালাকি বুঝতে একটু দেরি হলো বটে···' জামান দাঁতে দাঁত ঘষে, 'আর হাজী মুহিবুল্লাকে সেই সুযোগে সরিয়ে ফেলেছো! কিন্তু এবার পেয়েছি তোমাকে! নড়াচড়ার চেষ্টা করো না—মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে অতো তাড়াতাড়ি বাধ্য করো না আমাকে···'

'কি বলছো জামান···'

মি. সিম্পসন কথা বলার চেষ্টা করেন।

এদিকে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে পুলিস অফিসার মোজাম্মেল হকের মুখ। অন্যান্য অফিসারেরাও বিস্ময়ে অভিভূত।

জামান বললো, 'আমি ঠিকই বলছি, কুয়াশা। তোমার জালিয়াতি বুঝতে আর বাকি নেই। তোমার ছদ্মবেশ ধারণের পদ্ধতিটা বৈজ্ঞানিকই বটে…একটুও সন্দেহ করার উপায় নেই। কিন্তু খুঁত একটু আছে…তোমার গলার স্বর মি. সিম্পসনের চেয়ে খানিকটা মোটা…সর্বক্ষণ সিম্পসনের ভাব-ভঙ্গি, স্বর নকল করার চেষ্টা করেছো; ধাঁধাও লাগিয়ে দিতে পেরেছো আমাদের চোখে, কিন্তু দেখলে তো শেষ পর্যন্ত ধরে ফেললাম। কুয়াশা, তোমার কথাই সত্যি। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই তোমার মৃত্যু ডেকে এনেছে। অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা তোমাকে দিয়ে আর হলো না…'

হতভম্ব মোজাম্মেল হক বললো, 'আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, মি. জামান!'

'এখন কিছু বোঝার চেষ্টা করবেন না, মি. মোজাম্মেল। দয়া করে মি. সিম্পসন-রূপী কুয়াশাকে বেঁধে ফেলুন। যাকে আপনারা মি. সিম্পসন বলে জানেন তিনি এখন রাজশাহী আছেন।'

'আমাদের চোখে তাহলে মি. সিম্পসন সেজে ভাঁওতা দিয়েছে লোকটা। উঃ, কি আশ্চর্য…'

মোজাম্মেল হক রাগে তড়পাতে থাকে। বলে, 'হাজী মুহিবুল্লাকে সরিয়ে নিয়েছে বটে…কিন্তু রঙের টেক্কা আমাদের হাতে। আর যাবে কোথায়?'

হঠাৎ অতর্কিতে একটা লাঠির বাড়ি পড়লো জামানের কব্জির উপর। ছিটকে পড়ে গেল পিস্তলটা হাত থেকে। মেঝের উপর পড়ে চলে গেল সেটা ঘরের এক কোণে।

এই সুযোগে মি. সিম্পসন বোধহয় পালাতে চাইছিল। মোজাম্মেল হক আর পুলিস অফিসারদের হাতে চকচক করে ওঠে উদ্যত রিভলভার। সব ক'টা পিস্তলের চোখ মি. সিম্পসনরূপী দুর্বৃত্তের দিকে। হাসতে হাসতে মোজাম্মেল হক বলে, 'Here you are, Kuasha! Do'nt move.'

এই সময় ঘরে ঢুকলো তরিক হোসেন। এমন অতর্কিতে ঢুকলো যে সবাই হকচকিয়ে গেল প্রথমটায়। চোখের ঘোর কাটতেই একজন অফিসার রিভলভার তুলে ধরলো তার দিকে। বললো, 'You are under arrest. তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। নড়াচড়া করো না…সাবধান…'

তরিকের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। সে ধীরে সুস্থে এগিয়ে গিয়ে জামানের পিস্তলটা কুড়িয়ে নিলো মাটি থেকে। অফিসারটি রিভলভারের ট্রিগার টিপলো তরিক হোসেনকে লক্ষ্য করে। কিন্তু 'ক্লিক' করে মাত্র একটা শব্দ হলো…কোনো গুলি

বেরোলো না।

'তোমাদের সব ক'টা রিভলভারের গুলি এখন আমার কোটের পকেটে। তোমরা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়লে তখন ওগুলো আমি বের করে রেখেছিলাম...'

মি. সিম্পসনরূপী লোকটা হাত নামিয়ে এবার সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এ পাশে সে নিজে, ওপাশে তরিক হোসেন। দু'জনের হাতেই উদ্যত পিস্তল।

তরিক হোসেন ঘুরে দাঁড়িয়ে জামানের উদ্দেশে বললো, 'কুয়াশাকে তুমি দেখতে চেয়েছিলে, জামান। আমি কুয়াশা। তোমাকে নিজের স্বরূপ দেখাতে পারলাম না বলে দুঃখিত...'

জামানের চোখে আগুন জ্বলে উঠলো। বললো, 'তোমার দুঃখ একদিন আমি নিজেই দূর করবো, কুয়াশা। তোমার সব ছদ্মবেশ টেনে খুলে দুনিয়ার সব মানুষের সামনে তোমার মূর্তিটা তুলে ধরবো। মনে রেখো কুয়াশা, আমার হাত থেকে তোমার মুক্তি নেই। আজ হোক, কাল হোক...প্রতিশোধ আমি নেবোই।'

গম্ভীর হয়ে উঠলো কুয়াশা। ভারি গলায় আস্তে আস্তে বললো, 'তোমার ক্ষতির জন্যে আমি দুঃখিত নই, জামান। সময় এলে তুমিও বুঝবে নীতি আর আদর্শ কুয়াশারও আছে। আরও বুঝবে, কুয়াশাকে ধরা যায় না।'

দু'জন লোক এসে ঢুকলো ঘরে। কুয়াশার ইঙ্গিতে একে একে সকলের হাত, পা আর মুখ বেঁধে ফেলে লোক দুটো। কুয়াশা বলে, 'মি. হক, আমরা যখন রাস্তা দিয়ে যাবো তখন মোড়ের পুলিসের সঙ্গে দেখা হবে। তাদের দু'একজনকে না হয় আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। ওরা এসে আপনাদের বাঁধন খুলে দেবে। ততক্ষণ একটু কষ্ট করুন। ইতিমধ্যে দলবল নিয়ে আমরা আপনাদের আওতার বাইরে চলে যেতে পারবো নিশ্চয়ই।' তরিক হোসেনরূপী কুয়াশা আর সিম্পসনরূপী মান্নান বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

রাত এখন ফুরিয়ে গেছে। পুবের আকাশে একটু একটু রঙ ফুটতে শুরু করেছে।

আট

'সব কথা আমাকে খুলে বলো।'

'না, তা হয় না, লিলি।'

'কেন হয় না। তুমি আমাকে আপন বলে মনে করো না?'

লিলির এই অভিযোগে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো শফি। তারপর বললো, 'শুতে যাও লিলি, অনেক রাত হলো।'

'হোক। যতক্ষণ তুমি সব খুলে না বলবে ততক্ষণ এ ঘর থেকে এক পা নড়বো না।'

'লিলি।'

'না, না।'

চাপা কান্নায় ভেঙে পড়লো লিলি, 'আমি যাবো না। তুমি কতো আমাকে কষ্ট দিতে পারো আমি দেখতে চাই।'

দীর্ঘশ্বাস পড়লো শফির। আস্তে আস্তে বললো, 'আমার জটিল জীবনের সাথে কেন নিজকে যুক্ত করতে চাইছো, লিলি? তুমি সুন্দর, তুমি পবিত্র। প্রার্থনা করি আরো সুন্দর হোক তোমার জীবন। সমৃদ্ধ হোক। আমার অভিশপ্ত জীবনের সাথে নিজেকে জড়িত করো না।'

লিলি জবাব দিলো না। টেবিলের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

তখন রাত এগারোটা। শফির ঘরে আলো জ্বলছে। দীর্ঘ বারান্দায় সারি সারি চন্দ্রমল্লিকা আর পারশিয়ান গোলাপের টব। ঘরের উজ্জ্বল আলোর এক টুকরো গিয়ে পড়েছে উঠোনের সবুজ ঘাসে। জামান ফিরছিল বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরে। সে বাইরে থেকে এইমাত্র ফিরছে। হঠাৎ সে শফির মৃদুস্বর শুনতে পেলো। সব কথা বোঝা গেল না। শুধু একটা কথা সে শুনলো 'কুয়াশা'। জামান রুদ্ধশ্বাসে জানালার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। সজাগ হয়ে কান পাতলো।

লিলি কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো, 'কেন তুমি এই ভার নিতে গেলে?'

'আমি নিইনি, লিলি। ভাগ্যই আমার হয়ে এই ভার নিয়েছে। সারাজীবন যার কাছ থেকে উপকার পেয়েছি তার কথা কিছুতেই ফেরাতে পারলাম না। হয়তো পারবোও না।'

'কিন্তু তাই বলে একটা খুনে ডাকাতকে তুমি সাহায্য করবে!'

'লিলি,' শফি তেমনি মৃদুকণ্ঠে ডাক দিলো। বললো, 'রাত অনেক হলো, ঘরে যাও।'

'তুমি প্রতিজ্ঞা করো কুয়াশার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। তুমি আমার হাত ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো...'

শফি চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, 'আমি সর্বক্ষণ বিবেকের দংশন অনুভব করছি লিলি। এ যেন এক্ক শাখের করাত। আসতেও কাটে, যেতেও কাটে! আমি কিছুই স্থির করতে পারছি না।'

'কিন্তু কুয়াশার কাছ থেকে সরে তোমাকে আসতেই হবে...'

'আমি আসতে চাই। কিন্তু…'

'কোনো কিন্তু তোমার শুনবো না।…আমার সহজ যুক্তি—যে উপকার করে তার ঋণ শোধ করা তোমার ধর্ম, কিন্তু যে খুনে ডাকাত, উপকারী হলেও তাকে সাহায্য করা ঘোরতর অন্যায়। তার সংস্রব ত্যাগ করাই মনুষ্যত্ব।'

ব্যাকুল হয়ে উঠলো শফি। বললো, 'লিলি…প্লিজ, ব্যাপারটা ওভাবে নিয়ো না। সব কথা যদি বলতে পারতাম তাহলে কিসে আমার দ্বিধা তা বুঝতে পারতে। তুমি এ প্রসঙ্গ আর ভুলেও কখনো তুলো না। আমি যা বললাম তার কিছুমাত্র যেন তৃতীয় কারো কানে না যায়। তাহলে আমার অনিবার্য মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। তোমাকে কথা দিচ্ছি এ ব্যাপারে একটা ফয়সালা শিগগিরই আমি করবো। কুয়াশার কাছে জীবন-ভিক্ষা চাইবো আমি। বলবো আমি অক্ষম, আমি দুর্বল। আমাকে তোমার কাজ থেকে অব্যাহতি দাও। তুমি কিছুদিন অপেক্ষা করো লিলি। আমি দু'একদিনের মধ্যেই কুয়াশার সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

লিলি বোধহয় এবার পীর ছেড়ে উঠবে। জামান সাবধানে সরে এলো জানালার নিচে থেকে। নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়লো। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো চুপচাপ। তার বুক জ্বলতে লাগলো দারুণ উত্তেজনায়।

লিলির সঙ্গে শফির বিয়ে হোক, সবারই এই ইচ্ছা। শফি ভালো ছেলে। ভালো চাকরি করে। শিক্ষিত, ভদ্র, স্বাস্থ্যবান। জামানের সে বাল্যবন্ধু। ছোটবেলায় মা টিফিনবক্সে দু'জনার খাবার দিতেন। জামানকে বারবার বলে দিতেন…এই ভাগটা আমার শফির। তুই যেন সবটা খেয়ে নিস না রাক্ষস। আমার শফিকে দিস।

মায়ের সেই আদরের শফির তাহলে এই পরিণতি। হীন দস্যু কুয়াশার সঙ্গে তার গোপন আঁতাত? ছোটবেলা থেকে শফি যে রহস্যময় লোকটার কথা বলতো সে-ই তাহলে কুয়াশা।

ভাবতে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে ফেললো জামান। শফির কথাটা তার বেলায়ও কি নিদারুণভাবে সত্য! শাঁখের করাতের নিচে জামানের গলাও পড়েছে। এদিকে শফিকে এই মুহূর্তে সহ্য করতে পারছে না। অন্যদিকে লিলির কথা ভেবে শফির কোনো ক্ষতি করতে মন চাইছে না। শফি যদি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেই ক্ষতির বেদনা লাগবে লিলিরও হৃদয়ে। সারাজীবন লিলি অসুখী হয়ে থাকবে। তাহলে? কি করবে জামান?

সিগারেটটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে। ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলো। লিলি দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ায়। বলে, 'ভাইয়া, অতো রাত করেছো কেন? খেতে চলো।'

'আমি খেয়ে এসেছি বাইরে থেকে। তোর খাওয়া না হয়ে থাকলে খেয়ে নে।'

জামানের গলার স্বর একটু যেন রূঢ় শোনায়। লিলি একটু আহত হয়ে তাকালো তার দিকে। কিছু না বলে ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

নিঃশ্বাস চাপে জামান। না, লিলিকে আঘাত দিয়ে নিজেও সে স্বস্তি পাবে না। শান্তি পাবে না। শফিকে যে করে হোক রক্ষা করতে হবে। কিন্তু কুয়াশার সঙ্গে কোনো আপোস নেই।

কুয়াশাকে ক্ষমা করবে না সে কোনো অবস্থায়ই। কুয়াশাকে নিজের হাতে নিষ্ঠুরতম উপায়ে হত্যা করার জন্যে তার শরীরের প্রতিটি রক্ত বিন্দু সর্বদা চঞ্চল হয়ে আছে।

জামান ঠিক করলো শফির উপর চোখ রাখতে হবে।

নয়

দু'দিন পরের কথা।

রাত ন'টায় নিজের ঘর থেকে চুপিচুপি বেরোলো শফি। জামান বাড়ি নেই সে জানতো। তবু বারান্দা হয়ে গেটে আসার সময় অভ্যাসবশে জামানের ঘরের দিকে একবার তাকালো।

লিলি পেছন থেকে বললো, 'আমি পিছু ডাকছি না। ঠিক সময় যেন হুজুর ফিরে আসেন সেটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।'

শফি হাসলো।

লিলিও।

'একটু দেরি হবে। চিন্তা করো না, লক্ষ্মী!'

'তার মানে চিন্তায়ই ফেলে যাচ্ছ।'

শফি বললো, 'আমি দুঃখিত, লিলি। ফিরে এসে তোমাকে জাগাবো। তা যতো রাতই হোক না কেন।'

'পাগল নাকি? রাতের বেলায় সাবধান, ডাকাডাকি করো না। ছোটো চাচা ইতিমধ্যেই আমার নাম দিয়েছে শলি...'

'শলি? মানে?'

'মানে শফি'র শ, লিলির লি।'

দু'জনেই হাসে।

তারপর শফি গেট পার হয়ে রাস্তায় নামে। বাগানের ঝোপ থেকে দেয়াল টপকে জামানও নেমে আসে রাস্তায়। শফি আর লিলির সব কথাবার্তা কানে গেছে তার। শফির

ব্যাপারে লিলি এখন স্পষ্ট। যদি শফি বেরিয়ে আসতে পারে কুয়াশার জাল থেকে তাহলে শফির কণ্ঠেই পড়বে তার প্রণয় মালা। কুয়াশাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া এখন জামানের সবেচে' জরুরী কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাতৃহত্যার প্রতিশোধের সঙ্গে এখন যোগ হলো লিলির স্বপ্ন। কুয়াশা যদি বেঁচে থাকে তাহলে লিলির স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়িত হবে না। Kuasha must die.

শফি রাস্তায় গিয়ে ভাড়াটে ট্যাক্সি নেয়। ট্যাক্সি ছুটতে থাকে সাভারের দিকে। জামান আর একটা ভাড়াটে ট্যাক্সিতে করে অনুসরণ করতে লাগলো। শেষ চৈত্রের বাতাসে লেগেছে বৈশাখের ঝড়ের দোলা। সাঁ সাঁ করে হাওয়া কেটে ট্যাক্সি দুটো ছুটে চলেছে ঢাকা ছাড়িয়ে শহরতলির দিকে। ক্রমে শেষ হয়ে গেল নগর। শুরু হলো অরণ্য-লোকালয়। বড় বড় গাছপালা রাস্তার দু'পাশে।

হাওয়া কলকল করছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। দূরে দেখা গেল একটা স্তিমিত আলো। শফির ট্যাক্সি গিয়ে সেখানে থামলো। ট্যাক্সিওয়ালাকে আগেই দুটো দশ টাকার নোট দিয়ে রেখেছে জামান। শফি যখন ভাড়া গুণছে তখন জামান নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে দোকানের পেছনে। দূর থেকে যে আলোটা দেখা গিয়েছিল সেটা দোকান ঘরের হ্যারিকেন বাতির আলো। এক গম্ভীর চেহারার বুড়ো দোকানদার ক্যাশবাক্সের উপর খাতা রেখে হিসাব লিখছে।

দোকানটা মুদির। নিচে বেঞ্চির উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে শুকনো চেহারার বাচ্চা মতো একটা লোক। শফি গিয়ে বললো, 'তাল-মিস্রী আছে, নানা?'

'না!'

খেঁকিয়ে উঠলো বুড়ো। বললো, 'নানা বলবে তো তাল-মিস্রী কেন কুটোটি পর্যন্ত পাবে না আমার কাছ থেকে। নানা কেন শুনি···আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি?'

বেঞ্চিতে শুয়ে শুকনো মতো লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হাসলো।

বুড়ো ধমকে ওঠে বলে, 'ওরে ও হারামজাদা বলাই, তুই হাসছিস কেনে শুনি?'

'তোর কথা শুনে! শালার বলে তিন কুড়ির উপর বয়েস হলো গো, এখনো তেনি জোয়ান আছেন। খেঃ, খেঃ···'

বলাই হাসতে লাগলো। মাথা তুলে সে শফিকে দেখলো। বললো, 'না বুঝে নানা ডেকেছে হে। দিয়ে দাও শালার তাল-মিস্রী···'

'তোর আবার বলতে হবে নাকি, শুয়োর? আমার খরিদ্দার···কি দিতে হয় না হয় সে আমি বুঝবো।'

বুড়ো এইবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় শফির দিকে। বলে, 'কতখানি দেবো গো···আধসের···'

শফি বললো, 'না, একসের…'

বুড়ো দাঁড়িপালায় তাল-মিস্‌রী ওজন করতে করতে বলাইর উদ্দেশে বলে, 'বুঝলি বলাই চাঁদ…তেনার ভাগ্যি ভালো…ইস্টকে ভালো মাল আছে।'

বলাই চাঁদ কিছু না বলে গান ধরলো। পেছনে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে পড়লো জামান। ঢাকা থেকে শফি এতদূর ছুটে এলো সে কি এই একসের তাল-মিস্‌রী কেনার জন্যে? ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

তাল-মিস্‌রী দিয়ে বুড়ো দামের জন্যে হাত বাড়ায়। শফি পয়সা দিলে বুড়ো বলে, 'কতো দিলেন গো…'

'এক পয়সা কম দিলাম।'

দোকানের বেড়ার ফুটোয় চোখ রেখেছিল জামান। দেখলো কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে বেঞ্চে শোয়া বলাই চাঁদ। শফি তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারছি না…রাস্তাটা…'

চাপা গলায় বলাই বলে, 'চলুন, স্যার।'

শফি মাথা নিচু করে দোকান থেকে বেরোয়। তারপর সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারে।

জামান একটা আমগাছের গুঁড়ির সাথে মিশে গিয়ে তাকিয়ে রইলো যতদূর চোখ যায়। দেখলো শফি আর বলাই চাঁদের মূর্তিটা একটা ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেছে।

সে আস্তে আস্তে পিছু হটে অনেকদূর এলো। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো রাস্তার দিকে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তায়। জন-প্রাণী, গাড়ি-ঘোড়ার চিহ্ন মাত্র নেই। বহুক্ষণ পর একটা খালি ট্রাককে দেখা গেল ঢাকার দিকে ছুটে যেতে। সে চিৎকার করে গাড়িটাকে থামতে বললো। জবাবে ড্রাইভার গাড়ির স্পিড ত্রিশ মাইল থেকে বাড়িয়ে চল্লিশ মাইল করলো। জামান স্পষ্ট বুঝলো ড্রাইভার আর তার পাশের সঙ্গী এখন দরুদ পড়ছে। ডাকাত মনে করেছে জামানকে। জামান এতো কষ্টের মধ্যেও না হেসে পারলো না।

কিন্তু জামানের ভাগ্যই বলতে হবে। কিছুক্ষণ পর একটা ট্যাক্সি রাস্তা ঘেঁষে কাছে এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার অবাক হয়ে বললো, 'এখন তরি আপনে যান নাইক্যা। স্যার? গেরামে যাইবার লইছিলেন না? গেলেন না কেন?

যে ড্রাইভার ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছিল, জামান দেখলো কথা বলছে সেই ড্রাইভার।

জামান তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললো, 'মানিকগঞ্জ টাউন এখান থেকে কদ্দূর

বলতে পারো?

'মানিকগঞ্জ কি কইবার লাগছেন, স্যার∵সাভার থনে মোড় লইয়া রাস্তা আইচে টঙ্গীর দিকে। এইটা অইলো ময়মনসিং রোড, স্যার···এই এট্টু আগু বাড়াইলেই একটা পোস্ট অফিস পাইবেন। এউগা ভাতের হোটেল ভি আছে। পেট ভইর‍্যা খাইছি তয় বিল উঠছে সাত আনা।'

জামান বুঝলো ড্রাইভার খেতেই বাজারে গিয়েছিল। এইবার সে ঢাকা ফিরে যাচ্ছে। ট্যাক্সিতে সে উঠে বসে। বলে, 'আমারও খিদে পেয়েছে ড্রাইভার। বাজারে নিয়ে চলো। বাজারে পৌঁছে আগে যাবে হোটেলে তারপর পোস্ট অফিসে।

'ঠিক হ্যায়, স্যার···'

ড্রাইভার ট্যাক্সি চালিয়ে দেয়।

খাওয়ার পর পোস্ট অফিসে যায় জামান। সে খুশি হয়ে ওঠে। পোস্ট অফিসের লাগোয়া রয়েছে টেলিগ্রাম অফিস। সে গোটা তিনেক টেলিগ্রাম ফর্ম ক্লার্কের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে সবকিছু লিখে জানায় মিঃ সিম্পসনকে। মুদির দোকানের সাঙ্কেতিক কথাগুলোও বাদ দেয় না। টেলিগ্রামের মূল্য বাবদ মোট দাঁড়ালো চল্লিশ টাকা কয়েক আনা। ক্লার্ক লোকটা এমন দীর্ঘ টেলিগ্রাম দেখা দূরে থাক, কখনো কল্পনাও করেনি। সে সবিস্ময়ে জামানের দিকে তাকিয়ে রইলো। টেলিগ্রাম করতে পেরে নিজেকে হালকা লাগলো জামানের। ট্যাক্সি নিয়ে আবার সে ফিরে এলো মুদিখানার নিকটবর্তী রাস্তায়। টেক্সিওয়ালাকে আশাতিরিক্ত বখশিশ দিয়ে সে প্রায় ছুটতে ছুটতে এলো মুদিখানায়।

হয় প্রতিশোধ গ্রহণ না হয় মৃত্যুবরণ। শরীরের রক্ত-স্রোত উদ্বেল হয়ে উঠেছে। নিষ্ঠুরতম উপায়ে কুয়াশাকে হত্যা করতে চায় জামান। সারা শরীরে তার দাউ দাউ করে জ্বলছে জিঘাংসার আগুন।

শক্তি বোধহয় নাগালের বাইরেই চলে গেল। জামান মনে মনে আতঙ্কিত। বিপদের বন্ধু পিস্তলটা কোমরের কাছে একবার অনুভব করলো হাত দিয়ে। তারপর অর্ধেক ঝাঁপ বন্ধ করা দোকানের ভেতর গিয়ে ঢুকলো। মুদি তেমনি ক্যাশ বাক্সের উপর বসে হ্যারিকেনের আলোয় হাতের আঙুল গুণে গুণে হিসাব করছে গম্ভীর মুখে। দরজার কাছে একটা বেঞ্চে শুয়ে আছে বলাই চাঁদ।

তাল-মিস্‌রী আছে নানা?

বুড়ো মুদি ফিরে তাকালো। বলাই চাঁদ বেঞ্চে শুয়ে শুয়েই গলা বার করলো একবার।

মুদি রাগ করলো না। কলমটা কানে গুঁজে দাঁড়িপাল্লা হাতে নিলো। বললো,

'আছে। কতখানি লেবেন?'

'একসের...'

বলাই চাঁদ আর মুদির ভেতর দৃষ্টি বিনিময় হলো। কিন্তু কেউ কিছু বললো না। মুদি একসের তাল-মিস্‌রী মেপে হাতে দিলো জামানের। ফিসফিস করে বললো, 'পয়সা দেন।'

জামান পাঁচ টাকার একটা নোট ছেড়ে দিলো মুদির হাতের মুঠোয়। মুদি যেন হকচকিয়ে গেল। বেঞ্চ থেকে একবার মাথা তুলে দেখলো বলাই চাঁদ। জামান মরিয়া হয়ে বললো, 'এক পয়সা কম দিলাম।'

'তাই বলেন...'

গম্ভীর মুদি বুড়োর কোকলা দাঁতে আচমকা হাসি ফুটে ওঠে। ঝট করে উঠে দাঁড়ায় বলাই চাঁদ। জামান মুখস্থ বলার মতো বলে, 'অন্ধকারে দেখতে পাবো না রাস্তাটা যদি...'

অদ্ভুত গলায় বলাই চাঁদ বলে, 'চলুন স্যার, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

চষা খেতের উপর দিয়ে, ঝোপ-ঝাড় ভর্তি জঙ্গলের পা দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে তাকে নিয়ে চলে বলাই। কিছুদূর যেতেই চোখে পড়লো মাঠের ভিতর কয়েকটা হিজল গাছ। হিজল গাছের নিচে দুটো শূন্য চালাঘর। রাখালেরা গরু চরাতে এসে দুপুর বেলা এখানে বিশ্রাম নেয়। চালাঘরগুলোর উঁচু ভিটের নিচেই আছে একটা অর্ধ শুষ্ক জলাশয়। তীরের এদিক ওদিক ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কয়েকটা শিমূল আর কড়ুই গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

বলাই চাঁদ জলাশয়ের তীরে থামলো। হাত দিয়ে দেখালো একটা বোট। বললো, 'যান।'

এক বুক আশঙ্কা নিয়ে পা বাড়ায় জামান। চারদিকে ভৌতিক অন্ধকার। কার ইঙ্গিতে ক্ষুদ্রকায় বোটটা তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। বোটটা তীরে থামতেই একজন মাথা তুলে দাঁড়ালো। বললো, 'আসুন।'

পেছনে তাকিয়ে জামান দেখলো বলাই চাঁদ চলে গেছে। আকাশের নিচে অন্ধকার অরণ্যশঙ্কুল মাঠ, চারদিক থম থম করছে। সে নিঃশব্দে গিয়ে বোটে উঠলো। বেঁটে চওড়া কাঁধওয়ালা লোকটা জামানের হাত ধরে বোটের তলায় নিয়ে বসালো। আশ্চর্য হয়ে জামান দেখলো বোটের দুই প্রান্ত বেঁকে উপরে উঠছে। ক্রমে দুই প্রান্ত মিলে গেল। ভেতরে জ্বলে উঠলো হলুদ রঙের একটা আবছা আলো। বোটটা দেখতে হয়েছে গোলাকৃতি ডিমের মতো। ভিতরের সেই লোকটা দাঁত বার করে হাসলো জামানের দিকে তাকিয়ে কুৎসিত ভঙ্গিতে। বললো, 'কেমন লাগছে?'

জামানের ইচ্ছে করছিল এক ঘুসিতে ওর সবক'টি দাঁত ভেঙে দেয়। কিন্তু পড়েছি

যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। কোথায় আছি, কি অবস্থায় আছি এসব না জেনে এখন কিছু করা অনুচিত হবে না। তাই সে রাগ চেপে ডিম্বাকৃতি সেই অদ্ভুত বোটের ভিতর বসে রইলো।

কতক্ষণ এভাবে কাটলো সে জানে না। বোটটা একটু একটু দুলছিল। এক সময় একটা মৃদু ঝাঁকানির পর সেটা থেমে স্থির হয়ে গেল। আস্তে আস্তে পদ্মফুল যেমন পাপড়ি মেলে বোটটাও ঠিক তেমনি ভাবে উপর থেকে আস্তে আস্তে মুখ হাঁ করলো। দুই প্রান্ত সটান সোজা হয়ে থামলো। ঠিক আগের সেই বোট।

লোকটা বললো, 'দয়া করে আসুন।'

জামান বুঝতে পারলো না কোথায় সে আছে। মাথার উপর পাথরের ছাদ। নিচে নীল সরোবর। টলটলে পানির উপর কাগজের নৌকোর মতো বোটটা ভাসছে।

বোট থেকে নেমে এলো তীরে। পায়ের নিচে অসমান পাথর। আশপাশে যদ্দূর চোখ যায় আবছা আবছা অন্ধকার। অন্ধকার ভেদ করে কোত্থেকে যেন স্থানে স্থানে আলো পড়েছে।

বেঁটে, চওড়া কাঁধওয়ালা লোকটার পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করলো জামান। কিছুদূর গিয়ে সঙ্কীর্ণ হয়ে এলো পথ। পথের দু'পাশে শক্ত পাথরের দেয়াল। মাথার উপর নিচু ছাদ। হাত দিয়ে ছাদ স্পর্শ করা যায়। জামান বুঝলো একটা গুহার ভিতর দিয়ে ওরা চলেছে। কিছুদূর গিয়ে গুহা শেষ হয়ে গেল। উজ্জ্বল আলো লেগে চোখ ঝলসে গেল তার। পাশ ফিরে জামান দেখলো বেঁটে চওড়া লোকটা নেই, ভোজবাজির মতো কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কিন্তু বেঁটে সঙ্গীর কথা একটুও ভাবছিল না জামান। সে চারদিক তাকাচ্ছিল অবাক চোখ মেলে। যতো দেখছিল ততোই বাড়ছিল তার বিস্ময়। তার সামনে এক বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। বেশ অনেকটা দূরে পাথরে খোদাই করা এটা অট্টালিকার একাংশ চোখে পড়ে। মাথার ওপর তেমনি পাথরের ছাদ।

জামান হেঁটে চললো সামনে। এ কোথায় সে এসে পড়লো। বারবার চোখ কচলালো, 'এ কি স্বপ্ন না বিভ্রান্তি'? সে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলো আর স্পষ্ট হতে লাগলো অট্টালিকা। জন-প্রাণী নেই। নিথর, নিস্তব্ধ প্রাসাদ। এ যেন রূপকথার এক রাজত্বে এসে পড়েছে জামান।

শকি কোথায়? জামান একবার ভাবলো। কুয়াশার সন্ধানে সে এসেছিল। এ সবই কি তাহলে কুয়াশার কারসাজি?

সাহস হারালো না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে ঢুকে পড়লো প্রাসাদের ভিতর। প্রাসাদের বড় বড় কক্ষগুলো নির্জন হয়ে পড়ে আছে। কোনো কোনো কক্ষ আসবাব-

পত্র সজ্জিত। কোনো কোনো কক্ষে জন-প্রাণী বাস করে বলে মনে হলো। কিন্তু কক্ষের পর কক্ষ পার হয়েও কোথাও মানুষজন দেখলো না জামান।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো জামান। যা দেখলো তাতে ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠলো। দেখলো প্রাসাদের চত্বরে বিশালকায় এক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। উচ্চতায় কম করে হলেও দশ ফিট। সেই অনুযায়ী চওড়া। পরনে টাইট জাঙ্গিয়া। প্রশস্ত কাঁধ, দীর্ঘ উরু, মাংসল বুক। জামান তার সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চতায় লোকটার কোমর পর্যন্ত পৌঁছবে কিনা সন্দেহ।

লোকটা একঠায় দাঁড়িয়ে আছে সামনের দিকে তাকিয়ে। বিপরীত দিক থেকে আর একজন মানুষ হেঁটে এলো। উচ্চতায় সেও আট ফিটের কম নয়। মুখটা তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোরের মতো কচি। তার পেছনে পেছনে এলো চমৎকার সাহেবী পোশাক পরা স্বাভাবিক উচ্চতার দু'জন শ্বেতকায় লোক। ওরা এসে কি ইঙ্গিত করলো। দৈত্যাকৃতি লোক দুটি মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুলো। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ লোকটি নুয়ে পড়ে ওদের মেরুদণ্ডের গিট একটা যন্ত্র দিয়ে ঠুকতে লাগলো। দৈত্যাকৃতি লোক দুটো যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলো। কিন্তু বাধা দিলো না। অনড়, অচল হয়ে পড়ে রইলো।

দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গটি ইংরেজিতে বললো, 'শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বলতে চাও?'

'বুঝতে পারছি না। আর একবার চেক-আপ দরকার।'

'Growth-chart কি রকম?'

'Encouraging.'

'ব্যাস, তাহলে ওদের ডিপার্টমেন্টাল বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দাও। আমাদের observation-এ থাকুক আরো মাস ছয়েক।'

'ও-কে।'

বয়স্ক শ্বেতাঙ্গটি কি একটা ইঙ্গিত করলো আর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো দৈত্যাকৃতি লোক দু'জন। উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাত-পা ছুঁড়লো। তারপর যন্ত্রণায় রক্তিম চোখ-মুখ নিয়ে গোঙাতে গোঙাতে ওরা চলে গেল প্রাসাদের বিপরীত দিকের একটা পথ ধরে।

শ্বেতাঙ্গ দু'জন যন্ত্রপাতি নিয়ে আরো কিছুক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলো। তারপর প্রাসাদের বিপরীত পথ ধরে তারাও প্রস্থান করলো।

এ যেন কোন রোমাঞ্চকর নাটকের ভয়াবহ এক দৃশ্য দেখলো জামান। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো স্থানুর মতো।

ঠিক এ সময় করুণ কান্নার ধ্বনি ভেসে এলো তার কানে। শব্দটা আসছে প্রাসাদের কোনো কক্ষ থেকে। জামান সরু বারান্দা ধরে সাবধানে এগোলো।

থেমে গেল কান্নার শব্দ। পরিবর্তে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার মতো কুয়াশা উঠতে লাগলো মাটি ফুঁড়ে। আর সেই সঙ্গে চাপা ফিসফিস হাসি আর গুঞ্জনের শব্দ। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল জামানের। কোন্‌দিকে এগোবে কিছুই বুঝতে পারলো না। তার নিঃশ্বাস আটকে যেতে লাগলো। এদিকে চাপা হাসি আর গুঞ্জনের শব্দটা ক্রমেই বাড়ছে। শব্দটা শেষে কোলাহলে পরিণত হলো। জামান পাগলের মতো এই কুয়াশার জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ছুটতে লাগলো। যেখানেই যায় তুমুল হাসি আর কোলাহল, ধোঁয়া আর কুয়াশা। তখন সব ভুলে গেল জামান। পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলো। আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে এলো চেতনা। জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়লো মেঝেয়।

দশ

যখন জামানের জ্ঞান ফিরলো তখন দুগ্ধফেননিভ এক শয্যায় সে শায়িত, ঘরে আবছা নীল রঙের আলো জ্বলছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে কোমল হাতের বাজনার শব্দ।

সে উঠে বসলো বিছানায়। কি হয়েছিল ভাবতে চেষ্টা করলো। সব কথা, সব ঘটনা মনে পড়লো তার। কিন্তু সে কোথায় আছে বুঝতে পারলো না হাজার চেষ্টা করেও।

প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে তার। ঘড়ি দেখে সময় নির্ধারণের চেষ্টা করলো। দেখলো ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে দশটার কাঁটায়। সে উঠে দাঁড়ায়। এক পাশে তাকিয়ে দেখলো পাশের দরজায় কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে লেখা, 'ডাইনিং হল'।

ক্ষুধা তার প্রচণ্ড ছিলো বটে। কিন্তু খুধার তাড়নায় নয় দরজার দিকে সে এগিয়ে গেল প্রচণ্ড কৌতূহলে। গিয়ে দেখলো টেবিলে খানা তৈরি আছে। কয়েকটা বাটিতে নানারকম খাদ্য সুন্দরভাবে সাজানো। চমৎকার বালাম চালের গরম ভাত, মাংসের রোস্ট, কারী, মাছের কোপ্তা,...

ডাইনিং হলের বাঁদিকের দরজার আড়ালে পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে বেসিনের একাংশ দেখা যায়। উপরে ধোয়া তোয়ালে। জামান সম্মোহিতের মতো বেসিনে মুখ ধুয়ে নিলো। ডাইনিং টেবিলে বসে খাবার খেলো পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। খাওয়ার সময় তার বারবার মনে হচ্ছিলো যেন পাশের ঘরে কেউ একজন অপেক্ষা করছে, এক্ষুণি এসে যেন বলবে ভালো করে খেয়েছেন তো?

খেয়েদেয়ে আগের ঘরে ফিরে এলো। দেখলো শোবার খাটের শিয়রে রাখা তেপায়ার উপর কয়েক খিলি মিষ্টি পানের পাশে এক প্যাকেট চেস্টারফিল্ড সিগারেট। যন্ত্রচালিতের মতো সিগারেটের প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরালো সে। বসে বসে

সিগারেট টানতে লাগলো চুপচাপ।

সরোদের বাজনা আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কেন জানে না বহুকাল আগের একটা স্মৃতি মনে পড়লো জামানের। তখন সবে সে ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র। পরীক্ষার আগে প্রায় রাতের সে ঘুম থেকে উঠতো। পড়াশোনা করতো। রাত পুইয়ে গেলে সে নদীর ধারে যেতো বেড়াতে। সেখানে দেখা হতো এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ আর তার কিশোরী কন্যার সঙ্গে। মেয়েটি ভোরের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকতো চুপ করে। মেয়েটিকে ঘিরে কতোই না মিষ্টি স্বপ্ন দেখছিল জামান।

সরোদের কোমল, মিষ্টি বাজনা শুনে কিশোর বেলার সেই অনুভূতি বুকের ভিতর যেন আবার ফিরে এলো। একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস চেপে ওসব ভাবাবেগ মন থেকে দূর করে দিতে চেষ্টা করলো জামান। সে তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হওয়ার চেষ্টা করলো। ভাবলো এই প্রাসাদ, এই ঐশ্বর্য, আড়ম্বর,, আর ভয়াবহ এইসব পরিকল্পনা—এসব কার? জামান কোথায় এসে পড়লো?

ঠিক তখন সরোদের বাজনাটা থেমে গেল। সারা ঘরে বিরাজ করতে লাগলো দুঃসহ নিস্তব্ধতা।

একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো দেয়ালের কোথাও, 'Please proceed west-ward. পশ্চিম দিকে অগ্রসর হও, জামান।'

চারদিকে তাকালো জামান, কেউ নেই। অবাক হওয়ার মনও তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রায় যন্ত্রচালিতের ন্যায় সে অগ্রসর হলো পশ্চিম দিকে। প্রশস্ত, দীর্ঘ করিডর ধরে সে এগোলো। চারদিকে হলুদ রঙের আচ্ছন্ন ফ্যাকাসে আলো। ঘর, বারান্দা, পর্দা, সিঁড়ি সব যেন হাজার হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে আছে। করিডর পার হয়ে সে পৌঁছলো প্রাসাদের শেষ প্রান্তে। বারান্দার বাঁ পাশে, উপরে ওঠার সিঁড়ি। সেই গভীর, গম্ভীর, কণ্ঠস্বর আবার পিছনে থেকে বললো, 'Please go upstairs. ওপরে উঠে যাও।'

জামান উপরে উঠলো। উপরের দুই সারি নিস্তব্ধ ঘরের ভিতর টানা বারান্দা। বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল এক মূর্তি।

জামান চেঁচিয়ে উঠলো তাকে দেখে। দৌড়ে গেল তার দিকে। বললো, 'শফি, তুই?'

শফি হাসলো, 'হ্যাঁ, তোর জন্য অপেক্ষা করছি। ঘরের ভেতর আয়।'

ঘরের ভিতর সেইরকম আচ্ছন্ন নীল আলো জ্বলছে। চারদিকে জল-প্রপাত থেকে জল পড়ার মতো মৃদু একটানা ঝুপ ঝুপ শব্দ। দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসলো শফি আর জামান। শফির মুখটা আস্তে আস্তে কঠোর হয়ে উঠলো। সে বললো, 'তুই আমার পিছু

নিয়েছিলি কেন, জামান?'

জামান অবাক হলো। এটা কি তাহলে শফির আসল চেহারা? সে উত্তেজনা প্রকাশ করলো না। বললো, 'আমি তোর পিছু নিয়েছিলাম এটা যখন জানিস তখন কেন পিছু নিয়েছিলাম আশা করি, সেটাও জানিস।'

'জানি। কুয়াশার সন্ধান নেয়ার জন্যে তুই আমার পিছু নিয়েছিলি। কুয়াশা তোর মাকে হত্যা করেছিল, তুই চাইছিস কুয়াশাকে হত্যা করতে।'

'হ্যাঁ, এবং হত্যা করবই।'

জামান দাঁতে দাঁত ঘষলো।

শফির কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো অসহিষ্ণুতা। বললো, 'জামান, আমি তোকে সাবধান করে দিচ্ছি। এসব কথা আমার সুমুখে কখনো বলিস না।'

'ও, তুই তাহলে কুয়াশার চেলা হয়েছিস, দীক্ষা নিয়েছিস খুনিটার কাছে? বাঃ, বাঃ।' জামান তীব্র শ্লেষের হাসি হাসলো, 'একেই বলে চোরের বন্ধু বাটপার!'

শফি বললো, 'তুই নির্বোধ, তাই একথাটা বলতে পারলি, জামান। যদি জানতিস, বোটের সেই চওড়া কাঁধওয়ালা লোকটা তোকে খুন করতো, তুই রক্ষা পেয়েছিস শুধু কুয়াশার দয়ায় তাহলে একথা তুই বলতে পারতি না।'

জামান বললো, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, বোটের সেই লোকটার কাছে আমি ধরা পড়েছিলাম। তারপর কুয়াশার অদৃশ্য নির্দেশেই আমাকে এই প্রাসাদে আসতে হয়েছে। কুয়াশা আমাকে ইচ্ছে করলে খতম করে দিতে পারতো তাও আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু দয়া তো কখনো আমি চাইনি, শফি। যারা দয়া আর সাহায্যের কাঙালে সেই মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপের দলে তোর মতো লোকেরা থাকতে পারে, আমি নই। তুই জেনে রাখিস, শফি, আমি বেঁচে আছি শুধু কুয়াশার রক্তপাতের জন্যে।'

শফি হাসলো। বললো, 'বটে?'

জামান বিদ্রূপে কর্ণপাত না করে বললো, 'শফি, আমার শক্তি কতটুকু তা আমি জানি না। জানতেও চাই না। তুই আমার বাল্যবন্ধু, তোর কাছে আমার অনুরোধ, তুই আমাকে সাহায্য কর।'

শফি বললো, 'তোকে সাহায্য করা যে সম্ভব নয়, একথাটা জানাবার জন্যেই এই মুহূর্তে তোর মুখোমুখি হয়েছি জামান। আমরা বন্ধু ছিলাম বটে, কিন্তু মানুষের কাছে বন্ধুত্বের মর্যাদা সব সময়ই একমাত্র সত্য নয়। আমি মহত্তর আদর্শে এখন উৎসর্গীকৃত। মানুষকে অমর করার সাধনায় আমি কুয়াশাকে সাহায্য করবো বলে স্থির করেছি।

জামানের গলার স্বর কেঁপে ওঠে, 'কিন্তু লিলির এতবড় সর্বনাশটা তুই কেন

করলি, শফি? লিলি যে তোর জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

'জানি। লিলির জন্যে আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম। কুয়াশার কাছে এসেছিলাম মুক্তি-ভিক্ষা চাইতে। কিন্তু জামান, দুর্বলতা আমার কেটে গেছে। সামান্য নারীর প্রেম আর আমাকে টলাতে পারবে না। ত্যাগের মন্ত্রে এখন দীক্ষা নিয়েছি। আমার কাছে সবকিছুর মূল্য ফুরিয়ে এখন সবচে' বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বিজ্ঞান সাধনা। আমার যতটুকু সাধ্য আছে তা দিয়ে মানুষের কল্যাণের পথ আমি সুগম করে যেতে চাই।'

জামান তিক্ত হাসলো। বললো, 'একদিনেই যথেষ্ট বক্তৃতা শিখেছিস শফি। ঢের হয়েছে, আর না। তোদের মতো নিমকহারামদের জন্যে আমাকে আরো কিছুদিন বাঁচতে হবে। ভাবিস না তোর নীচতা আমি ভুলে যাবো।'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকায়। জামানের চোখে জ্বলছে জিঘাংসার আগুন। শফির চোখে-মুখে প্রতিজ্ঞার ছাপ। জামান তীব্র ঘৃণায় যেন পুড়িয়ে দিতে চাইলো শফির অস্তিত্ব। শফি কঠোর হয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো সামনে।

লাউড স্পীকারের শব্দ বেজে উঠলো ঘরের ভিতর। প্রথমে আস্তে, তার পরে স্বচ্ছন্দ ও সুস্থির ভঙ্গিতে একটা গভীর, মিষ্টি কণ্ঠস্বর বললো, 'জামান, যাকে হত্যা করবে বলে পাতালপুরীতে ঢুকেছো, আমি সেই কুয়াশা বলছি। জানি তুমি আমাকে ঘৃণা করো। তোমার ধারণা তোমার মাকে আমি হত্যা করেছি। তোমার ধারণা ভুল জামান…'

জামান চেঁচিয়ে উঠলো তীব্র আক্রোশে, 'You rascal! বাজে কথা বলো না! সাহস থাকে সামনে এসে দাঁড়াও!'

কুয়াশার গলার স্বর তেমনি শান্ত। বললো, 'হ্যাঁ, তোমার ধারণা ভুল। আমি আজ পর্যন্ত হত্যার জন্যে কাউকে হত্যা করিনি। কুয়াশা ক্রিমিনাল নয়, জামান, খুনী তো নয়ই।'

জামান তেমনি চেঁচিয়ে বললো, 'তুমি আমার মাকে হত্যা করেছো! তুমি ক্রিমিন্যাল, তুমি একটা জঘন্য খুনী।'

গম্ভীর হয়ে উঠলো কুয়াশার গলার স্বর, 'জীব-বিজ্ঞানের রহস্য ভেদ করার জন্যে বৈজ্ঞানিক গিনিপিগের শরীর কাটা-চেরা করেন, একে তুমি হত্যা বলো, জামান? আমার গবেষণার জন্যে প্রয়োজন ছিলো বহু জীবন্ত মানুষের শরীর। আমার এই গবেষণা সফল হলে মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারবে। মানুষকে অমর করার জন্যে আমার এই গবেষণাকে তুমি ক্রাইম বলো, জামান? তোমাদের সভ্য-জগৎ আমার এই সব কার্যাবলীকে অবশ্য ঐ নামেই অভিহিত করেছে, আমার গবেষণাকে তারা বলে Madness.…পাগলামি, আমাকে বলে পাগল, ক্রিমিন্যাল। মানুষের কথায় কিছু যায়

আসে না জামান। নীতি আর আইন মানুষেরই তৈরি। মহৎ আদর্শের জন্যে মানুষ নীতি আর আইন বদলায়, কল্যাণের জন্যে আমিও তাই করেছি। পুরাতন আইন ভেঙে নিজেই নিজের আইন তৈরি করেছি। আমার আইন মানুষের বৃহত্তম কল্যাণের জন্যেই গড়া। Accidentally—আকস্মিকভাবে তোমার স্নেহময়ী মাকে আমার আইনের বলি হতে হয়েছে। একে আমি ত্যাগ বলবো জামান, বলবো মহত্তর কল্যাণের জন্যে ক্ষুদ্রতর আত্মত্যাগ…একে হত্যা বলবো না।'

জামান দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, 'শয়তান, তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে! অপেক্ষা করো।'

কুয়াশা একটু হাসে। বলে, 'Accidentally' তোমার মা যেমন আমার শিকার হয়েছেন, সেভাবে আমার নিজের হাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে আমার বাবাকেও। এ জন্যে আমার দুঃখ আছে, কিন্তু অনুশোচনা নেই।'

একটু থেমে কুয়াশা বলে, 'তোমার দুঃখ গভীর তা আমি জানি জামান। আমাকে ভুল বুঝো না। অবশ্য কিছু যায় আসে না ভুল বুঝলেও। আমার মহা-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত আমার কাজ আমি করে যাবোই। দুনিয়ার কোনো শক্তিকে আমি পরোয়া করি না।'

জামান বললো, 'মি. সিম্পসন সেজে তোমার শিষ্য বলেছিল অতি আত্মবিশ্বাস মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে। কথাটা আমি বিশ্বাস করি। তোমার দিনও শিগগিরই ঘনিয়ে আসছে। আইন ভঙ্গ করার জন্যে আর নর-হত্যার জন্যে সভ্য পৃথিবী তোমাকে শাস্তি দেবেই। মৃত্যুদণ্ড থেকে তোমার রেহাই নেই। যাক সে কথা, আমাকে তুমি বন্দী করেছো কেন?'

লাউড স্পীকারে কুয়াশার গম্ভীর কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো, 'তোমার বন্দীত্ব তুমি নিজেই ডেকে এনেছো। এজন্যে আমি দায়ী নই। আমি বরং তোমাকে রক্ষা করেছি।'

'কিন্তু তোমার দয়া আমি চাইনি কুয়াশা। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তোমার দয়াকেও ঘৃণা করি। তুমি বরং আমাকে হত্যা করো।'

'মানুষকে আমি ভালবাসি, জামান। মানুষের দুর্বলতা ক্ষমা করার মতো শক্তি আমার আছে। তোমার মাকে আমি হত্যা করেছি, আমার প্রতি তোমার ঘৃণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমার এই পাতালপুরীতে কিছুদিন তুমি থাকো, স্বাধীনভাবে এখানে চলাফেরা করো। দেখবে যতখানি আমাকে তুমি ঘৃণা করো ততখানি ঘৃণার পাত্র আমি নই।'

কুয়াশার স্থির কণ্ঠস্বর বাজতে লাগলো, 'তুমি পাতালপুরীতে আপাততঃ বন্দী। কিন্তু এখানকার প্রতিটি মানুষ জানে তুমি আমার সম্মানিত অতিথি। এই পাতালপুরীর

যেখানেই যাবে সেখানেই অতিথির সম্মান পাবে তুমি। এ পর্যন্ত এই সম্মান কুয়াশার কাছ থেকে আর কেউ পায়নি। তোমার যদ্দিন খুশি এখানে থাকতে পারো।'

জামান বললো, 'মনে রেখো যে কয়েকটা মুহূর্ত এখানে থাকবো সে ক'টি মুহূর্ত তোমার সর্বনাশ করার চেষ্টাই করবো আমি। তোমার দেয়া সম্মান আমার কাছে মূল্যহীন।'

হাসির আওয়াজ বেজে ওঠে মাইক্রোফোনে। কুয়াশা বলে, 'ক্ষতি করবে? দেখা যাক। শেষ কথা বলি, জামান। যেদিন তুমি ফিরে যেতে চাইবে সেইদিনই তোমাকে সম্মানের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়া হবে বাড়ি। আচ্ছা, শুভ-সন্ধ্যা।'

লাউড স্পীকার স্তব্ধ হয়। জামান তাকিয়ে দেখলো ইতিমধ্যে শফিও চলে গেছে ঘর ছেড়ে। ঘরের ভেতর সে একা।

এগারো

রহস্য-পুরীর গোলক ধাঁধায় নতুন করে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো জামানের মনে। এই পাতাল থেকে বেরোবার কোনো উপায় হয়তো নেই। কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে হলেও কুয়াশার গর্বিত শির কি ধুলায় লুটিয়ে দিতে পারা যায় না?

জামানের সময় কাটতে লাগলো এই দুঃসহ অস্থিরতার ভিতর। এই পাতালপুরীতে কখন দিন আসে, কখন রাত নামে কিছু বোঝার উপায় নেই। পাতালপুরীর সর্বত্র হলুদ আলো জ্বলছে। এখানে সময়ের চেহারা একই রকম। জামান উপাদেয় খাবার খেলো। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ঘুমালো। শুয়ে বসে কাটালো অনেক সময়। তারপর মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুরতে বেরোলো সে পাতালপুরীর অলিতে গলিতে।

প্রাসাদের কয়েকটা কক্ষ পার হয়ে সামনে পা দেবে অমনি দেয়ালে বেজে উঠলো লাউড স্পীকার। কে একজন বললো, 'ওদিকে যাবেন না।'

জামান বললো, 'কেন?'

লাউড স্পীকার শোনা গেল, 'ওটা হচ্ছে শাস্তি ঘর। এই ঘরের ভিতর ভুল করে সেদিন আপনি ঢুকে পড়েছিলেন। মূর্ছিত অবস্থায় আপনাকে ঐ ঘর থেকেই টেনে আনা হয়েছিল।'

জামানের মনে পড়লো সেদিনের কথা। ঘরে ঢুকেই সে ফিসফিস কথা, হাসি আর কান্নার শব্দ শুনেছিল। শব্দটা একবার বাড়ে একবার কমে…এক সময় আচমকা ঝড়ের মতো প্রবল হয়ে দাঁড়ায় আর একবার থেমে যায় মুহূর্তেই। সুস্থ ও শক্তিশালী যে কোনো মানুষকেই মিনিট দুয়েকের ভিতর পাগল করে দেবার পক্ষে ঐ শব্দটা যথেষ্ট।

সে বাঁপাশে ঘুরে হাঁটতে লাগলো। কুয়াশা শক্তিশালী সন্দেহ নেই। প্রতি দেয়ালে সে C-CTV ক্যামেরা সংযুক্ত করেছে, যার সাহায্যে প্রাসাদের প্রতিটি প্রাণীর গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। প্রতি দেয়ালে রয়েছে লাউড স্পীকার।

কুয়াশার পরিকল্পনায় কোনো ভুল নেই।

সে হাঁটতে হাঁটতে প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালো। জায়গাটা উঠানের মতো। উঠানের অপর পারে একটা দোতলা বাড়ির একাংশ দেখা যায়। উঠানে শুয়ে আছে তিনজন দৈত্যাকৃতি মানুষ, দৈর্ঘ্যে তারা হবে আট থেকে দশ ফিট। দু'জন শ্বেতাঙ্গ যন্ত্র দিয়ে তাদের শরীর পরীক্ষা করছে।

জামান অসঙ্কোচে এসে দাঁড়ালো শ্বেতাঙ্গ দুটির সামনে। প্রথমে ওরা হকচকিয়ে যায়। ঠিক এই মুহূর্তে ওদের বুক পকেটে রাখা ঘড়ির এলার্ম বেজে উঠলো মৃদু শব্দে। এক মুহূর্ত বেজেই থেমে গেল শব্দটা। জামান বুঝলো শব্দটা আসলে একরকমের সঙ্কেত।

শ্বেতাঙ্গ দু'জনই পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটি ফিরে দাঁড়ায় জামানের দিকে। পরিষ্কার গলায় বলে, 'তুমি আমাদের কাজের ব্যাপারে কিছু জানতে চাও?'

'হ্যাঁ। তোমরা কি করছো এসব?'

শ্বেতাঙ্গটি বলে, 'আমরা মানব শরীরের স্পাইনাল কর্ডের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছি। আমাদের এমন কিছু সংখ্যক লোকের দরকার যাদের দৈর্ঘ্য বারো থেকে চোদ্দ ফিট। মেরুদণ্ডের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে ইতিমধ্যেই আমরা আশানুরূপ ফল পেয়েছি। যে তিনজন দৈত্যাকৃতি মানুষকে তুমি দেখতে পাচ্ছো ওরা প্রত্যেকেই দৈর্ঘ্যে ছিলো মাত্র পাঁচ ফিট এক ইঞ্চি। উপযুক্ত ব্যবস্থায় এদের দৈহিক উচ্চতা বাড়িয়ে আট ফিটের ওপর আনা হয়েছে।

হঠাৎ তিনজন দৈত্যাকৃতি মানুষ করুণ আর্তনাদ করে উঠলো। ওদের নগ্ন পিঠের উপর চালানো হয়েছে একটা করে সাঁড়াশি ধরনের লোহার তৈরি যন্ত্র। আর্তনাদ শুনে দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গটি ধমকে উঠলো। ধমকে কাজ হলো বটে। আর্তনাদের শব্দটা থেমে গেল। কিন্তু জামান লক্ষ্য করলো হতভাগ্য দৈত্যাকৃতি মানুষগুলোর চোখ–মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত আর রক্তিম হয়ে উঠেছে। তিনজনের ভিতর একজনের বয়স এগারোর বেশি নয়। তার মুখ যন্ত্রণায় হাঁ করা, চোখ অর্ধেক বোজা…চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

এই দৃশ্য আর দেখতে পারছিল না জামান। সে শ্বেতাঙ্গ দু'জনকে শুষ্ক ধন্যবাদ জানিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালো।

উঠান পার হয়ে ছোটো দোতলা বাড়িটাতে ঢুকলো জামান। কেউ কোথাও নেই।—

ঘরের ভিতর হলুদ আলো জ্বলছে।

অদৃশ্য দুটি চোখ সর্বদাই অনুসরণ করছে জামান জানতো। সে বললো, 'এই বাড়ির রহস্য জানতে চাই।'

লাউড স্পীকার চালু হলো। টুকটুক শব্দ উঠলো প্রথমে। তারপর পরিচিত কণ্ঠস্বরটি বললো, 'এই বাড়ির নাম হচ্ছে মাস্ক স্টোর। এই বাড়ির যিনি পরিচালক তিনি পৃথিবী-বিখ্যাত একজন রসায়নবিজ্ঞানী। তাঁর অধীনে পৃথিবীবিখ্যাত আরো পঞ্চাশজন বিজ্ঞানী কাজ করছেন।'

'কি কাজ করছেন?'

এ্যামপ্লিফায়ারে সামান্য হাসির আভাস পাওয়া যায়। লোকটা বলে, 'কাজের কথা জিজ্ঞেস করছেন? দোতলায় উঠে যান। নিজেই বুঝতে পারবেন।'

জামান সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো। ঢুকতেই যে ঘর পাওয়া গেল সে ঘর ড্রয়িংরুম হিসাবে ব্যবহৃত হয় বোঝা গেল। দেয়ালের গায়ে অনেকগুলো বড় বড় কাচের আয়না। লাউড স্পীকার বেজে উঠলো, 'ডান পাশের সোফায় বসুন।'

জামান বসলো। দেয়াল আয়নায় তার ছবি ভেসে উঠলো। বহুদিন পর নিজের প্রতিমূর্তি দেখলো জামান আর 'আমি তাহলে বেঁচে আছি' এই অনুভূতি তীব্রভাবে খেলে গেল তার শরীরের শিরা-উপশিরায়। মায়ের কথা, ঘর-বাড়ির কথা, লিলির কথা মনে পড়লো। এই বন্দী জীবন কদ্দিন চলবে কে জানে? কুয়াশার দয়া ভিক্ষা প্রাণ গেলেও করবে না জামান।

জামান আয়নায় নিজের মূর্তি দেখলো আর কিভাবে কুয়াশার পাতালপুরী থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ভাবলো। ঠিক এই সময় খাবার ট্রে নিয়ে যে লোকটা ঘরে ঢুকলো তাকে দেখে লাফিয়ে উঠলো জামান, 'আরে হায়দার, তুই এখানে কেন?'

হায়দার জামানদের বাড়ির পুরানো চাকর। ছোটবেলা থেকে কোলে-পিঠে করে জামানকে মানুষ করেছে হায়দার। জামান অবাক হয়ে সম্মুখে দাঁড়ানো হায়দারকে দেখতে লাগলো। অবিকল এক চেহারা। এক ভঙ্গি। নিজের ভুল সে বুঝতে পারলো। ঠিক এই সময় তার বিস্ময়কে চরমে পৌঁছিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলো একটা লোক, অবিকল জামানের মতো দেখতে। আয়নায় ছায়া পড়লো, জামান তার চেহারার সঙ্গে নকল জামানের প্রতিমূর্তি মিলিয়ে দেখলো। এতটুকু খুঁত তার চোখে ধরা পড়লো না।

হায়দার ট্রে ভর্তি খাবার নামিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়েছিল। নকল জামানও কয়েক মিনিট পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে স্থির গম্ভীর ভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

লাউড স্পীকার বেজে উঠলো দেয়ালে, 'এই বাড়িতে কি কাজ হয় বুঝেছেন? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর গলার স্বর বাদে একটা চেহারার সবকিছু বদলে দেবার খুব সহজ উপায়

আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিকেরা। ধরুন, আপনি শরীরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খানের মতো। গলার স্বরও অনেকটা সেই রকম। এই অবস্থায় আমরা আপনাকে আট ঘন্টার ভিতর অবিকল শহীদ খান বানিয়ে দিতে পারি। বুঝলেন?'

ক্রোধে জামান দাঁতে দাঁত ঘষলো। কুয়াশা একটা ধাড়ি শয়তান। শয়তানের কারখানায় সে এসে পড়েছে। মাস্ক ষ্টোর ছেড়ে সে বাইরে এলো। তার হাত নিশপিশ করছিল। শরীরের ভিতর জ্বলে উঠছিল রাগের বহ্নি-শিখা। **Kausha must be killed.** সভ্য পৃথিবী থেকে কুয়াশাকে উৎখাত করতেই হবে। নতুবা পৃথিবীকে ভয়াবহ অপরাধের রাজত্বে পরিণত করবে কুয়াশা। সে ক্ষমতা তার আছে। যে কোনো সম্রাটের চেয়েও শক্তিশালী আর ক্ষমতাবান ও।

হাঁটতে হাঁটতে সে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার একটা স্থানে এসে পৌঁছলো। মাথার উপর রুক্ষ পাথরের ছাদ। এখানে ওখানে ভাঙা পাথর। বহুদূর থেকে একটা অস্পষ্ট জল পড়ার শব্দ আসছে। জামান জিজ্ঞেস করলো, 'কিসের শব্দ পাচ্ছি?'

কোনো জবাব এলো না। জামান আবার জিজ্ঞেস করলো। কোনো জবাব এলো না এবারও। কি ভেবে হঠাৎ চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো জামানের। এটা তাহলে কুয়াশার C-CTV ক্যামেরার বাইরের জগৎ? অদৃশ্য দুটি চোখে আর তার গতিবিধি ধরা পড়বে না। জামান প্রায় উন্মাদের মতো ছুটতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে একটা পাথরে লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ক্লান্ত, অবসন্ন লাগলো শরীর। সে চোখ বুজে শুয়ে রইলো কিছুক্ষণ। হঠাৎ আসা উত্তেজনা তার কেটে গেল। সে মনে মনে পাতালপুরীর একটা ম্যাপ আঁকলো। জল-পড়ার শব্দ আসছে পাতালপুরীর প্রবেশপথ থেকে। চওড়া কাঁধওয়ালা বেটে লোকটা সেই প্রবেশপথ পাহারা দেয়। প্রবেশপথের পরেই যে এলাকা সেই এলাকায় কুয়াশার C-CTV ক্যামেরা নেই। এখানে কুয়াশার শাস্তি-ঘর, মাস্ক রুম, গবেষণাগার প্রাসাদ আর চত্বর। তাহলে কুয়াশার নিভৃত কক্ষ কোথায় যেখানে কুয়াশা বাস করে?

জামান উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ তার চোখ পড়লো বাঁ'পাশে। সে সন্দেহে, বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিলো। একটা দীর্ঘকায় মূর্তি ছুটে এসে মুখ চেপে ধরলো জামানের। ইংরেজিতে বললো, 'চুপ, কথা বলো না···কাছেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের হত্যাকারী। সে জামানকে এতক্ষণ খুঁজেছে।'

জামান চাপা গলায় শুধু বললো, 'কিন্তু আপনি।'

লোকটি ফিসফিস করে বললো, 'বলছি···চলো, পাথরের আড়ালে গিয়ে বলছি।'

বার

থম থম করছিল সারা হল-ঘর। সারিসারি চেয়ারে বসে আছে অসংখ্য লোক। তাদের ভিতর নারী-পরুষ দুই-ই আছে। হল-ঘরের শেষ প্রান্তে উঁচু এক মঞ্চ। মঞ্চে অন্ধকার বিরাজ করছে। ডানদিকে বড় বড় দুটো স্তম্ভের পাশে টেনে আনা হয়েছে কয়েকটা কাচের জার, আলমিরা আর শেলফ। কয়েকজন লোক নিঃশব্দে এগুলো টেনে নামাচ্ছে মেঝের উপর। হল-ঘরে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। হঠাৎ মঞ্চের উপর জ্বলে উঠলো একটা লাল গোলাকৃতি বাল্‌ব। সকলেই সচকিত হয়ে বসলো। একবার সামান্য মাথা নোয়ালো সামনের দিকে। ঘরে পিন-পতন নিস্তব্ধতা। মঞ্চে ধীরে ধীরে উঠলো একটি কালো ছায়া। মঞ্চ ছেয়ে গেল মৃদু আলোয়। সবারই নজর পড়লো মঞ্চে দাঁড়ানো কালো ছায়াটির উপর।

'প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, এই কিছুক্ষণ আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে যা আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিলো। আমাদের টেলিভিশন অপারেটর রহস্যজনকভাবে তার কাজ থামিয়ে দিয়েছে মিনিট কুড়ি আগে। ফলে প্রাসাদের সব যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়ে গেছে। এটা কার কাজ আমি বুঝতে পারছি। যথাসময় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। আপাততঃ সংক্ষেপে কতগুলো কথা আপনাদের বলে রাখি। প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আপনারা শুনে সুখী হবেন আমাদের এতদিনের চেষ্টা সফল হতে চলেছে। বৈজ্ঞানিক ড. ক্লিন্‌স-বার্গ অবেশেষে মানুষকে অমর করার উপায় আবিষ্কার করেছেন। যতদিন ইচ্ছা এখন মানুষ বাঁচতে পারবে। প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ...তাকিয়ে দেখুন কাঁচের ঐ জারটার দিকে। এর ভিতর রয়েছে কোটি কোটি টাকার প্রাণ-কোষ। মানবদেহে এ জিনিস বিশেষ উপায়ে সঞ্চারিত করতে পারলেই মানুষ রক্ষা পাবে জ্বরা ও মৃত্যুর হাত থেকে।

কুয়াশার গলার স্বর গম্ভীর আর থমথমে হয়ে ওঠে। বলে, 'আমরা মানুষের যৌবনকে যদ্দিন খুশি ধরে রাখতে পারবো। সেই ক্ষমতাও আমরা অর্জন করেছি। ড. কিন্‌সবার্গ এখন হাতে-কলমে আপনাদের সেটা দেখিয়ে দেবেন।'

সামনের সারি থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ান দীর্ঘকায় ড. ক্লিন্‌সবার্গ। এগিয়ে যান কাঁচের জার আর স্টেচারে রাখা বৃদ্ধ ইব্রাহিম চৌধুরীর অজ্ঞান দেহের দিকে। কাঁচের জার থেকে খানিকটা তরল পদার্থ সিরিঞ্জে তুলে নেন ড. ক্লিন্‌সবার্গ। তারপর সেটা সাবধানে ইনজেক্ট করেন ইব্রাহিম চৌধুরীর দেহে।

সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে। ড. ক্লিন্‌সবার্গ কাশি দিয়ে গলার স্বর পরিষ্কার করেন। তারপর বলেন, 'মিনিট কয়েকের ভিতর এক অলৌকিক দৃশ্য আপনারা

দেখতে পাবেন। ইব্রাহিম চৌধুরী আর বৃদ্ধ নেই। তিনি নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছেন। আরও একশ' বছর বাঁচার মতো শক্তি তিনি অর্জন করেছেন!'

হলে উপবিষ্ট নর-নারীদের ভিতর আনন্দের মৃদু গুঞ্জরণ উঠলো। ঠিক এসময় একঝাঁক বন্দুকের গুলি এসে লাগলো স্তম্ভের পাশে রাখা কাঁচের জারে। মুহূর্তেই কোটি কোটি টাকার প্রাণকোষ ভর্তি জারটা ভেঙে খান খান হয়ে যায়। চাপা আর্তনাদে ভরে যায় হল-ঘর। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে সকলেই। গুলি এসে বিঁধেছে ইব্রাহিম চৌধুরীর গায়ে। তার মর্মান্তিক চিৎকার বেজে উঠেছে।

ঘরের ভিতর একদল সশস্ত্র লোক এসে ঢুকে পড়ে। জামান পিস্তল বের করে পর পর তিনবার গুলি করলো কুয়াশার বুক লক্ষ্য করে। চাপা চিৎকার উঠলো কোত্থেকে যেন। একটা হলুদ সঙ্কেত কেঁপে উঠলো দেয়ালে দেয়ালে। সশস্ত্র বাহিনী গুলিবর্ষণ করতে লাগলো ঘরের চারদিক থেকে। ধোঁয়া আর আর্তনাদে ভরে গেল ঘর।

'কুয়াশা।'

জামান চেঁচিয়ে বললো, 'এতদিনে আমি প্রতিশোধ নিলাম।'

তার গলার স্বর কাঁপছিল উত্তেজনায়। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মি. সিম্পসন। তিনি জামানের টেলিগ্রাম পেয়ে সঙ্কেত মাফিক এই পাতালপুরীতে ঢুকেছেন। তিনিই স্কিন-ওয়ালের ভিতর ঢুকে ওখানকার টেলিভিশন অপারেটরকে বন্দী করেছেন।

ধোঁয়া সরে গেলে ঘরের দিকে লক্ষ্য করেন মি. সিম্পসন। অবাক হন। ভোজ-বাজির মতো উপবিষ্ট নর-নারীরা মিলিয়ে গেছে। মঞ্চের উপর শুধু দাঁড়িয়ে আছে সেই ছায়া, কুয়াশা। জামান পিস্তল হাতে এগিয়ে যায়। ছায়া-মূর্তি তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। এক টানে কালো কাপড় সরিয়েই মি. সিম্পসন ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। ছায়া-মূর্তিটা আর কিছুই নয়, একটা কাঠের ফ্রেম। ফ্রেমের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছিল কুয়াশা। কাঁচের জারের উপর গুলিবর্ষণ হবার পরই সম্ভবতঃ সে সরে পড়েছে কাঠের ফ্রেম ছেড়ে অন্য কোথাও।

হলের উপবিষ্ট নর-নারীদেরও কেউ নেই। সবাই নির্বিঘ্নে সরে গেছে। শুধু বিছানার উপর পড়ে আছে অজস্র গুলিবিদ্ধ ইব্রাহিম চৌধুরীর প্রাণহীন দেহ।

মি. সিম্পসন ও জামান সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে সতর্কভাবে সেই পাতালপুরী অনুসন্ধান করেন। চারদিক নির্জন। পাতালপুরী পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। কুয়াশা নেই।

পাতালপুরী থেকে বেরোবার পথে পথে প্রহরী মোতায়েন করেছিলেন মি. সিম্পসন। কিন্তু শুধু প্রহরীদের উপর নির্ভর করতে ভরসা হলো না তাঁর। তিনি বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলেন প্রবেশপথের দিকে।

হঠাৎ একটা গুহার ভিতর থেকে লাউড স্পীকারের আওয়াজ এলো। মি. সিম্পসন, জামান দু'জনেই চিনলো কুয়াশার কণ্ঠস্বর। কুয়াশা গম্ভীর স্বরে বললো, 'মাটির এক

হাজার ফিট নিচে বসে তোমাদের স্মরণ করছি, জামান। বুঝতেই পারছো আমি আমার লোকজনদের নিয়ে সরে গিয়েছি। জামান, তোমাকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে-ছিলাম। তুমি সেই মর্যাদা রক্ষা করোনি। মি. সিম্পসনকে তুমিই পাতালপুরীতে ঢোকার সঙ্কেত জানিয়েছিলে। বুঝতে পারছি তোমারই মন্ত্রণায় পাতালপুরীতে ঢুকেই মি. সিম্পসন প্রথমে আমার টেলিভিশন অপারেটরকে বন্দী করেছেন। তাতে করে পুরীর সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম…এ সবই তোমার কাজ। তুমি আমার যে ক্ষতি করেছো জামান্ সে ক্ষতি আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের হয়নি। এতদিনের সাধনায় আমি যা অর্জন করেছিলাম সব তুমি নষ্ট করে দিয়েছো। কোটি কোটি টাকার প্রাণ-কোষ তুমি নষ্ট করেছো। আমাকে আবার গোড়া থেকে নতুন ভাবে সাধনা শুরু করতে হবে। ভাবতে পারো এ কতো বড় ক্ষতি আমার? মানুষকে অমর করার কৌশল আমি আবিষ্কার করেছিলাম। তুমি তা ধ্বংস করে দিলে। জামান, তোমাকে যে কোনো মুহূর্তে হত্যা করতে পারি আমি। মি. সিম্পসনের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো, সে শক্তি আমার আছে। তুমি যে অপরাধ করেছো ততো বড় অপরাধ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে আর হয়নি। তোমার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তোমাকে আমি এক্ষুণি দিতে পারি জামান। আমার হাত থেকে দুনিয়ার কোনো শক্তিই তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম। কেন? জামান…বলেছি তো, আমি ক্রিমিন্যাল নই। আমি মানুষ। মানুষের পক্ষেই মানুষকে ভালবাসা সম্ভব। আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছিলাম, তাই তোমার ওপর হাত উঠলো না আমার। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আচ্ছা, চলি। গুডবাই, জামান। গুডবাই, মি. সিম্পসন। আবার আমাদের দেখা হবে।'

কুয়াশার স্বর ডুবে গেল। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো জামান। মি. সিম্পসনের চোখেমুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, 'তোমার জন্যে আমরা সত্যি গর্বিত, কুয়াশা।'

কুয়াশা ৮

এক

কুয়াশা ডায়েরী লিখছিল একমনে।

চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তার মনকে আকণ্ঠ বেদনায় আপ্লুত করেছিল, তার কলমের আঁচড়ে তাই-ই মূর্ত হয়ে উঠছিল।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো কুয়াশা। নিঃশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকে উঠলো। ঠোঁটে ফুটে উঠলো বিচিত্র ম্লান হাসি। অমরত্বের আর আন্ট্রা-সোনিক্সের দুঃসাধ্য গবেষণায় বারবার পর্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেছে সে; কিন্তু সিদ্ধিলাভের মুহূর্তে তা বানচাল হয়ে গেছে। সাধনা আর সিদ্ধির এই অলংঘ্য ব্যবধান কেন? নিজেকে প্রশ্ন করলো কুয়াশা।

ভাগ্যের পরিহাস! ভাগ্যকে মানে না সে। ভাগ্যকেই সে পরিহাস করে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এসেছে সারাটা জীবন। অট্টহাস্যে পরিহাস করেছে ললাটের লিখনকে।

হুইস্কির গেলাসটা ঠোঁটে তুললো কুয়াশা। এক নিঃশ্বাসে ঢক ঢক করে অর্ধেকটা শেষ করে ফেললো। সিগারেট কেস থেকে বেরোলো দামী ফিল্‌টার্‌টিপ সিগারেট। ঠোঁটে লাগিয়ে রনসন গ্যাস-লাইটারটা জ্বাললো।

কলমটা রেখে দিয়ে চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিলো কুয়াশা। ফিরে তাকালো কর্মমুখর অতীতের পানে। পনেরো বছর জার্মেনীতে বিজ্ঞানের কঠোর সাধনা। অসংখ্য মানুষের উপর এক্সপেরিমেন্ট। হেকমত আলীর উন্মত্ত চিৎকার 'আমায় মেরে ফেলো', 'আমায় মেরে ফেলো।' শহীদ। শহীদ খান। আনিস চৌধুরী। অসংখ্য ছবি। টুকরো টুকরো মনের ক্যানভাসটাকে কে যেন ছুরি দিয়ে কাটছে। কি নিদারুণ বেদনা। কি অসহ্য ব্যর্থতা।

আরও কতকগুলো ছবি। লিম্পোপো নদীর সেই ভয়াবহ অভিযান। জেবা ফারাহ্‌। দীবা ফারাহর আত্মদান। দস্যু নেসার আহমেদের মুখটা দু'ভাগ হয়ে গেল গুংগার হাতের টানে। মহুয়া। আমার মিষ্টি বোন মহুয়া। তোর জন্যে কিছুই করতে পারিনি আমি। আব্বা, তুমি ক্ষমা করো তোমার অবাধ্য সন্তানকে!

সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণটা কানে আসছে তার। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে যে বিশাল ল্যাবরেটরি সে গড়ে তুলেছিল ভূগর্ভে, চোখের সামনে তা নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে গেল

আসাদুজ্জামানের আক্রোশে।

আসাদুজ্জামান! তোমাকে তবু আমি ক্ষমা করলাম। কোটি টাকা আর আমার জীবনভর সাধনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছো তুমি। তবুও তোমার মাতৃভক্তি মনুষ্যত্বের গৌরবদীপ্ত।

রাত এখন ক'টা বেজেছে? রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটা দেখলো কুয়াশা। প্রায় তিনটে। কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতের জ্যোৎস্না কুহকিনী মায়া ছড়িয়ে আছে শহরতলীর আকাশে। আকাশের কালো জাজিমে তারাগুলো যেন হলুদ আলোর ফুলকি। চারদিকে অটল নৈঃশব্দ্য।

সিগারেটটা ফেলে দিলো কুয়াশা। এতক্ষণের উল্টোপাল্টা চিন্তাটাকে সহজ খাতে বইয়ে দিতে চাইলো সে। স্নায়ুর এই সাময়িক দুর্বলতাগুলোকে উড়িয়ে দিলো। হাসি পেলো তার। কেন যে এই চিন্তাগুলো মাঝে মাঝে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কর্মমুখর জীবন থেকে দূরে নিয়ে এসে একান্ত আপন চিত্তবিলাসে বিভ্রান্ত করে তোলে বুঝতে পারে না কুয়াশা।

কিন্তু এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে তো তার চলবে না। ব্যর্থতাকে বরণ করে নেবে না কুয়াশা। যে অবিশ্বাস্য অসম্ভাব্যতাকে সম্ভব করে তোলবার সাধনায় সে সাধারণ সুখের বাসনাকে ত্যাগ করে বেছে নিয়েছে হলাহল আকীর্ণ পথ—তাকে সে-পথ ধরে চলতেই হবে। অমরত্বের সাধনায় তাকে সাফল্য অর্জন করতেই হবে। আবার নতুন করে—সম্পূর্ণ নতুন করে বসাতে হবে দাবার ছক। আমৃত্যু সে সাধনা করবে। বাসবের অমৃত আসবে মানুষের অধিকার সে প্রতিষ্ঠা করবে। মিথোলজীর অসুরকুল দেবতাদের কবল থেকে যা কেড়ে আনতে বাধ্য হয়েছে।

নীলকণ্ঠের মতো সে সেই সুধাভাণ্ড তুলে দেবে মানবের হাতে। স্থির-সংকল্পে ধীরে ধীরে কুয়াশার মনের ভার কেটে গেল। দুর্বলতার গ্রন্থিগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

মনে মনে গুছিয়ে নিলো ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা। হুইস্কির ভুক্তাবশিষ্ট আর এক ঢোকে পান করে সিগারেট ধরালো আর একটা।

প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে নুরবক্সকে। সে তার গবেষণার থিসিসের একটা অংশ নিয়ে পালিয়েছে মাস্ক স্টোর থেকে, জামান আর সিম্পসনের সেখানে হানা দেবার পর। সাথে নিয়ে গেছে সে কুয়াশার এতদিনকার কঠোর সাধনায় পাওয়া অমরত্বের চাবিকাঠি। তাকে খুঁজে বের করতে হবে। বিশ্বাসঘাতককে দিতে হবে উপযুক্ত শাস্তি।

কিন্তু কুয়াশার আর বিশ্রামের সময় নেই। জীবন থেকে মূল্যবান আটটা মাস অপচয় হয়ে গেছে।

ফেল্ট হ্যাটটা মাথায় পরে নিলো কুয়াশা। ওয়ারড্রোব খুলে কালো আলখাল্লা বের করে বিশাল দেহটা ঢেকে নিলো। রাত শেষের আলোয় শহরতলীর একটা অতি সাধারণ বাড়ির পেছন দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো সে। যেন একটা বিশাল সচল মহীরুহ রাতের

ম্লান জ্যোৎস্না পাড়ি দিতে দিতে চললো।

কুয়াশাকে বেরোতে দেখে একটা ছায়ামূর্তি সাঁ করে মিলিয়ে গেল ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে। কুয়াশার বিশাল দেহ ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেল আবছা অন্ধকারে। বেরিয়ে এলো ছায়ামূর্তি। গেটটা ধরে ধাক্কা দিতে গিয়েই মনে কিসের একটা সন্দেহ হলো যেন তার। লোহার গেট। নিশ্চয়ই তাতে চলাচল করছে বিদ্যুৎ তরঙ্গ। এক মুহূর্ত টর্চের আলোয় পরীক্ষা করলো আগন্তুক। যা ভেবেছিল তাই। একটা তার এসে নিচের দিকে একটা শিকের সাথে আটকে আছে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলো ছায়ামূর্তি। পকেট থেকে বের করলো প্লায়ার্স। রবারের গ্লাভস পরা হাতে প্লায়ার্স ধরে এক টানে ছিঁড়ে ফেললো তারটা। গ্লাভসটা খুলে ফেললো। আঙুলের ডগা দিয়ে সাবধানে স্পর্শ করলো লোহার গেটটা। না, বিদ্যুৎপ্রবাহ নেই। গেটটা খুলে ভিতরে ঢুকলো সে। ছোট্ট বারান্দা পেরিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি। সরু আলো টর্চ থেকে বেরিয়ে চক্রাকারে বিচ্ছুরিত হলো।

সড় সড় শব্দ ভেসে এলো কোত্থেকে। একলাফে ছায়ামূর্তি সরে গেল বারান্দার অন্ধকার কোণে। অজান্তেই বাঁ হাতটা ঢুকে গেল পকেটে। সেখানে আছে পয়েন্ট থ্রি–টু ক্যালিবারের ছোট্ট একটা পিস্তল।

না কিছু নয়। শেষরাতের হাওয়ায় গাছের পাতার শব্দ। আশ্বস্ত হলো ছায়ামূর্তি। আবার এগিয়ে এলো দরজার কাছে। একটা ছোটো ইস্পাতের নলের মতো বের করলো পকেট থেকে। তালাবদ্ধ কড়ার ভিতরে ঢুকিয়ে বাঁকিয়ে চাপ দিলো। কড়াটা খুলে এলো দরজা থেকে। ঘরে ঢুকলো ছায়ামূর্তি।

নিমিষে জরিপ করলো সমস্ত ঘরটা। তার চোখ দু'টো ঘরের নিস্তব্ধ অন্ধকারে বিড়ালের মতো জ্বলে উঠলো। সন্তর্পণে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে এগিয়ে গেল ওয়ার–ড্রোবের দিকে। কে জানে কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য মিলবে হয়তো সেখানেই? সমস্ত ওয়ার–ড্রোবটা তছনছ করে ফেললো। কিন্তু কোথায়? কোথায় সেই থিসিসের অবশিষ্টাংশ। বইয়ের র‍্যাক, আলমারী, বিছানা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো। কোথায় সেই লাল মলাটের বইটা। যার একটা অংশ আছে তার নিজের কাছে। কোথায়? কোথায়?

হন্যে হয়ে উঠলো ছায়ামূর্তি। উদ্বেগে, ক্রোধে সে দিশে হারিয়ে ফেললো। সেটা তাকে পেতেই হবে। নিশ্চিত অমরত্ব লাভ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত হতে দেবে না। দিতে পারে না।

নিজেকে সংযত করলো ছায়ামূর্তি। শেষ রাত। আর দেরি করলে ধরা পড়ে যাবে সে কুয়াশার হাতে। আর তার অর্থ হলো মৃত্যু। নিশ্চিত মৃত্যু। অমরত্বের আস্বাদ আর পেতে হবে না। খাটের তলায় গিয়ে উপরের দিকে চাইতেই তার চোখ দু'টো আনন্দে

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অসহ্য উল্লাসে তার মনে আগুন ধরে গেল যেন। খাটের গদির নিচে নাতিবৃহৎ স্টিলের চ্যাপ্টা বাক্স চোখে পড়লো তার। বাক্সটা তার চেনা। তার স্বপ্নের ধন। কুয়াশা খাটের গদির তলায় যে এই অমূল্য সামগ্রী লুকিয়ে রাখতে পারে তা তার কখনোই সন্দেহ হয়নি। এর চাইতেও গোপন স্থানে ওটাকে লুকিয়ে রাখবে—সেটাই স্বাভাবিক।

খাটের নিচে থেকে বেরিয়ে এলো ছায়ামূর্তি। আর দেরি নয়। গদীর তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে বের করলো স্টিলের পাতলা বাক্সটা। তার এক কোণে একটা ঈষৎ উঁচু জায়গায় চাপ দিতেই খুলে গেল। ভিতর থেকে উঁকি দিলো লাল রঙের একটা বই। তবুও সন্দেহ গেল না ছায়ামূর্তির। খুলে দেখে নিলো বইটা। না ঠিকই আছে, মনে মনে বললো সে। বাক্সটা বন্ধ করলো। পেছন দিয়ে দরজার দিকে এগোলো। খুট করে শব্দ হলো একটা। ঘরটা আলোয় প্লাবিত হয়ে গেল মুহূর্তে।'

'হ্যাণ্ডস আপ। মাথার উপর দু'হাত তুলে দাঁড়াও, নুরবক্স।'

ঘরের মধ্যে কিসের যেন বিস্ফোরণ হলো। ছায়ামূর্তি হকচকিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালো। একটা রিভলভারের নল ঠিক তার মাথার দিকে লক্ষ্য করে স্থির হয়ে আছে। লোকটা মান্নান। কুয়াশার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহচর। তার জন্য মান্নান হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে।

'হাত তুলে দাঁড়াও, নুরবক্স। না হলে এই মুহূর্তেই তোমার খুলি ফুটো হয়ে যাবে।'

হকচকিয়ে গেল ছায়ামূর্তি। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলো সে। মান্নান কিছু বলবার আগেই ছায়ামূর্তি হাতের চ্যাপ্টা বাক্সটা জোরে ছুঁড়ে মারলো মান্নানের রিভলভার ধরা ডান হাত লক্ষ্য করে। বাক্সটা এসে আঘাত করলো মান্নানের কব্জিতে। রিভলভারটা পড়ে গিয়ে ছিটকে চলে গেল ওয়ারড্রোবের নিচে। একলাফে এগিয়ে এসে মান্নানের তলপেট বরাবর লাথি হাঁকলো নুরবক্স। মান্নান বিদ্যুৎবেগে পাশ কাটিয়ে সরে যেতেই নিজেকে সামলাতে না পেরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো ছায়ামূর্তি। এই অবসরে মান্নান তার চোয়ালের উপর ঘুসি চালালো। তীব্র যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল ছায়ামূর্তির মুখ। ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করতে করতে ডানদিকের পকেট থেকে বের করে আনলো পিস্তল। মান্নানের দিকে তাক করার আগেই সে ছুটে এগিয়ে এসে ছায়ামূর্তির ডানহাতটা ধরে উপরের দিকে ঠেলে দিলো। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে শব্দ বেরোলো 'দুপ'। মান্নান ছায়ামূর্তির পাঁজর লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকালো। কোঁক করে একটা শব্দ করে ভূতলশায়ী হলো ছায়ামূর্তি। পিস্তলটা ছিটকে পড়লো কয়েকহাত দূরে। মান্নান ছায়ামূর্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই

তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও দাঁতে দাঁত চেপে সে ঘুসি মারলো মান্নানের ডান চোখের উপর। ভ্রূ থেকে উষ্ণ তরল রক্ত বেরিয়ে এলো। ডান চোখটা বন্ধ হয়ে গেল মান্নানের। ডানহাতটা যন্ত্রচালিতের মতো চোখের উপর উঠে এলো। এই সুযোগে আবার ঘুসি চালালো ছায়ামূর্তি। এবারে নাক বরাবর। জ্ঞান হারিয়ে টলতে টলতে পড়ে গেল মান্নান ছায়ামূর্তির পাশেই। একটা অশ্লীল গালাগাল বেরিয়ে এলো ছায়ামূর্তির মুখ থেকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি। বাক্স আর পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

দুই

সিম্পসন টেলিফোন রেখে দ্রুত তার কামরা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, কামাল তখন ঢুকলো। কামালের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে সিম্পসন বললেন, 'আরে কামাল সাহেব যে, এসো এসো। এদিকে আর এক কাণ্ড ঘটে গেছে। জামান অর্থাৎ আসাদুজ্জামানের বোন লিলিকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে কাল রাতে, জামানের বাড়ির লোকের ধারণা এ কাজ কুয়াশার।'

কামাল বিস্ময়ের সুরে বললো, 'আবার কুয়াশা? আমি তো ভেবেছিলাম কুয়াশা মারাই গেছে। কয়েক মাস ধরে তো তার কোনও পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছিলো না।'

সিম্পসন বললেন, 'তা ঠিক। আমরাও একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম। কিন্তু লিলিকে যে কুয়াশাই চুরি করেছে এটাও তো অনুমান মাত্র। যা হোক। আমি এক্ষুণি বেরোচ্ছি। তুমি কি যাবে আমার সাথে?'

'সানন্দে। অনেকদিন ধরে শুয়ে বসে থেকে হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে। এখন কিছু একটা করতে পারলে বেঁচে যাই। শহীদ তো বিজনেসের মধ্যে ডুবে গেছে। গোয়েন্দাগিরিতে, বিশেষ করে কুয়াশা ঠেঙানোতে ওর কোনও উৎসাহ নেই আর। অতএব, এবারে শহীদকে ছেড়ে আপনার, চাই কি জামানের উপগ্রহে পরিণত হতে আমি প্রস্তুত।'

সিম্পসন হাসলেন। সিগারেটের কৌটোটা হাতে নিয়ে বললেন, 'চলো, যাওয়া যাক।'

ড্রইংরুমের ভিতর অস্থিরভাবে পায়চারী করছিল জামান। অসহ্য ক্রোধে তার দু'চোখে যেন আগুন জ্বলছিল। কামরুজ্জামান সাহেবের চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। ছোট চাচার মুখটা বেদনায় আর আতঙ্কে নীল। তার ঠোঁট কাঁপছে। হায়দার দরজার পাশে অসহায়ের

মতো দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। কামরুজ্জামান সাহেব বেরিয়ে গেলেন। মিনিটখানেক পর তাঁর পিছন পিছন ঢুকলেন সিম্পসন আর কামাল।

সিম্পসন কামালের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওদের। সবাই বসলো।

সিম্পসন বললেন, 'ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো, জামান, বলতে পারো কিছু?'

'বলবার মতো কিছু নেই মি. সিম্পসন। লিলি এই পাশের ঘরটায় থাকতো। আমি থাকি তার পরের কামরায়। সকালে হায়দার অর্থাৎ আমাদের চাকরটার চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। সে হাউমাউ করে যা বললো তার অর্থ এই যে, লিলিকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ছুটে লিলির ঘরে গিয়ে দেখি ওর শিয়রের জানালার মোটা শিকগুলো উধাও হয়ে গেছে। নিচে গলানো মোমের মতো লোহা পড়ে আছে। লিলির বিছানা শূন্য। অথচ রাতে যে সে বিছানায় শুয়েছিল, তাও স্পষ্ট বোঝা যায়।' জামান থামলো।

'আমার মনে হচ্ছে এটা কুয়াশার কাজ,' কামরুজ্জামান সাহেব বললেন।

ছোট চাচা সায় দিলেন। 'আমাদেরও তাই ধারণা, কামাল সাহেব।'

'তোমার কি মনে হয় জামান?' সিম্পসন প্রশ্ন করলেন।

জামান ক্লিষ্ট হাসি হেসে বললো, 'এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে কি মি. সিম্পসন? এই কুয়াশাই আমার মাকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। কে জানে কুয়াশা লিলিকে এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে কিনা।' গলা আর্দ্র হয়ে গেল জামানের। মাথা নিচু করলো বোধহয় উদগত অশ্রু গোপন করার জন্যে।

সিম্পসন চুপ করে রইলেন। জামান নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'তাছাড়া কুয়াশা যেমন করে শিক গলিয়ে ঘরে ঢোকে সেইভাবেই লিলির ঘরের শিক গলিয়ে ফেলা হয়েছে।'

ছোটো চাচা বললেন, 'আশ্চর্য। লোকটা কয়েকটা বছর ধরে একের পর এক নরহত্যা করে চলেছে অথচ…' সিম্পসনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করলেন তিনি।

জামান বললো, 'এবার আর কুয়াশার রক্ষা নেই। কুয়াশা যতবড় দুর্ধর্ষই হোক আর যতবড় প্রতিভাই হোক তাকে আমি খুঁজে বের করবই। আসামীর কাঠগড়ায় তাকে এবার দাঁড়াতেই হবে।' জামানের কণ্ঠস্বরে প্রতিজ্ঞা আর জেদ।

কামরুজ্জামান বললেন, 'তাই যেন হয়, আল্লাহ।'

সিম্পসন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চলো। লিলির ঘরটা দেখা দরকার একবার।'

জামান সিম্পসন আর কামালকে নিয়ে লিলির কামরায় ঢুকলো। সুসজ্জিত ছিমছাম ঘর। খাটের উপর শয্যায় শয়নের চিহ্ন সুস্পষ্ট। শিয়রের জানালাটা খোলা। তাতে

একটিও শিক নেই। কাছে গিয়ে দেখলেন মোটা শিকগুলো গলানো মোমের মতো মাটিতে পড়ে রয়েছে।

কামাল জিজ্ঞেস করলো, 'শফি সাহেব কোথায়, মি. জামান?'

জামান চিন্তিত গলায় বললো, 'বুঝতে পারছিনে। আজ তিনদিন ধরে শফি আসে না আমাদের এখানে। আমিও খোঁজ নিতে পারিনি। লিলি বোধহয় কাল গিয়েছিল একবার। কিন্তু কিছু বলেনি।'

'শফি ইদানীং থাকতো কোথায়?' কামাল জিজ্ঞেস করলো।

'ঢাকেশ্বরীতে ওর আগের বাসায়।'

সমস্ত ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখে এসে সিম্পসন দাঁড়ালেন।

'কিছু খোয়া গেছে কিনা বলতে পারো জামান?'

'তেমন তো মনে হচ্ছে না।'

জানালা গলে নিচে লনে নেমে গেলেন সিম্পসন। কাল রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটি ভেজা। আর সেই ভেজা মাটির উপর দু'জোড়া জুতোর ছাপ চোখে পড়লো সিম্পসনের। জুতোর ছাপ ধরে এগোলেন তিনি। সামনের দিকে গেটের কাছে জুতোর ছাপ গিয়ে মিলিয়ে গেছে। আবার ঐ পথ দিয়েই ফিরে এলেন সিম্পসন।

সবাই ড্রইংরুমে ফিরে এলেন।

একটা স্কুটার থামবার শব্দ শোনা গেল। গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে শফি এসে ঢুকলো ড্রইংরুমে। একগাদা লোক দেখে একটু হকচকিয়ে গেল শফি। সিম্পসনের দিকে নজর পড়তেই ভ্রূ দুটো জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বেঁকে গেল। নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'কি ব্যাপার, আপনি এখানে?'

ছোটো চাচা কি যেন বলতে গেলেন। তার আগেই গলা শোনা গেল জামানের। তিক্ততা মেশানো কণ্ঠে জামান বললো, 'কি আর করবেন মি. সিম্পসন। তোমার কুয়াশা ভাইয়া যে আবার আমাদের উপর দয়া করেছেন।'

'তার মানে?'

'মানে অতি সরল। আমার মাকে হত্যা করে শখ মেটেনি কুয়াশার। এবারে লিলিকে চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'লিলিকে চুরি করে নিয়ে গেছে?' যন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলো শফি। যেন ব্যাপারটা তার চেতনায় গিয়ে পৌঁছলো না। পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইলো লিলি—চারদিকে হাল্কা অন্ধকার। এখনও সকাল হয়নি

বুঝি? মাথাটা ঝিমঝিম করছে। জ্বর এলো না তো? অস্পষ্ট চেতনায় নিজেকে প্রশ্ন করলো সে। শরীরটা অবসন্ন লাগছে কেন? ঘরটা ধীরে ধীরে দুলছে। ভূমিকম্প হচ্ছে! ধড়মড় করে উঠে বসলো সে। একি? এ আমি কোথায়? ঘরটা দুলছেই বা কেন? স্বপ্ন দেখছি নাতো! না স্বপ্ন নয়—নিজের গায়ে চিমটি কাটলো লিলি।

…তাহলে? তাহলে আমি কি বন্দী? আমাকে এখানে কি কেউ ধরে এনেছে? একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকের মধ্যে ধড়াশ করে উঠলো লিলির। দেহটা কেঁপে উঠলো একবার। জিভটা শুকিয়ে গেল।

ছোট্ট একটা ঘর। বারবার দুলে উঠছে। মাথার উপর একটা শূন্য পাওয়ারের বাল্‌ব মিটমিট জ্বলছে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলো লিলি, সে মাটির উপর শুয়ে ছিলো। ঘরটার ভিতর চাপা গুমোট। শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো ওর।…কে তাকে ধরে এনেছে? কেন ধরে এনেছে? নিজেকে প্রশ্ন করলো লিলি। মায়ের কথা মনে হতেই বুকের ভিতরটা কাঁপুনি ধরে গেল। ঘরের দেয়ালে ভর দিয়ে অসহায়ের মতো বসে রইলো সে। তেষ্টা পেয়েছে। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়ালো। ঘরটায় দরজা বলতে কিছু দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে শুধু দেয়াল। ঘুরে ঘুরে ধাক্কা দিয়ে দেখলো দেয়ালটা। বাইরে পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো। ঘরটা আবার দুলে উঠলো।

আবার বসে পড়লো লিলি। ডুকরে কেঁদে উঠলো। ঝরঝর করে দু'চোখ বেয়ে পানি বেরিয়ে এলো।

খুট করে শব্দ হলো একটা। সামনের দেয়ালটা ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। একটা লোক এসে দাঁড়ালো ফাঁকটার মধ্যে। একহাতে তার টর্চ অন্য হাতে একটা চাকু অস্পষ্ট আলোকে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। ঘরটা দুলে উঠলো আবার।

বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা লোকটা। দু'চোখ দিয়ে লেহন করছে লিলিকে। ওকে দেখে কান্না ভুলে গেল লিলি। শঙ্কায় দুরুদুরু করে উঠলো বুকের ভিতরটা। যদি…যদি ধরতে আসে?

…বাধা দেবে লিলি। আত্মসমর্পণ করা চলবে না। কিছুতেই না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ধরলো লিলি।

লোকটা দু'পাটি দাঁত বের করে হাসলো বলে মনে হলো লিলির। কি কুৎসিত হাসিটা! লিলি মুখ ফেরালো।

কর্কশ গলা শোনা গেল। ''বাঃ, দিব্যি জ্ঞান ফির‍্যা আইছে। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ, যাই হুজুররে খবর দেই গ্যা।''

বেরিয়ে গেল লোকটা। দেয়ালের ফাঁকটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

শফির কথা, দাদাদের কথা, মৃত মায়ের মুখ মনে পড়লো লিলির স্মৃতিপটে। দুচোখ বেয়ে আবার অশ্রু ঝরতে লাগলো নীরবে।

তিন

কয়েকদিন পরের কথা। আষাঢ় মাস। বৃষ্টিভেজা পড়ন্ত বিকেল। সারাদিন একঘেয়ে বর্ষণের পর মেঘগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে। আবার এখুনি হয়তো বর্ষণ শুরু করবে।

কাকরাইলে শহীদ খানের বাড়িটায় একা হাঁপিয়ে উঠেছিল কামাল। শহীদ, মহুয়া ভাবী, লীনা কেউই বাড়ি নেই। কোথায় কোন এক মরহুম শিল্পপতির একমাত্র দুহিতার বিয়ে খেতে গেছে ইস্কাটন ক্লাবে।

জামানের অপেক্ষায় বসে ছিলো কামাল। সময় কাটতে চাইছিল না। শহীদের স্টাডিতে ক্রিমিনোলজির বই ঘাঁটছিল। প্রার্থিত বইটা খুঁজতে খুঁজতে ওর মনে হলো বইগুলোর উপর যেন হাল্কা ধুলোর আস্তরণ জমেছে। আপনমনে হাসলো কামাল। ক্রিমিনোলজিতে শহীদের সব ইন্টারেস্ট চৈত্রের মেঘের মতো উবে গেছে। কুয়াশার প্রতি শহীদের জাতক্রোধ আর একই সাথে অসীম শ্রদ্ধার টানাপোড়েনে ক্লান্ত হয়ে শহীদ শুধু সৌখিন গোয়েন্দাগিরি থেকেই দূরে সরে আসেনি, ক্রিমিনোলজিতেও তার আগ্রহের অবসান ঘটেছে।

সিম্পসন দুঃখ করছিলেন, 'এতো সম্ভাবনাময় গোয়েন্দা শহীদ খান কলরবমুখর খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে নীরবে সরে দাঁড়ালো। ওর জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়।'

কামাল হেসে মনে মনে বলেছিল, 'অসুবিধেও হয়। কঠিন কেসগুলো শহীদ যেমন স্বচ্ছন্দে সমাধান করে দিতো তাতে পুলিসের অপরাধ নির্ণয় শাখা অনেকটা তার উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। গোয়েন্দাগিরির প্রতি শহীদের অনীহায় সিম্পসনের দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক।'

সিম্পসন আরও বলেছিলেন, 'কুয়াশার ব্যাপারে ব্যর্থতায় শহীদ খান সেই যে শামুকের খোলের মধ্যে গুটিয়ে বসলো, আজও আর তাকে তার বাইরে আনা গেল না। আর শহীদ খানের মতো সত্যনিষ্ঠ নীতিবাগীশ লোক কুয়াশার মতো দুর্ধর্ষ ডাকাত নরহন্তাকে কেন যে শ্রদ্ধা করে তা-ও আমি বুঝতে পারিনে।'

কামাল বলেছিল, 'কুয়াশার মধ্যে আছে যেমন প্রলয়ের মত্ততা তেমনি আছে সৃজনশীল প্রতিভা। সেই প্রতিভার প্রতিই শহীদ ভক্তিপ্রণত।'

সিম্পসন বলেছিলেন, 'আমিও ভেবে অবাক হই কামাল—কুয়াশা যদি তার সত্তার অর্ধাংশ নেমেসিসের কাছে সমর্পণ না করে মানুষের কল্যাণে তার প্রতিভাকে নিয়োজিত

করতো তাহলে নিউটন আর আইনস্টাইনের সাথে এক সারিতেই তার নাম লেখা হতো বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে। এক মহতী আবিষ্কারের জন্যে সমগ্র মানবজাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতো তার নাম।'

এই সময় জামান এসে পড়েছিল সিম্পসনের চেম্বারে। মি. সিম্পসন তাকে সমাদরে বসিয়ে আবার ফিরে গেলেন আপন বক্তব্যে।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আণ্ডার গ্রাউণ্ডের সেই বিরাট ল্যাবরেটরিতে অমরত্বের সাধনায় অসামান্য প্রতিভার পণ্ডশ্রম হচ্ছিলো না কি?'

জামান ভ্রূ কোঁচকাল, 'সেই পাষণ্ড কুয়াশার কথা হচ্ছে বুঝি? আমি ভেবে পাইনে আপনারাও, অর্থাৎ পুলিস বিভাগের লোকরাও একটা নরপশুকে এমন করে শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসিয়ে কি করে তাকে পূজা করছেন। কুয়াশা একটা খুনী, জঘন্য অপরাধী। মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি। আর তাকে পাওনা শাস্তি কড়ায়-গণ্ডায় পাইয়ে দেবার জন্যে পুলিসকে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে যেতে হবে।'

ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করলো জামান।

তার কথার কোনও জবাব দিতে পারেনি কামাল। মাতৃহন্তা কুয়াশাকে জামান কেন, কেউই কোনও দিন ক্ষমা করতে পারে না। ওর জীবনের চরম বেদনা কুয়াশাকে ঘিরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

সিম্পসন স্বভাবসুলভ মৃদুস্বরে বললেন, 'জামান, কুয়াশার প্রতিভার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ কখনো কর্তব্যবোধকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। কি জানো—কুয়াশার আণ্ডার গ্রাউণ্ড ল্যাবরেটরিতে আমাদের হানা দেবার পর গত আট মাস তার কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।'

জামান ভ্রূকুটি করে বললো, 'কে জানে কোন শ্মশানে সে তান্ত্রিক মতে শব-সাধনা করছে। পিশাচসিদ্ধ হবার বাসনায় নরমুণ্ডের মালা নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলছে।'

বর্তমানে ফিরে এলো কামাল।

শহীদের ধুলোর আস্তরণ-পড়া ক্রিমিনোলজির বইয়ের গাদার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই হাসলো।

সন্ধ্যা নেমেছে বাইরে। গফুর দ্বিতীয় দফা চা নিয়ে এলো। তার সাথে গরম সমুচা। এটা গফুরের স্পেশাল।

গরম সমুচা মুখে পুরতেই ইলেকট্রিক বেলের বিদঘুটে আওয়াজটা কানে এলো। একটু পরে গফুর ফিরে এলো। বললো, 'একজন সাহেব দেখা করতে এসেছেন।'

চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে কামাল জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে চান তিনি?'

'প্রথমে দাদামণিকে চাইছিলেন। নেই শুনে আপনার নাম বলছেন। বাইরের ঘরে

বসিয়ে এসেছি।'

'ঠিক আছে। বাইরে চা দাও এক কাপ। আমি যাচ্ছি।'

চা শেষ করে ড্রইংরুমে এলো কামাল। আর ঢুকেই চক্ষুস্থির। কুয়াশা। হ্যাঁ, কুয়াশা বসে আছে তার সামনে। স্বপ্ন দেখছে নাতো কামাল? বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দরজার মাঝখানে।

প্রথমে কথা বললো কুয়াশাই। মৃদু হেসে বললো, 'অবাক হয়ে গেছো, না? তা অবাক হবার কথাই বটে। কিন্তু আর যাই করো ভয় পেয়ো না। ভয় দেখাতে আসিনি। শহীদ নেই—তাই তোমাকেই বলছি। আরে, দাঁড়িয়ে কেন? বসো। আমি নিরস্ত্র।'

কামালের বিস্ময় অনেকটা কেটে গেছে তখন। কিন্তু কুয়াশার এই দুঃসাহসিকতায় চমৎকৃত না হয়ে পারছিল না সে। যাকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে আট মাস ধরে, সে নিজেই এসেছে তাদেরই একজনের কাছে। অথচ তাকে আইন অনুযায়ী যথোচিত সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন করা হয়নি।

কুশনে দেহটা এলিয়ে দিলো কামাল। না এই মুহূর্তে তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। নিশ্চিন্তে তার সাথে ড্রইংরুমী ভদ্রতা করা যেতে পারে। কুয়াশাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো কামাল। সেই শালপ্রাংশু দেহ। প্রশস্ত ললাট। যামিনী রায়ের আঁকা অর্জুনের চোখের মতো বিশাল দুটি বুদ্ধি প্রদীপ্ত চোখ। সবই আগের মতো। তবুও ওর চোখে পড়লো প্রশস্ত ললাটে বলিরেখা। চিন্তার লাঙ্গল কপালটা চিরে দিয়েছে—না মহাকালের নির্ভুল নিয়ম? কে জানে? আর মুখেই বা ক্লান্তির ছাপ কেন?

সিগারেট কেস খুলে দামী সিগারেট বের করলো কুয়াশা। গ্যাসলাইটারটা জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছাড়লো নিশ্চিন্ত মনে। মুখ তুলে বললো, 'আমার সময় কম। কাজের কথায় আসা যাক।'

গফুর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঢুকলো। টিপয়টা এগিয়ে এনে ট্রে রেখে বেরিয়ে গেল। কুয়াশা কামালের চোখের দিকে লক্ষ্য রাখলো।

তারপর হেসে বললো, 'চা খাবার সময় নেই আমার। মেনি থ্যাঙ্কস।'

একটু থেমে কুয়াশা বললো, 'আজ ইস্কাটন ক্লাবে পরলোকগত শিল্পপতি হাফিজুর রহমানের একমাত্র সন্তান মিস্ রুবিনা রহমানের বিয়ে হামিদ জালাল নামে এক কন্ট্রাকটরের সাথে। আশঙ্কা করছি, বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যেই রুবিনা রহমানকে খুন করবার চেষ্টা করা হবে। এই খুনটাকে যে করেই হোক রোধ করতে হবে। পারবে?'

কামাল চমকে উঠলো। বিয়ের দিন কনে খুন হবে। খুন হবে রুবিনা রহমান। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো কামাল।

'উত্তেজিত হয়ো না কামাল। যে কোনো ভাবে এই খুনটাকে ঠেকাবার ব্যবস্থা করো। আমি নিজেই যেতাম; কিন্তু আমি আজ রাতে ব্যস্ত থাকবো এক ডাকাত দলের লুণ্ঠনদ্রব্য লুণ্ঠনে। অর্থাৎ ডাকাত দলের উপর পাল্টা ডাকাতি করবো। তাই এদিকে সময় দিতে পারছিনে।' কুয়াশা হাসলো।

আবার বিস্ময়াভিভূত হলো কামাল। কি দুঃসাহস কুয়াশার। আজ রাতে সে ডাকাতি করবে স্পষ্ট ভাষায় শুনিয়ে গেল কামালকে—যে নাকি কুয়াশাকে ধরবার জন্যে বলতে গেলে শপথই নিয়েছে। কামালের সব চিন্তা-ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে আসছে। আবার সে ভাবলো, স্বপ্ন দেখছি নাতো?

কুয়াশা যেন তার মনের কথা পড়তে পারলো। হেসে বললো, 'না স্বপ্ন দেখছো না। শহীদের ড্রইংরুমে বসে বাস্তব জগতে কুয়াশার সঙ্গ-সুখ উপভোগ করছো কামাল। হ্যাঁ শোনো, যে খুন করতে চাচ্ছে তাকে আমি জানি। তার শাস্তিও তাকে আমি নিজের হাতেই দেবো, দেবো কঠোরতম দণ্ড। আচ্ছা চলি। গুড নাইট।'

'একটু দাঁড়ান,' কামাল বললো।

'বলো।'

'একটা কথা বুঝতে পারছিনে, কুয়াশা। একটা সামান্য মেয়ের জন্যে যদি আপনার এতোই মায়া, তাহলে নির্মম হাতে ঠাণ্ডা মাথায় একের পর এক নরহত্যা করেন কি করে? তখন আপনার এই মমতা কোথায় থাকে?' কামালের কণ্ঠে উত্তেজনা।

কুয়াশা কিছুক্ষণ কামালের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'নরহত্যাকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি কামাল। কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্যে, রোগ জ্বরা থেকে চির-মুক্তিদানের জন্যে আর মানুষের অমরত্বের সাধনায় যারা মরে তাদের মৃত্যু মহান। যাক, সময় নেই আমার। আচ্ছা, গুড নাইট।'

কুয়াশা উঠে দাঁড়ালো। মাথাটা একটু নুইয়ে বেরিয়ে গেল। কামালের মনে হলো কুয়াশা যেন ব্যঙ্গ করলো তাকে। বাইরে গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ কানে এলো। সোফা ছেড়ে এক লাফে বাইরে এসে দাঁড়ালো কামাল। গাড়িটা তখন ধোঁয়া ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

নিঃশ্বাস ফেলে আবৃত্তি করলো কামাল, 'দুঃসাহস, তোমার নাম কুয়াশা।'

কামাল দ্রুত ফিরে গেল ড্রইংরুমে। সময় নেই তারও। রুবিনা রহমানকে যদি সত্যি খুন করবার চেষ্টা করা হয় তাহলে বাঁচাতে হবে তাকে।

জামানকে টেলিফোন করতে যেতেই খেয়াল হলো সে নিশ্চয়ই এখন লিলির কিডন্যাপারের সন্ধানে বেরিয়েছে। সিম্পসনও বেরিয়েছেন। ন'টার আগে পাওয়া যাবে না। ইস্কাটন ক্লাবে ডায়াল করতে থাকলো কামাল। এনগেজড্ সাউণ্ড ভেসে আসছে।

এখন উপায়? অসহায় উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলো সে।

লালবাগ থানায় টেলিফোন করে মোজাম্মেল হককে চাইলো কামাল। দ্রুত ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বলে সিম্পসনকে খবর দিতে বললো। বিস্মিত হক সাহেব বললেন, 'আচ্ছা, অহনই খবর দিতাছি।'

রিসিভার রেখে বেরিয়ে এলো কামাল ঘর থেকে। গাড়িতে চেপে বসে স্টার্ট দিলো। এঞ্জিন নিঃশব্দে ব্যঙ্গ করলো তাকে। ব্যাটারী ডাউন।

'সর্বনাশ। তাহলে উপায়? এঞ্জিনের কি হলো?' ঘড়ি দেখলো কামাল। সোয়া আটটা বাজে। ইশ। পঁয়তাল্লিশ মিনিট নষ্ট হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেটের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলো সে।

চার

রাত দুটো বেজে গেছে।

মসীকৃষ্ণ কুটিল অন্ধকারে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের পথের দু'ধার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু দূরে এখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছে দু-চারটে আলো মিটমিট করে অন্ধকারের সাথে যুঝে চলেছে। ঝিঁঝি পোকার একটানা আর্তনাদ আর গাছের পাতায় আটকে থাকা পানি পথের উপর গড়িয়ে পড়ার টুপটাপ শব্দ রাতের নিঃশব্দকে ভারি করে তুলছে।

আকাশটা কালো মেঘে আচ্ছন্ন। বৃষ্টি বোধহয় আবার নামবে। ফতুল্লা ষ্টেশন পেরিয়ে আষাঢ়ের ভরা বুড়িগঙ্গা যেখানে সড়কের পাশে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সেখানটায় ছোটো ছইওয়ালা ডিঙি এসে থামলো তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদীর তীরে একটা ছোটো ব্রিজের পাশে। নৌকার তিনজন আরোহীর মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের দেরি হয়নি তো, ভাইয়া?'

ছই-এর ভিতর থেকে ভারি গলায় আওয়াজ ভেসে এলো, 'নারে, পাগলা। দেরি হবে কেন? সময়ের হিসেবে কুয়াশাকে কখনও ভুল করতে দেখেছিস?'

লোকটা কোনও উত্তর দিলো না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে রইলো। ভিতর থেকে মৃদু ঢক ঢক শব্দ কানে এলো। হুইস্কির বোতলটা শেষ হয়ে গেল বোধহয়।

ভারি গলাটা কানে এলো, 'তবে সময় বেশি নেই। সোয়া দু'টো থেকে আড়াইটার মধ্যে নুরবক্সের দলটাকে আশা করছি।'

'ওদের মোটর বোটটা কোথায় আছে?'

'মোটর বোট আছে নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জে। নুরবক্সের দল এসে সঙ্কেত করলেই ওপার থেকে মোটর বোট চলে আসবে। কিন্তু তার আগেই আমাদের কাজ

সারতে হবে।'

মেঘগুলো ক্রমে সরে গিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঁকি দিলো। বুড়িগঙ্গার বুক ঝিকমিক করে উঠলো মুহূর্তে।

ভারী কণ্ঠস্বরের মালিক বেরিয়ে এলো ছই-এর ভেতর থেকে—মুখে তার মুখোশ। ডিঙি থেকে নেমে ব্রিজের পাশে ঢালু জমিতে এসে দাঁড়ালো। সামনে ছোটবড় আগাছার ঝোপ। রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িটা দেখলো একবার। সোয়া দু'টো বেজে গেছে। ডিঙিটাকে ওরা ধাক্কা দিয়ে ঢোকালো ব্রিজের তলায়। ছোটো একটা আংটার সাথে বাঁধলো নৌকার দড়ি।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কেটে যাবার পর ভারি গলাটা আবার শোনা গেল, 'যা মান্নান। সময় হয়ে গেছে। কলিম, তোর রিভলভার ঠিক আছে তো?'

অন্ধকারে জবাব শোনা গেল, 'জ্বি, ঠিক আছে।'

দু'জন এগিয়ে গেল নিঃশব্দে। একটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়ালো। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলো দু'জন।

কুয়াশা একটু দূরে একটা বটগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালো।

দূরে, বহুদূরে নারায়ণগঞ্জের দিকে একটা ক্ষীণ আলো ওদের চোখে পড়লো। গতিশীল আলোটা দেখেই বুঝলো, ওরা আসছে। আলোটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল ওদের দিকে। নিস্তব্ধতাকে দূর করে গাড়ির শব্দ এসে পৌঁছলো ওদের কানে। ওরা দু'জনই শুয়ে পড়লো। শব্দটা নিকটবর্তী হলো। কয়েক সেকেণ্ড পরে একটা গাড়ি এসে থামলো ওদের খুব কাছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইলো ওরা। মান্নান আস্তে আস্তে মাথাটা তুললো। গাড়ির আলোটা নিভে গেছে।

কে একজন একটা টর্চ জ্বালালো। চারদিকে আলোটা ফেলে দেখলো একবার। মান্নান মাথা নামালো। উঃ, আর একটু হলেই ধরা পড়েছিল আর কি! টর্চের আলোটা নদীর উপর নিক্ষিপ্ত হলো। কয়েক সেকেণ্ড পরে টর্চটা নিভে গিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার জ্বলে উঠলো। আবার নিভলো, আবার জ্বলে উঠলো। নদীর ওপার থেকেও তেমনি জ্বলে উঠলো আলো তিনবার।

মোটর গাড়ির আরোহীদের মধ্যে একজন দেশলাই জ্বালালো। সিগারেট ধরালো। সেই আলোয় দেখা গেল গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে চারজন। হয়তো ভিতরেও দু'একজন আছে।

না আর দেরি করা ঠিক হবে না। মান্নান আর কলিম এগোলো হামাগুড়ি দিয়ে। ঝোপঝাড় দুলে উঠলো। কেউ কিছু বোঝবার আগেই পথের উপর যেন বজ্রপাত হলো। নিঃশব্দে দু'জন গিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ চালালো। মান্নান প্রথমেই রিভলভারের বাঁট

দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে একজনকে মাটিতে ফেলে দিলো। ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা মুহূর্তের জন্যে বিহ্বল হলেও সামলে উঠতে এক সেকেণ্ডও দেরি হলো না। সঙ্গে সঙ্গে ওরা উল্টো আক্রমণ করলো। গাড়ির ভিতর থেকে কে যেন বললো, 'সর্বনাশ!'

মান্নান এক দৌড়ে গাড়ির পিছন দিয়ে ঘুরে তার দিকে এগোতেই পিছন থেকে তার উপর একজন ঝাঁপিয়ে পড়লো। মান্নান মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটির উপর। সেই অবসরে লোকটা তার উপর চেপে বসে চুলের মুঠো ধরে মাটির উপর মাথাটা বারবার আঘাত করতে লাগলো। নাকটা থেঁতলে রক্ত বেরিয়ে গেল মান্নানের। পকেট থেকে ছোরা বের করে মারবার উপক্রম করতেই লোকটা কলিমের এক লাথিতে কয়েক হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। বাকি দু'জন কলিমের দিকে এগিয়ে এলো।

কলিম ডান হাতের এক প্রচণ্ড ঘুসি চালালো আক্রমণকারীদের একজনের উপর। উঃ! ক্ষীণ আর্তনাদ ভেসে এলো। লোকটা গিয়ে ছিটকে পড়লো পথের ধারে। গাড়ির ভিতর থেকে ততক্ষণে আর একজন এসে দাঁড়িয়েছে। হিংস্রতায় তার চোখ দুটো জ্বলছিল। কলিম চিনতে পারলো নুরবক্সকে। তার বাঁ হাতে ছোরা ডান হাতে রিভলভার। কলিম ক্ষিপ্রগতিতে তার দিকে এগোতেই ডান দিক থেকে তার উপর আর একজন আক্রমণ চালালো ছোরা হাতে। সাঁ করে সরে এলো কলিম। নুরবক্সের হাতের রিভলভার গর্জে উঠলো নিস্তব্ধতার বুক চিরে। আক্রমণকারী পড়ে গেল মাটিতে। কলিমের চোখে-মুখে উষ্ণভেজা কি যেন ছিটকে এসে লাগলো। কয়েক সেকেণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট্ করলো লোকটা। নুরবক্স বোধহয় হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কলিম সেই সুযোগ ছাড়লো না। চট করে নুরবক্সের তলপেট বরাবর ঘুসি চালালো। নুরবক্স পাশ কাটিয়ে সরে গিয়ে দ্বিতীয়বার পিস্তল তুললো। কলিম এক লাফে গিয়ে তার হাতটা উপরের দিকে ঠেলে দিলো। গুলিটা আকাশের দিকে চলে গেল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলো নুরবক্সের চোয়াল বরাবর। গাড়ির উপর গিয়ে সে চিৎ হয়ে পড়লো। মার্ডগার্ডের উপর ডান হাত। কলিম পা দিয়ে ডান হাতের উপর চাপ দিয়ে নিচু হয়ে এক ঝটকায় রিভলভারটা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো পানির মধ্যে। ইতিমধ্যে মান্নান আবার উঠে দাঁড়িয়ে একজনের সাথে লড়ছিল। প্রচণ্ড ঘুসোঘুসি করছিল দু'জন। সেই ফাঁকে আর একজন ছুটে গেল মান্নানের দিকে ছোরা হাতে। কলিম নুরবক্সকে ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে পিছন থেকে পাঁজাকোলা করে শূন্যে তুলে আছাড় মারলো। 'কোঁক' করে শব্দ হলো একটা। মান্নানের সাথে যে লড়াই করছিল সে দৌড়ে ছুটে গেল নদীর দিকে। মান্নান ছুটলো তার পিছনে পিছনে। ঝপাৎ করে শব্দ হলো।

নুরবক্স আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে ছোরা। বুনো শুয়োরের মতো ছুটে এলো কলিমের দিকে। শব্দ শুনে পিছনে তাকালো কলিম। অকস্মাৎ শুয়ে পড়ে ঘুরে

নুরবক্সের দু' পায়ের ফাঁকে পা চালিয়ে দিলো কলিম। কাত হয়ে পড়ে গেল নুরবক্স। উঠে দাঁড়াবার আগেই তলপেটে প্রচণ্ড লাথি চালালো কলিম। তবুও শেষ চেষ্টা করতে ছাড়লো না নুরবক্স। যন্ত্রণায় অস্থির হয়েও ছোরাটা ছুঁড়ে মারলো কলিমের পাঁজর লক্ষ্য করে। সেটা এসে বিঁধলো কলিমের বাঁ হাতে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলো কলিম। ডানহাত দিয়ে ছোরাটা টেনে বের করলো। চেপে ধরলো ক্ষতস্থানটা।

ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো কুয়াশা। নুরবক্স তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কুয়াশা তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে নুরবক্সের চোখ পড়লো কুয়াশার মুখোশ পরা মুখটার উপর। সমস্ত শরীর মুহূর্তে শিউরে উঠলো তার।

কলিম বললো, 'শেষ করে দেই বদমাশটাকে।'

কুয়াশা বললো, 'না। ওকে চরম শাস্তি দেবার সময় এখনও আসেনি। আরও যন্ত্রণাভোগ করুক।'

পিটপিট করে তাকিয়ে রইলো নুরবক্স কুয়াশার দিকে। পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লো মাথার পিছনে কলিমের এক লাথি খেয়ে।

মান্নান গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো। টর্চ জ্বেলে দেখলো পিছনের সিটে তিনটে পেটমোটা ব্যাগ রয়েছে। দ্রুত হাতে একটা খুলে দেখলো সোনা আর জড়োয়া গয়নায় ভর্তি। বন্ধ করে ব্যাগ তিনটে নিয়ে এলো।

মোটর বোটের শব্দ কানে এলো ওদের।

কুয়াশা বললো, 'আরও ব্যাগ আছে বোধহয় গাড়ির পেছনে।' মান্নান আবার ছুটে গেল। গায়ের জোরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বুটের বনেট্টা খুলে ফেললো। টর্চ জ্বেলে দেখলো সেখানেও আছে তেমনি পেটমোটা চারটে ব্যাগ। দ্রুতহাতে নামিয়ে আনলো সেগুলো মান্নান।

কুয়াশা ধীরে ধীরে ব্রিজের উপর গিয়ে দাঁড়ালো।

মোটর বোটটা পাড়ে ভিড়লো। কলিম আর মান্নান চট করে এসে দাঁড়ালো গাড়ির আড়ালে। মোটর বোটের এঞ্জিনের শব্দ থেমে গেছে। কে একজন মৃদুস্বরে বললো, 'শালারা এখনও পালায়নি বোধহয়।'

মান্নান ফিসফিস করে বললো, 'এই লোকটাই বোধহয় নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। ফিরে এসেছে আবার।'

ওরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে রাস্তার দিকে উঠে এলো। সংখ্যায় ওরা তিনজন। টর্চের আলো ফেলে এগোলো সাবধানে। গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো একজন।

মান্নান দৌড়ে এসে পিছন থেকে জাপটে ধরলো তাকে। এক ঝাঁকুনিতে সে মান্নানকে ছাড়িয়ে প্রচণ্ড ঘুসি মারলো একটা। মান্নান চিৎ হয়ে পড়ে যেতেই লোকটা চেপে বসলো মান্নানের বুকের উপর। গলাটা টিপে ধরলো সমস্ত শক্তি দিয়ে। মান্নান ওর হাত দু'টো সরিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। শরীরটা শিথিল হয়ে আসছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কলিম আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না। পিছন থেকে এসে আক্রমণকারীর পাঁজরের উপর লাথি চালালো। আর্তনাদ করে পড়ে গেল লোকটা। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই চোয়াল লক্ষ্য করে লাথি হাঁকালো আর একটা। পাক খেয়ে পড়ে গেল। কষা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

ডানদিক থেকে আর একজন ছুটে এলো। হাতে তার লোহার ডাণ্ডা। সেটা ব্যবহারের আগেই মান্নানের পিস্তল গর্জন করে উঠলো।

পায়ে গুলি লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা।

তৃতীয় লোকটা হতভম্ব হয়ে দেখছিল। সে আর না এগিয়ে মোটর বোট খুলে দিলো। কলিম দৌড়ে গিয়ে বোটে চাপলো। লোকটা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নেবার আগেই কলিম তাকে জাপটে ধরে ছুঁড়ে দিলো পানিতে। মোটর বোটটা দুলে উঠলো। ঝপাৎ করে শব্দ হলো একটা। বৈঠা হাতে নিয়ে দাঁড়ালো কলিম। কয়েক সেকেণ্ড পরেই লোকটাকে দেখা গেল একটু দূরে। তারপর আবার ডুব দিলো।

মান্নান ততক্ষণে উঠে এসেছে। ওর দেহে তখন অসহ্য বেদনা। তবু তা উপেক্ষা করে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। অবশিষ্ট ব্যাগগুলো এনে তুললো মোটর বোটে। কুয়াশাও এসে চাপলো বোটে।

ঢাকার দিক থেকে কয়েকটা উজ্জ্বল আলোর রেখা দেখা দিলো পথের উপর। একটু পরেই শোনা গেল মোটর গাড়ির আওয়াজ।

এতক্ষণ পরে ওরা আবার কথা বললো।

কুয়াশা বললো, 'পুলিস আসছে বোধহয়। স্টার্ট দে মান্নান।'

মান্নান স্টার্ট দিলো। গতি সঞ্চারিত হলো বোটে। স্টিয়ারিং ধরলো কুয়াশা। মুহূর্তে ওরা নদীর মাঝামাঝি চলে এলো। মোটর গাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে ক্রমেই ব্রিজটার কাছে এসে পড়ছে। হঠাৎ তার চোখে পড়লো একটা মানুষের মূর্তি নদীর দিকে নেমে আসছে।

পাঁচ

গাড়িগুলো ব্রিজটার কাছে আসতেই এই গভীর রাতে ব্রিজের কাছে নতুন মডেলের আনকোরা টয়োটা করোনা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয়েছিল জামানের। ব্যাপারটা কি খোঁজ নেবার জন্যে গাড়ি থামালো সে। সিম্পসন চোখ বুজে গাড়ির অন্ধকারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন।

জামান গাড়ি থামাতেই তিনি বললেন, 'কি হলো?'

ওরা সবাই যাচ্ছিলো নারায়ণগঞ্জ। রুস্তম বাহমনীর জুয়েলারীতে ডাকাতি হয়ে গেছে রাত একটার দিকে। নারায়ণগঞ্জ পুলিস ওদের সাহায্য চেয়েছে।

ইস্কাটন ক্লাবে তদন্ত সেরে ঘরে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল জামান। সন্ধ্যায়ই কামালের মুখে শুনেছিল কুয়াশার আজ রাতের অভিসারের দম্ভ ভরা উক্তি। রাত দু'টোয় টেলিফোন করে যখন ঘুম ভাঙালেন সিম্পসন, ব্যাপারটা তখনই আন্দাজ করতে কষ্ট হয়নি ওর।

হাই তুলে ঘুমজড়িত গলায় রিসিভার তুলেছিল জামান। হ্যাল্লো, জামান স্পিকিং…মি. সিম্পসন?…কোথায় হলো ডাকাতি…ওঃ …নারায়ণগঞ্জ। না, কুয়াশা নয় বোধহয়…সে তো কামালকে বলেছিল ডাকাতদের ওপর ডাকাতি করবে…কুয়াশার বৈশিষ্ট্য?…এখুনি যাবেন…আমি?…দেখি যদি কুয়াশার সাথেও সাক্ষাৎ হয়ে যায়…হ্যাঁ আসছি…পনেরো মিনিটের মধ্যে।

জামান দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে গাড়ি নিয়ে বেরোলো। পিস্তলটা নিতে ভুললো না। সিম্পসন ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। কয়েকজন কনস্টেবল সাথে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ রওনা দিলো দু'জন। রাত তখন তিনটে।

শেষরাতের ক্লান্ত জ্যোৎস্না মায়া ছড়িয়েছে নারায়ণগঞ্জের পথের পাশে। আকাশে আর মেঘ নেই। অসংখ্য তারা জ্বলছে মিটমিট করে। মাঝে মাঝে দু'চারটে বাড়ি, কারখানা, দোকান, খেত। তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে আষাঢ়ের পানি ফুলে ফেঁপে উঠেছে বুড়িগঙ্গায়।

সিগারেট জ্বাললো জামান। সামনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে এগিয়ে চললো। তার পাশেই সিম্পসন। কেউ কোনো কথা বলছে না।

ইস্কাটন ক্লাবের নাতিবৃহৎ কামরাটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো জামানের। লাল রঙের উপর জরীর কাজ করা বহুমূল্য শাড়ি পরা অপূর্ব সুন্দরী তরুণীর নিস্পন্দ দেহ,

রক্তে ভেজা ব্লাউজ আর শ্বেতশুভ্র গালিচ; মৃত যন্ত্রণাকাতর চন্দনচর্চিত মুখশ্রী; বিকার-হীন-মুখ, খাকি পোশাক পরা পুলিস; আতরের সুবাস, ফিসফাস কথা; সন্ত্রস্ত চেহারার কয়েকজন নারী-পুরুষ খণ্ড খণ্ড চিত্রের মতো উঁকি দিলো ওর মনের কোণে।

যে কামরায় রুবিনা নিহত হয় তার পিছনের সরু বৃষ্টি ভেজা গলিতে পায়ের ছাপ। একটা ওষুধের কৌটা। আরও কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ছবি।

নিমন্ত্রিতদের কিছু কিছু ততক্ষণে চলে গেছেন। উৎসবমুখর বিয়ে বাড়ির আনন্দ উল্লাস নিভে গেছে এক ফুঁয়ে। আলোকমালার লাল নীল সবুজ বাতিগুলো নির্ধারিত বিরতিতে আর জ্বলে উঠছে না।

শেরোয়ানী পরা শোকমলিন এক যুবক নিস্পন্দ রুবিনা রহমানের শিয়রে বসে আছে। একটা পাগড়ি গড়াগড়ি খাচ্ছে তার পায়ের কাছে।

প্রাঙ্গণে এখানে সেখানে বেয়ারারা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এখনও লোক রয়েছে বিস্তর কিন্তু কোনো এক জাদুমন্ত্রের স্পর্শে যেন সবাই নির্বাক চলচ্চিত্রের চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

শহীদ আর মহুয়া হল ঘরটার সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল আরও কয়েকজনের সাথে। জামানের সাথে শহীদের চোখাচোখি হলো। জামান দাঁড়ালো এক সেকেণ্ডের জন্যে। কি একটা ইঙ্গিত বিনিময় হলো দু'জনের মধ্যে। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল জামান।

খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো কামালকে। তার পাশে বিশাল বপু দারোগা মোজাম্মেল হক। তার পাশের চেয়ারে সিম্পসন। সামনে ড. রহমান। রুবিনার চাচা। জামানের পরিচিত। বিধ্বস্ত চেহারা। উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

মোজাম্মেল হকের টাকটা আরও প্রশস্ত হয়েছে। বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ে চকচক করছে।

জামানের পায়ের আওয়াজে মুখ তুললো সবাই।

সিম্পসন বললেন। 'এই যে এসে গেছো দেখছি।'

জামান জবাব না দিয়ে ড. রহমানের দিকে মাথাটা একটু নুইয়ে এগিয়ে গেল চাদর দিয়ে ঢাকা লাশটার দিকে। চাদরটা তুলে কয়েক সেকেণ্ড নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখলো রুবিনা রহমানের লাশটা। আবার ঢেকে দিলো চাদর দিয়ে।

'ঘটনাটা কখন ঘটেছে মি. সিম্পসন?' প্রশ্ন করলো জামান।

'রাত সাড়ে আটটার দিকে।'

'কিভাবে ঘটলো?'

'হঠাৎ করে ক্লাবের সব বাতি নিভে যায় ঠিক সাড়ে আটটায়। আর সেই অন্ধকারে

আততায়ী তার জিঘাংসা চরিতার্থ করেছে।'

জামান একটু বিস্মিত হলো। বিয়ের কনের ঘরে স্বাভাবিকভাবে অসংখ্য মহিলা থাকবার কথা। তাদের মধ্যে আলোতেই কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির দিকে গুলি ছোঁড়া কঠিন। অন্ধকারে তো কথাই নেই। হত্যাকারীর হাতের টিপ যে নির্ভুল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ড. রহমান জামান আর সিম্পসনের কথা শুনছিলেন।

পাজামা–পাঞ্জাবী পরা শুকনো মুখ এক তরুণ এগিয়ে এলো। জামান দেখলো তার চোখের কোণ চিকচিক করছে।

সিম্পসন পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাইদুল হক। রুবিনার ফুফাতো ভাই।

কান্নাভরা গলায় সাইদুল হক বললো, 'মি. সিম্পসন, গেস্টরা বাকি যারা আছেন সবাই চলে যাবার জন্যে উসখুস করছেন। আপনি যদি বলেন…।'

সিম্পসন মৃদুস্বরে বললেন, 'তা তাঁরা যেতে পারেন। শুধু মিসেস ফকরুন্নেসা কবীর, মিসেস জাহেদা করিম আর মিস সাদিয়া খোরাসানীকে আগামীকাল সকাল ন'টায় ড. রহমানের বাসায় আসতে বলবেন দয়া করে। মি. জালাল, আপনিও আসবেন অনুগ্রহ করে।'

সাইদুল হক নিষ্ক্রান্ত হলো। বরের পোশাক পরা হামিদ জালাল চোখ তুলে তাকালো সিম্পসনের দিকে। কিছু বললো না।

জামান জিজ্ঞেস করলো, 'শুধু এই তিনজনকেই কেন? হত্যাকাণ্ডের সময় এই তিনজনই বুঝি এই ঘরে ছিলেন?'

জবাব দিলেন ড. রহমান। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'সবই ভাগ্যের খেলা মি. জামান। হত্যার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঘরটায় তিল ধারণের জায়গা ছিলো না। অথচ এখন শুনতে পাচ্ছি ঘটনার সময় মাত্র তিনজন নাকি ছিলো সেখানে।' তিনি একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। সে হাসি কান্নার মতো মনে হলো।

সিম্পসন ব্যাখ্যা করলেন ঘটনাটা। 'হত্যাকাণ্ডটা যখন ঘটে তখন যতদূর মনে হয় মাত্র তিন–চারজনই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলো। কারণ ঠিক সেই সময়ই বর এসে পৌঁছায়। যারা রুবিনার কাছে ছিলো তারা সবাই বর দেখতে ছুটেছিল। ঘরটা তাই নিতান্তই ফাঁকা ছিলো তখন। খুব সম্ভব হত্যাকারী আগে থেকেই এই ধরনের পরিকল্পনা করে রেখেছিল।'

ঘরের চারদিকে বড় বড় জানালা। ভারি বাসন্তী রঙের পর্দা দিয়ে ঢাকা। জামান উঠে পিছনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আবছা আলোয় দেখলো হাত দুয়েক দূরে উঁচু পাঁচিল।

সিম্পসন ওদিকে দারোগা মোজাম্মেল হককে ডেকে লাশটা মর্গে পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কামাল আর জামানকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। বারান্দায় এসে দাঁড়ালো তিনজন। সিম্পসন বললেন, 'কুয়াশার সতর্কবাণী সত্ত্বেও মেয়েটাকে বাঁচানো গেল না।'

জামান ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'তার মানে?'

সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলো কামাল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিম্পসন বললেন, 'আমরা প্রস্তুত হয়ে আসবার আগেই আততায়ী তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে ফেলেছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এখানে এসে যখন পৌঁছলাম তার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে সব শেষ হয়ে গেছে।'

সিম্পসন আশা করছিলেন কুয়াশার নাম শুনে জামানের মুখটা ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠবে। তিনি তাকিয়ে ছিলেন জামানের মুখের দিকে। কিন্তু জামানের মুখের ভাব পাল্টালো না। সিম্পসন মনে মনে হাসলেন।

জামান ভাবছিল, কুয়াশা তাহলে সত্যি আবার লাইম লাইটে এলো। ওদের অনুমান সত্য হলো।

হত্যাকারী তাহলে কুয়াশার অতি পরিচিত। তার সামান্যতম অভিলাষও জানা আছে কুয়াশার। তার অর্থ হচ্ছে দু'জনের মধ্যে রয়েছে শত্রুতা। কিন্তু কুয়াশা নিজে মেয়েটার প্রাণ বাঁচাতে না এসে শহীদ খানের উপর দায়িত্বটা কেন চাপাতে গিয়েছিল বুঝতে পারলো না জামান।

'চলুন, মি. সিম্পসন, আমরা চারদিকটা ঘুরে আসি,' জামান বললো।

'তুমি যাও, জামান। আমি ঘুরে এসেছি।'

জামান নেমে গেল টর্চ হাতে। লনটা ঘুরে ঘুরে দেখলো ডাইনে-বাঁয়ে। যে ঘরটায় রুবিনাকে হত্যা করা হয়েছে তার পিছনে এসে দাঁড়ালো। ঘরটার পেছনে উঁচু দেয়াল। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। একজন চলতে পারে কোনও ক্রমে। নিচের দিকে টর্চের আলো ফেললো। ভেজা মাটি। মাঝে মাঝে বৃষ্টির পানি জমে আছে। তার উপর একজোড়া জুতোর ছাপ অত্যন্ত গভীর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল জামান। কাদার উপর ছোটো একটা কৌটা আলো পড়ে চিকচিক করে উঠলো। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সেটা দিয়ে কৌটাটা জড়িয়ে পকেটে পুরলো। জানালা পর্যন্ত গিয়েই পায়ের ছাপটা বেঁকে গেছে, তারপর আবার সামনের দিকে চলে গেছে।

ফিরে এলো জামান।

ইস্কাটন ক্লাবের ঘটনাগুলোর মধ্যে মালা গাঁথবার চেষ্টা করছিল জামান। ফুলস্পীডে

গাড়ি চলছে নারায়ণগঞ্জের পথে। জায়গাটার নাম বোধহয় পাগলা। বুড়িগঙ্গা নদীটা এঁকেবেঁকে সড়কটার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। নদীর পানিতে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি।

হঠাৎ বর্তমান বাস্তবতার রূপ নিয়ে দাঁড়ালো সামনে। এই গভীর রাতে নির্জন নদী তীরে পথের মাঝখানে সর্বশেষ মডেলের টয়োটা করোনা দাঁড়িয়ে থাকবার অর্থ কি? ইন্দ্রিয়গুলো মুহূর্তে সজাগ হলো জামানের।

গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লো সে। সিম্পসনও নেমে পড়লেন। পিছনের পুলিসের গাড়িটাও থামলো, কোথেকে একটা মোটরবোটের ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। স্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দেখা গেল নদীর মাঝামাঝি একটা মোটরবোট, দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমেই।

ওরা টয়োটার দিকে এগিয়ে গেল। গাড়িটার পাশেই মুখ থুবড়ে একটা লোক পড়ে আছে। টর্চ জ্বাললেন সিম্পসন। মরে গেছে। কালো গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে গেঞ্জি। কপালটায় ক্ষত। রক্ত তখন পর্যন্ত তরল। পুরোপুরি জমাট বাঁধেনি। খুব বেশি হলে হয়তো মিনিট বিশেক আগে আঘাত করা হয়েছিল লোকটাকে।

সিম্পসন পরীক্ষা করে বললেন, 'গুলির আঘাতে মারা গেছে লোকটা। বোধহয় পিস্তল হবে।'

টর্চ জ্বেলে চারদিক দেখলো জামান, আশেপাশে অনেকটা জায়গা। না, আর কিছু নেই। ব্রিজটার দিকে এগোলো জামান। উঁচু হয়ে টর্চের উজ্জ্বল আলোয় দেখলো ব্রিজের পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কয়েকটা ছোটো গাছের মাথা দোমড়ান–মোচড়ান। কিছু কিছু পাতা ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেছে।

সিম্পসন এদিকে গাড়িটা খুলে ভিতরটা দেখছিলেন। দরজা খোলাই ছিলো। বাইরে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে সাবধানে পরীক্ষা করলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিলেন আবার। একজন পুলিসকে ডাক দিয়ে বললেন, 'দেখো, কেউ যেন ভিতরে না ঢোকে বা কিছু স্পর্শ না করে। এখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো একজন।'

দারোগা মোজাম্মেল হক মুখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর হাই তুলছিলেন বারবার। সিম্পসন তাকে ডেকে লাশটার বিহিত করবার নির্দেশ দিলেন।

ঢাকার দিক থেকে একটা গাড়ির আলো এসে ঠিকরে পড়লো জামানের গায়ে। মুহূর্তেই সচকিত হলো সকলে। সিম্পসন পিস্তল বের করলেন। সেপাইরা রাইফেল তুলে দাঁড়ালো। পথের মাঝখানটায় এসে দাঁড়ালেন মোজাম্মেল হক দু'জন রাইফেল-ধারী পুলিস সাথে নিয়ে।

গাড়িটা এসে দাঁড়িয়ে গেল ওদের কাছে। সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অভাবনীয় কিছু একটা ঘটবার আশঙ্কা করছিল।

গাড়ি থেকে ভেসে এলো, 'মি. সিম্পসন।'

'কে? কামাল?' জবাব দিলেন সিম্পসন। পিস্তল নামিয়ে এগিয়ে গেলেন গাড়িটার দিকে।

'সর্বনাশ করেছিলেন একেবারে। সবাই দেখি যুদ্ধংদেহী ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভয় নেই, আমি কামাল। কুয়াশা নই।'

সবাই হেসে ফেললো ওর কথায়। সিম্পসন বললেন, 'এতো দেরিতে যে? তুমি না বললে আজ রাতে বেরোবে না?'

'তাই তো ভেবেছিলাম। কিন্তু ভেঙে যাওয়া ঘুমটা আর এলো না। যাকগে, এখানে কি ব্যাপার?'

জামান বললো, 'এখানে কিন্তু একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে গেছে। একজন মারাও গেছে। ঐ দেখুন লাশ।'

'কুয়াশার কীর্তি নাকি?'

'হতে পারে। চলুন চারদিকটা ভালো করে খোঁজ করে দেখা যাক।' জামান এগিয়ে গেল ব্রিজের দিকে, নিচ থেকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আসছিল। টর্চের আলো ফেললো জামান নিচের দিকে। ব্রিজের একটা আংটার সাথে বাঁধা একটা দড়ি চোখে পড়লো তার। দড়ি ধরে আস্তে আস্তে টান দিতেই ছইওয়ালা ছোটো একটা দেশী নৌকা বেরিয়ে এলো ব্রিজের তলা থেকে। দড়িটা খুলে ব্রিজের পাশে ঝোপঝাড় ভেঙে নৌকাটা টেনে নিয়ে এলো নদীর উল্টো দিকে রাস্তার অপর পাশে।

সিম্পসন এগিয়ে গেলেন ডিঙির কাছে। কামাল এলো পিছন পিছন।

ডিঙিতে উঠে পড়লো সে। পকেট থেকে রিভলভার বের করে নিয়ে ছইয়ের তলায় উঁকি দিলো কামাল। ডিঙি শূন্য। পাটাতনের কাঠগুলো খুললো কামাল। টুং টুং করে শব্দ ভেসে এলো। একি? এ যে দেখছি সরোদ। আলগোছে সরোদটা বের করলো কামাল পাটাতনের তলা থেকে।

সিম্পসন বললেন, 'আরে, এটা একটা সরোদ না?'

কামাল বললো, 'হ্যাঁ, মি. সিম্পসন। কুয়াশা মিথ্যে বড়াই করে না। এখানেই সে ডাকাতির মাল লুট করেছে। আর মৃত লোকটা সেই লুণ্ঠন কার্যের শিকার। সম্ভবতঃ দুর্বৃত্ত দলটিরই লোক, আর সরোদটাই কুয়াশার উপস্থিতির প্রমাণ।'

রাতের আঁধার ফিকে হয়ে আসছে। ঘড়ির কাঁটা পাঁচের ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। নদী থেকে ভেসে আসছে শেষ রাতের হাওয়া। আরও ভেজা আরও ঠাণ্ডা। আকাশটা আবার ঘনকালো মেঘে ঢেকে গেছে। এখুনি বৃষ্টি নামবে বোধহয়।

ছয়

সকাল প্রায় সাড়ে সাতটা। প্রাতরাশ করছিল শহীদ। চায়ে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজ-টার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। মিস রহমানের হত্যাকাণ্ডটা মন দিয়ে পড়ছিল সে।

পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেনঃ গতকাল রোববার ইস্কাটন ক্লাবে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে বিয়ের কনে মৃত্যুবরণ করেন।

পাত্রী মিস রুবিনা রহমান পরলোকগত শিল্পপতি হাফিজুর রহমানের একমাত্র কন্যা। প্রখ্যাত কন্ট্রাক্টর হামিদ জালালের সাথে তার বিয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিলো।

রাত সাড়ে আটটায় হঠাৎ বিয়ে বাড়িতে বাতি নিভে যায়। সেই অন্ধকারে গুলির আওয়াজ আর মেয়েলী কণ্ঠের মর্মবিদারী আর্তনাদ শোনা যায়। ঠিক দু'মিনিট পরেই বাতি জ্বলে ওঠে। তখন গুলিবিদ্ধ ও রক্তস্নাত অবস্থায় মিস রুবিনা রহমানকে ছটফট করতে দেখা যায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

প্রকাশ, ঘটনার সময় শুধুমাত্র ইস্কাটন ক্লাবেই বাতি নিভেছিল।

আশেপাশে সব বাড়িতেই বিদ্যুৎ প্রবাহ ছিল অবিচ্ছিন্ন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সরকারী গোয়েন্দা মি. সিম্পসন ও শখের গোয়েন্দা জনাব কামাল আহমেদ এই হত্যা রহস্যের তদন্তভার গ্রহণ করেছেন। বিশিষ্ট গোয়েন্দা জনাব শহীদ খান বিয়েতে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এই কেস হাতে নিতে অস্বীকার করেছেন। তবে মি. সিম্পসন ও জনাব কামাল আহমেদ দ্রুত আততায়ীদের আইনের হাতে তুলে দেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

শহীদ হাসছিল খবরটা পড়া শেষ করে।

মহুয়া জিজ্ঞেস করলো, 'হাসছো কেন?'

সকালেই বোধহয় গোসল করেছে মহুয়া। ফিরোজা রঙের একটা শাড়ি পরেছে। সকালের শিশিরভেজা তাজা ফুলের মতো লাগছে তাকে। কোঁকড়া চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে। দু-একটা অলকগুচ্ছ এসে পড়েছে কপালের উপর। ফ্যানের বাতাসে নড়ছে একটু একটু। রজনীগন্ধা সেন্টের মৃদু সৌরভ ভেসে আসছে।

মহুয়ার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো শহীদ। প্রশ্নের জবাব দিতে ভুলে গেল।

'আঃ, কি দেখছো অমন করে।' লজ্জা পেলো মহুয়া। 'কথার জবাব দাও। হাসছো কেন?'

আবার মুচকি হাসলো শহীদ। সিগারেট ধরালো একটা। বললো, 'কামাল দেখছি

শিগগির আমার জায়গাটা দখল করবে। ইতিমধ্যেই কাগজে নাম উঠতে শুরু করেছে।'

বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। এঞ্জিন অফ করা হলো। উৎকর্ণ হলো মহুয়া। কামাল এসে গেছে। এঞ্জিনের শব্দটা ওর চেনা।

জুতোর মচ মচ শব্দ করে কামাল এসে ঢুকলো 'সুপ্রভাত, ভাবী। শিগগির নাস্তা দাও। এক সেকেণ্ডও দেরি নয়।'

'তা হয় না, কামাল। বলতে গেলে সারাটা রাত জেগেছিস। চট করে গোসলটা সেরে আয়,' শহীদ বললো।

'তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। বেশ, গোসল করে আসছি।' নিষ্ক্রান্ত হলো কামাল।

আধঘন্টা পরের কথা। কামাল নাস্তা শেষ করে আয়েস করে সিগারেট ধরালো একটা। এক গাল ধোঁয়া ছাড়লো। মহুয়া টেবিল গোছাচ্ছিল। ওকে একটু উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে।

'কুয়াশা তার চ্যালেঞ্জ রেখেছে নিশ্চয়ই?' শহীদ প্রশ্ন করলো।

'তোর বোধহয় সন্দেহ ছিলো?'

শহীদ হাসলো। অসহায়ের হাসি।

'কুয়াশার কাছে আমরা কতো অসহায়।'

মহুয়া চুপচাপ শুনছিল আর টেবিল ক্লথের উপর নখ দিয়ে দাগ কাটছিল।

কামাল নারায়ণগঞ্জ রোডের ঘটনা বর্ণনা করলো।

মহুয়া জিজ্ঞেস করলো, 'সরোদটা কোথায়?'

'গাড়ির ভিতরে। থানায়ই জমা দিতাম। শুধু তোমার ভাইয়ের স্মৃতি হিসেবে নিয়ে এসেছি।'

'না, আমার দরকার নেই।' আশ্চর্য কঠিন শোনালো মহুয়ার কণ্ঠস্বর। শহীদ চমকে তার দিকে তাকালো। কিছু বললো না। মহুয়া অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কুয়াশা আমার ভাই নয়। কেউ নয়। কেউ নয়। আমার ভাইয়ের নাম মনসুর আলী। অনেক বছর আগে তার মৃত্যু হয়েছে।'

ঘর ছেড়ে চলে গেল মহুয়া।

শহীদ পিছন পিছন গেল। যাবার সময় বললো, 'সরোদটা আমাদের শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিস কামাল।'

ধানমণ্ডিতে বিরাট দোতলা বাড়ি ড. রহমানের। বাড়িটা সম্ভবতঃ তার ভাই শিল্পপতি মরহুম হাফিজুর রহমানের। প্রশস্ত গেটটা খোলা। গেটের পাশে দাঁড়ানো কনস্টেবল

কামালকে চেনে। সে খটাশ করে সালাম ঠুকলো একটা। গাড়িটা বাইরেই রাস্তার পাশে পার্ক করে ভিতরে ঢুকলো কামাল।

সাইদুল হক অপেক্ষা করছিল বারান্দায়। কামালকে দেখে ছুটে এলো। বললো, 'আসুন মি. কামাল। মি. সিম্পসন আর মি. জামান আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন মামার ঘরে।'

সাইদুল হকের পিছন পিছন এগিয়ে গেল কামাল। ড্রইংরুমের পর আরও দু'টো কামরা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলো ওরা। জামান আর সিম্পসন দু'টো চেয়ারে গুম মেরে বসে আছেন।

বিছানায় শায়িত ড. রহমানের কপালটা জুড়ে বিরাট এক ব্যাণ্ডেজ। চোখ দু'টো বন্ধ। ডান হাতের সামনের অর্ধেকটা ব্যাণ্ডেজে আবৃত। ডান হাতের তালুতে তখন ডাক্তার আরও একটা ব্যাণ্ডেজ করছিলেন মাথা নিচু করে। দশাশই জোয়ান ডাক্তার। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ডাক্তারের সহকারীর মাথায় একটা বিদঘুটে টুপি।

কামালের জুতোর শব্দে ডাক্তার মুখ তুলে তাকালেন, আবার নিচু হয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে বসলেন। ঘরে ডেটলের গন্ধ।

কামাল ড. রহমানকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল।

লম্বাটে যন্ত্রণাকাতর মুখ। পরনে সিল্কের স্লিপিং গাউন। পেশীবহুল মজবুত চেহারা। একটা টিপয়ের উপর রাখা রক্ত আর ময়লা মুছে ফেলা তুলোর বিরাট স্তূপ।

উঃ! আর্তনাদ করে পাশ ফিরে শুলেন ড. রহমান।

'ঘটনাটা কি ঘটেছিল, মি. সিম্পসন?' প্রশ্ন করলো কামাল ফিসফিস করে।

'রাতে কে বা কারা ড. রহমানের ঘরে ঢুকে মিস রুবিনার বিয়ের অলঙ্কার চুরি করেছে। ড. রহমান টের পেয়ে বাধা দিতে যেতেই তাঁকে মারপিট করেছে প্রচণ্ডভাবে।'

জামান ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল।

সুসজ্জিত কক্ষ। দরজা বরাবর একটা আয়রন সেফ খোলা দেখা যাচ্ছে। মেঝেতে দামী কার্পেট।

দেয়ালে একটা বিরাট আকারের ফটো। স্পষ্টই বোঝা যায় ড. রহমানের যৌবন কালের ছবি। বুদ্ধিদীপ্ত। মুখে মৃদু হাসি। চোখ দু'টো উজ্জ্বল। আকর্ষণীয় চেহারা। অনেকক্ষণ ফটোর দিকে চেয়ে রইলো জামান। ডাক্তারের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার সহকারী যন্ত্রপাতি গুটিয়ে ব্যাগে ভরলেন।

মাথা তুলে কাকে যেন খুঁজছিলেন ডাক্তার।

'কিছু বলছেন?' সাইদুল জিজ্ঞেস করলো।

'হাত ধুতে হবে। বাথরুমটা?' ভারি গলায় আওয়াজ ভেসে এলো।

'ওঃ, এই যে, এইদিকে যান।'

ডাক্তার বাথরুমে ঢুকলেন।

জামান বললো, 'ড. রহমানকে এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না।'

'হ্যাঁ, চলুন ড্রইংরুমে বসা যাক। ন'টা বাজলো বলে। কাল রাতে যাঁরা হত্যা-কাণ্ডের সময় মিস রহমানের কাছে ছিলেন তাঁদের জবানবন্দী নিতে হবে।'

'ওরা বোধহয় এসে গেছেন,' কামাল বললো।

'চলুন।' ওরা বেরিয়ে এলো। সাইদুল হকও ওদের সাথে সাথে বেরিয়ে এলো।

ড্রইংরুমে এসে বসলো সবাই।

সিম্পসন কামালকে বললেন, 'সকালে ড. রহমানের চাকর সুজাউল্লাহ এসে ড. রহমানকে কার্পেটের উপর পড়ে থাকতে দেখতে পেয়ে আমাকে আর জামানকে খবর দেয়। তোমাকে এখানে এসে টেলিফোন করেছি। ইতিমধ্যে জামান প্রয়োজনীয় তদন্ত সেরে ফেলেছে। শুধু ড. রহমানের কাছ থেকে দু-একটা খবর জানবার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

ভিতরে করিডর থেকে ভারি জুতোর আওয়াজ ভেসে এলো। পর্দা তুলে ভিতরে ঢুকলেন ডাক্তার। পিছনে তাঁর সহকারীর দু'হাতে দু'টো ব্যাগ। মাথায় সেই বিদঘুটে টুপি।

ডাক্তারের বপুটা বিরাট। মুখটা গম্ভীর। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটেন।

সিম্পসন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলেন ডাক্তার সাহেব?'

সেই ভারি কণ্ঠটা আবার কানে এলো।

'ভয়ের কিছু নেই। সামান্য আঘাত। দু-চারদিনের মধ্যেই সেরে যাবে।' বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার সাহেব। মিনিট দু'য়েক পরেই গাড়ির গর্জন শোনা গেল।

একজন পুলিস এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো।

'জামান সাবকা চিট্‌ঠি হ্যায়।'

'আমার চিঠি?' হাত বাড়িয়ে দিলো জামান। পুলিস চিঠিটা জামানের হাতে দিয়ে সিম্পসন সাহেবকে বললো, 'মেমসাহেব লোগ আগায়া স্যব।'

চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলো জামান।

'প্রিয় জামান,

যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তা আংশিকভাবে পূরণ হয়েছে। আবার আসবো এখানে। দেখা হবে।'

কুয়াশা।

 www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

জামানের বিস্ফারিত চোখের দিকে চেয়ে সিম্পসন জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার জামান?' চিঠিটা বাড়িয়ে দিলো জামান। সিম্পসন পড়লেন।

'আমাদের আবার বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল কুয়াশা। এই প্রকাশ্য দিবালোকে।'

কি উদ্দেশ্যে কুয়াশা এখানে এসেছিল তাই ভাবছিল জামান। কুয়াশা নিশ্চয়ই গতরাতের আগন্তুক নয়। কারণ রাতে কুয়াশা এসে থাকলে অবশ্যই তার উদ্দেশ্য পূরণ করে যেতো।

সিম্পসনও বোধহয় তাই ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎ মুখ খুললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটাই খুব ঝাপসা লাগছে।'

কামাল হাসলো। বললো, 'বলুন কুয়াশাচ্ছন্ন লাগছে।' সিম্পসনও হেসে উঠে ড্রইংরুমের বাইরে চলে গেলেন। মিনিট খানেক পরে ফিরে এসে বললেন, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই, জামান। জবানবন্দী সেরে ফেলা যাক এই বেলা। আমি ওদের আসতে বলেছি একে একে।'

সাত

খুট খুট করে পায়ের শব্দ হলো বাইরে থেকে। পর্দা তুলে এক মহিলা প্রবেশ করলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়েস হবে। গোল ভাঁটার মতো চোখ দু'টোতে একগাদা কাজল লেপ্টানো। খর্বকায়। স্ফীত দেহ দরজার প্রায় সবটা জুড়ে প্রবেশ করলেন তিনি। হাঁড়ির মতো মুখে কর্তৃত্বের চিহ্ন সুস্পষ্ট। রাজ্যের বিরক্তি মুখে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। এইটুকু হেঁটে এসেই হাঁপাচ্ছিলেন মহিলা।

জামান, কামাল ও সিম্পসন উঠে দাঁড়ালো। ওদের দিকে দৃকপাত না করে বসে পড়লেন মহিলা। বাজখাই গলায় বললেন, 'বিয়ে খাওয়ার নিকুচি করি। আগে জানলে এ বিয়েতে যেতামই না। কি হেনস্তা এখন!'

সিম্পসন বললেন, 'তা আর বলতে। কিন্তু বিপদ হলো খুনের কথা কেউ আগে থাকতে জানিয়ে দেয় না। কিছু মনে করবেন না মিসেস। আই মিন···। যদি দয়া করে···'

'মিসেস ফকরুন্নেসা কবীর। আমার স্বামী মি. এরফান কবীর ন্যাশনাল এসেম্বলীর মেম্বার। বাসা এই ধানমণ্ডিতেই। রুবিনাকে চিনি বছর পাঁচেক হলো। সে লেখাপড়া শিখে বিলেত থেকে আসবার পরেই। আমার মেয়ের বান্ধবী। ড. রহমানকে চিনি তা মাস ছ'য়েক হবে। এর আগে উনি কন্টিনেন্টে ছিলেন বছর পনেরো। এখন উনিই রুবিনার বাবার ইণ্ডাস্ট্রির ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

ঘন্টায় একশো মাইল বেগে ঝড়টা থেমে গেল। দম নিলেন মিসেস কবীর।

'আরও শুনবেন?' গলায় স্পষ্ট ঝাঁজ। 'রুবিনার বয়েস হবে পঁচিশ। প্রেম করে বিয়ে করতে যাচ্ছিলো। কাল বিয়ের আসরে হঠাৎ বাতি নিভে গেল। তারপর গুলির আওয়াজ হলো। প্রথমে ভেবেছিলাম বাজির শব্দ। কিন্তু তীক্ষ্ণ চিৎকার করে রুবি পড়ে গেল। আমি ওর পাশেই ছিলাম কিনা। ওকে ধরতে গিয়ে গরম ভেজা কি আমার হাতে লাগলো। ভয় পেয়ে গেলাম, বাতির জন্যে চিৎকার শুরু করলাম। তারপর বাতি জ্বলে উঠতেই দেখি রুবির মাথা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। কিছুক্ষণ ছটফট করে মারা গেল।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করলেন মিসেস কবীর। শেষের দিকে তার গলার ঝাঁজটা কমে এসেছিল। হাঁপাতে লাগলেন তিনি।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলেন। আবার শোনা গেল তার বাজখাঁই কণ্ঠ, 'আরও কিছু জানবার আছে?'

সিম্পসন মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন।

দ্রুত কামাল বললো, 'মোটেও না। আপনি আসতে পারেন অনায়াসে। আচ্ছা আদাব। অসংখ্য ধন্যবাদ, ম্যাডাম কবীর।'

বিরাট বপুটা সোফা থেকে কোনও ক্রমে টেনে তুলে বিরক্তি ভরা মুখটা ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেলেন মহিলা।

'বাপ্‌স্। বাঁচা গেল। আরেকটু হলে আমি হার্টফেল করতাম। এখনও বুকের মধ্যে ধুকপুক করছে।'

সিম্পসন আর জামান হাসলো।

সাদিয়া খোরাসানী এলেন। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস। হালকা দীঘল দেহ। অস্বাভাবিক ফর্সা রঙ। অনেকটা সাবানের ফেনার মতো। গাঢ় লাল রঙ-এর লিপস্টিক-চর্চিত অধর। বব করা লালচে চুলে অভিজাত সোসাইটির সর্বশেষ হেয়ার-ডু। নেটের মতো কাপড়ের বগলকাটা এক ধরনের কামিজ যুবতীর দেহের সাথে সাঁটা। হালকা নীল রঙ। তার ওপর ওড়না ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো করে রাখা। অস্বাভাবিক ফর্সা রঙ-এর গালে আবছা লালের আভাস। গলায় সরু চেন। মুখটা শুকনো, বোধহয় একটু আতঙ্ক মাখাও।

ছোট্ট আদাব করে বললো, 'বলুন কি বলতে হবে? আমি কিন্তু ভালো বাংলা বলতে পারি না।' মিষ্টি গলার আওয়াজ রিমঝিম করে উঠলো।

সিম্পসন বললেন, 'তাতে কিছু অসুবিধে নেই। বসুন আপনি।'

জামান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিস খোরাসানীকে লক্ষ্য করছিল। সে দৃষ্টির কাছে মহিলা একটু সঙ্কুচিত হলেন বোধহয়। জামান চোখ সরিয়ে নিলো।

সিম্পসন বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, মিস খোরাসানী। নিতান্ত বাধ্য হয়েই আপনাকে বিরক্ত করছি। আমরা···।'

সাদিয়া তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মি. সিম্পসন, I understand this is your duty, and this is also my duty to help you find the murderers of my friend। রুবী ছিলো আমার সবচে' ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। কি ব্যথা যে পেয়েছি তার মৃত্যুতে! বিশেষ করে এমন অস্বাভাবিক আর করুণ মৃত্যুতে।'

সাদিয়ার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। মাথা নিচু করে বোধহয় চোখের কোণ মুছলো আলগোছে।

সিম্পসন বললেন, 'মোটামুটি তথ্য আমরা পেয়েছি। শুধু দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।'

'বলুন।'

'মিস রুবীকে যে ঘরে সাজানো হচ্ছিলো খুনের সময় সে ঘরে আপনারা ক জন ছিলেন?'

'তিন-চারজন।'

'কোনও পুরুষ ছিলো কি?'

'না। কোনও পুরুষ ছিলো না।'

'কিন্তু অনেক মহিলাই তো বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেরই তো থাকবার কথা মিস রুবীর সাথে?'

'তা ঠিক। ছিলও অনেকে। কম করেও জনা পঁচিশেক। কিন্তু বাতি নেভবার মিনিট খানেক আগে বর এসে পৌছেছিল। সবাই বর দেখতে ছুটেছিল। ফলে সেখানে তখন ছিলাম মাত্র আমরা ক'জন।'

'গুলির শব্দ শুনে আপনার কি ধারণা হয়েছিল?'

'প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি। কারণ আশেপাশে অসংখ্য বাজি ফুটছিল। কিন্তু ঘরের মধ্যে হঠাৎ আর্তনাদ শুনলাম আমার পাশেই। রুবীর আর্তনাদ। তখন আমি ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু কিছু বুঝিনি। আলো জ্বলে ওঠবার সাথে সাথে দেখলাম···।'

এবারে প্রশ্ন করলো জামান।

'আচ্ছা, মিস রুবীকে আপনি কতদিন যাবত জানেন, মিস খোরাসানী?'

'ছোটবেলা থেকেই। রুবীর মতো আমিও শৈশবে মাতৃহারা। তখন থেকেই বিলেতে দু'জন এক সাথে পড়াশোনা করেছি।'

'তার সম্পর্কে আর কিছু জানেন? মানে—তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে? অবশ্যি যদি আপত্তি না থাকে।'

কিছুক্ষণ নীরব রইলো সাদিয়া। নখ খুঁটলো চুপ করে।

'দেখুন মি…'

'জামান। আসাদুজ্জামান।'

একটু ইতস্ততঃ করলো সাদিয়া, তারপর বললো, 'এটা হচ্ছিলো রুবীর সেকেণ্ড ম্যারেজ। এর আগে রুবী বিয়ে করেছিল বিলেতে। স্বামীর বাড়ি ঢাকাতেই। বিয়ের পর ভদ্রলোক আমেরিকা যান কয়েকমাসের জন্যে। আর রুবী দেশে ফিরে আসে। ওর স্বামী আমেরিকা থেকে সোজা চলে আসেন ঢাকায়। কিছুদিন পরে দু'জনের মধ্যে মনো-মালিন্য দেখা দেয়।'

'কারণটা বলতে পারেন কিছু?'

'রুবী বলেছিল ভদ্রলোক নাকি কি এক রকম নেশা করেন।'

'নামটা হচ্ছে, মারিজুয়ানা,' জামান বললো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ম্যারিজুয়ানা।'

সিম্পসন আর কামাল অবাক হয়ে জামানের মুখের দিকে তাকালো। জামানের মুখটা নির্বিকার।

'তারপর?' জামান প্রশ্ন করলো।

'রুবী ব্যাপারটা খুব অপছন্দ করতো। দু'জনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি হতো। শেষটায় রুবী তালাক দিলো ভদ্রলোককে বছর খানেক আগে।'

'ভদ্রলোকের নামটা জানা আছে আপনার?'

'ওর নাম হচ্ছে আজিজুল করিম। নিজের ব্যবসা আছে এক্সপোর্ট ইমপোর্টের। মতিঝিলে অফিস।'

'তালাকের পর ভদ্রলোকের কি রি-অ্যাকশন হয়েছিল বলতে পারেন?'

'উনি খুব শাসিয়েছিলেন রুবীকে। আর প্রায়ই টেলিফোনে হুমকি দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য কি জানেন, রুবীর সামনাসামনি হলে লোকটা যেন কেঁচো হয়ে যেতেন। কাকুতি-মিনতি করতেন। মাঝে মাঝে ক্লাবে রুবীর কাছেপিঠে ঘুরঘুর করতেন নির্লজ্জের মতো। রুবী বিরক্ত হতো। এইতো কালও…'

'আরও একটা প্রশ্ন করবো, মিস খোরাসানী?'

'বলুন।'

'মিস রহমানকে বিয়ের জন্যে আর কোনও ক্যাণ্ডিডেট ছিলো কি?'

সাদিয়া একটু লজ্জিত হলো যেন। মাথা নিচু করে বললো, 'অনেক।'

জামান সিম্পসনকে বললো, 'আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই। ইচ্ছে করলে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।'

সিম্পসন বললেন, 'আচ্ছা মিস খোরাসানী, ড. রহমানকে আপনার কেমন মনে হয়?'

'গম্ভীর রাশভারি লোক। তবে…'

'তবে কি বলুন…'

'মেয়েদের সাথে আচরণে যথেষ্ট ভব্য নন।' লাল হয়ে গেল সাদিয়ার মুখমণ্ডল।

সিম্পসন বললেন, 'শুনেছি ভদ্রলোক নামকরা বৈজ্ঞানিক। সম্প্রতি বিদেশ থেকে এসেছেন।'

'জ্বি। আংকল রহমান অর্থাৎ রুবীর বাবার ইন্তেকালের মাসখানেক আগে উনি কন্টিনেন্ট থেকে ফিরে আসেন।'

'উনি কি বিবাহিত নন?'

'জ্বি না। এখনও বিয়ে করেননি উনি।'

'আচ্ছা, মিস খোরাসানী, রুবীর হত্যার ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?'

সাদিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'না। কাউকেই তো সন্দেহ করতে পারছিনে আমি।'

'আচ্ছা, মিস খোরাসানী, অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে। তবে যে তথ্য আপনি দিলেন তাতে আমাদের তদন্তের অনেক সুবিধে হবে।'

এরপর মিসেস জাহেদা করিম আর হামিদ জালালকে জেরা করা হলো। কিন্তু তারা বিশেষ কিছু নতুন তথ্য দিতে পারলেন না। কিন্তু সাইদুল হক যোগ করলো এক বিস্ময়কর তথ্য। সে বললো, 'কাল সন্ধ্যায় সে ইস্কাটন ক্লাবের সামনের রাস্তার উল্টোদিক দিয়ে পায়চারি করতে দেখেছে আজিজুল করিমকে। ওর দৃষ্টি ছিলো ক্লাবের দিকে।'

'ঠিক ক'টার সময় বলতে পারেন?' জামান জিজ্ঞেস করলো দেশলাইয়ের উপর সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে।

'সাড়ে সাতটার দিকে।'

'আচ্ছা। মিস রুবীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কাউকে সন্দেহ হয়?' সাইদের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকালো জামান।

সাইদ বললো, 'না। তেমন একটা সন্দেহ কাউকে হয় না।'

'কোনও কারণ অনুমান করতে পারেন?'

সাইদ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, 'না, তাও না।'

'আচ্ছা মি. সাইদ। কাল রাতে ড. রহমানের ঘর থেকে কোনও অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন কি?'

'জ্বি না। কোনও শব্দই কানে আসেনি আমার।'

'রাত দু'টো পর্যন্ত কি আপনি জেগে ছিলেন?'

'প্রায় সারারাতই জেগে ছিলাম। কিন্তু তেমন অস্বাভাবিক কোনও শব্দ কানে আসেনি আমার।'

আট

সাইদকে বিদায় দিয়ে জামান বললো, 'চলুন মি. সিম্পসন, বাড়ির চারদিকটা একটু ভালো করে দেখে আসি।'

কামাল এতক্ষণ চুপচাপ ছিলো। বললো, 'উত্তম প্রস্তাব।'

তিনজন ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির পিছন দিকে চললো। দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটছিল ওরা। হঠাৎ জামানের চোখে পড়লো ভেজা মাটির উপর একজোড়া জুতোর ছাপ। জামান ইঙ্গিতে ওদের ছাপগুলো দেখালো। জুতোর ছাপ অনুসরণ করে এগোলো জামান।

দালানের পিছন দিকে একটা দরজা পর্যন্ত এসে ছাপটা মিলিয়ে গেছে। দরজাটা ধাক্কা দিলো জামান। ভিতর থেকে বন্ধ। মাটির দিকে লক্ষ্য রেখেই আবার ফিরে এলো জামান। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেয়ালটা পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কি যেন খুঁজলো সে।

একটা চাকর এসে দাঁড়ালো। সিম্পসন মুখ ফেরাতেই চাকরটা বললো, 'বড় সাহেব আপনাদের সালাম দিয়েছেন।'

সিম্পসন বললেন, 'চলো, জামান। ড. রহমান ডেকে পাঠিয়েছেন।' ওরা এসে তাঁর কামরায় বসলো। ক্লান্ত ভাঙা গলায় ড. রহমান বললেন, 'আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি, মি. সিম্পসন। মেয়েটার খুনের কিনারা করতে পারলেন কিছু?' কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো ড. রহমানের। দেয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকালেন ড. রহমান।

সিম্পসন জবাব দিলেন, 'জ্বি না, তদন্তের এই তো সবে শুরু। তবে পারবো অবশ্যই।'

'অবশ্যই। আশা করি পারবেন। আর পারতে আমাদের হবেও। আমাদের বংশের একমাত্র দুলালীকে যারা হত্যা করেছে তাদের শাস্তি দিতেই হবে।'

উঠে দাঁড়ালো জামান। বললো, 'যদি কিছু মনে না করেন, ড. রহমান। আপনার

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

ঘরটা একটু ভালো করে দেখতে চাই।'

'আর দেখে কি হবে বলুন?' শুকনো গলায় বললেন ড. রহমান।

'তবুও দেখা ভালো,' সিম্পসন বলেন।

'তা দেখুন প্রয়োজন বোধ করলে।'

কামাল আর সিম্পসন খাটের তলা, ওয়ারড্রোব, আয়রন সেফের পিছনটা উঁকি মেরে দেখলো।

জামান বললো আমি বাথরুমটা দেখে আসি।

জামান বাথরুমের ভিতর ঢুকলো। ফিরে এসে বললো, 'না, কিছু পাওয়া গেল না।'

সিম্পসন আবার বসলেন। বললেন, 'ড. রহমান...ইয়ে...মানে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবার ছিলো।'

'বলুন।'

'কাল যখন মিস রুবিনা খুন হলেন তার আগে বা পরে তার সাবেক স্বামী আজিজুল করিমকে ইস্কাটন ক্লাব বা তার কাছেপিঠে দেখা গিয়েছিল কি?'

ড. রহমান একটু চিন্তা করে বললেন, 'সন্ধ্যার দিকে আমি একবার তাকে দেখেছিলাম বটে ক্লাবের সামনে। তাছাড়া...।' চুপ করলেন ড. রহমান।

'তাছাড়া কি বলুন, ড. রহমান?'

'রুবী খুন হবার অল্প-কিছু আগে একটা লোকের পিছনের দিকটা আর চলার ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল লোকটা করিম হতে পারে। তবে ব্যস্ততার মধ্যে ঠিক খেয়াল করতে পারিনি। আর করিমের বিয়েতে উপস্থিত হবার কথাও কল্পনাতীত ছিলো, তাই না?'

'আচ্ছা ঠিক কোন্ জায়গায় দেখেছিলেন বলতে পারেন?'

'ভিতরের করিডরে।'

'হত্যাকাণ্ডের মুহূর্তে আপনি কোথায় ছিলেন?'

ড. রহমান বললেন, 'আমি তখন গেটের দিকে যাচ্ছিলাম। বর এসে পৌঁছেছিল। তাদের রিসিভ করতে এগোচ্ছিলাম।'

'কাল রাতে আপনাকে ওরা অ্যাটাক্ করেছিল ক'টার সময় কিছু বলতে পারেন?'

'রাত দু'টোর দিকে হবে। রাত একটার দিকে শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম হচ্ছিলো না। রুবীর কথা মনে হচ্ছিলো বারবার। কখন যেন তন্দ্রা মতো এসেছিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে বসতেই কে যেন পিছন থেকে জাপটে ধরলো। লোকটার গায়ে অসুরের মতো শক্তি। আমার এই যে ব্যায়াম করে গড়ে তোলা স্বাস্থ্য, তবুও তার কাছে হিমসিম খেয়ে গেলাম। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে

ঘুসি মারবার চেষ্টা করতেই লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ডানহাতে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলো।'

ব্যাণ্ডেজটা দেখালেন তিনি। 'তারপর আঘাত করলো মাথায়। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। পরের কথা আমার আর কিছু মনে নেই।'

'ক'জন এসেছিল বলে মনে হয়?'

দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন ড. রহমান। তার ঠোঁট দু'টো নড়ে উঠলো, 'আমি একজনকেই দেখেছি। কালো মুখোশের ভিতর দিয়ে চোখ দু'টো ভাঁটার মতো জ্বলছিল।'

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে হাঁপাতে শুরু করলেন ড. রহমান। চোখ দু'টো বুজে এলো ড. রহমানের। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সিম্পসন ইশারা করলেন কামালকে। সবাই বেরিয়ে এলো।

এক সপ্তাহ পর ইস্কাটন ক্লাবে সন্ধ্যা নেমেছে।

ফ্লোরোসেন্ট টিউবের আলো বিরাট লনের যে কোণটির অন্ধকার ঘোচাতে পারেনি সেখানটায় একটা চেয়ারে বসে ছিলো সাইদুল হক। সামনে একটা কান্টার শূন্যপ্রায় বোতল। অদূরে আরও অনেক মেয়ে পুরুষ বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে আড্ডা মারছে। কেউ তাস খেলছে। সিগারেট জ্বলছে জোনাকীর মতো। টুকরো টুকরো কথা, হাসির খিল খিল শব্দ সাইদুল হকের কানে আসছিল। রাত তখন দশটা। চারদিকে অসহ্য গরম। শ্রাবণের আকাশে জমাটবাঁধা মেঘের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো সে। মাত্র সাতদিনেই রুবীকে সবাই ভুলে গেছে। অথচ ক'দিন আগেও সে ছিলো এই ক্লাবের প্রাণ। কিন্তু সাইদুল হক তাকে ভুলতে পারছে কই। রুবীকে যেন এখন আরও অনেক বেশি করে মনে পড়ছে তার।

কে যেন পাশে এসে দাঁড়ালো। সাইদ টের পেলো না।

'সাইদ।' মমতাভরা একটা গলা কানে এলো।

'কে?' মাথা নামালো সাইদ।

সাদিয়া খোরাসানী ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'সাদিয়া? বোস।' চেয়ার দেখিয়ে দিলো সাইদ। মিস খোরাসানী বসলো।

অনেকক্ষণ চুপচাপ রইলো দু'জন। কেউ কোনও কথা বলছে না। অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো দু'জনে।

'বড্ড কষ্ট হচ্ছে, সাইদ?'

মলিন হাসি হাসলো সাইদ। অন্ধকারে সে হাসি দেখা গেল না। কিন্তু গলা শোনা গেল, 'সব কষ্টই একদিন দূর হয়ে যায়, সাদিয়া। তবে সময় লাগে এই যা।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো সাইদ।

আবার বললো, 'তুমিতো জানো। বোন বলতে ভাই বলতে এমন কি মা বলতে একমাত্র রুবীই ছিলো আমার। পৃথিবীতে বলতে গেলে রুবীই ছিলো আমার একমাত্র আত্মীয়া। অথচ তার জীবনের কি ভয়ংকর পরিসমাপ্তি। কিন্তু কারো কোনও ক্ষতি করেনি রুবী। করতে চায়নি। তবুও কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।'

সাদিয়া হাত বাড়িয়ে সাইদের একটা হাত টেনে নিলো। গভীর মমতায় চাপ দিয়ে বললো, 'মি. জামানের উপর বিশ্বাস রেখো। অসাধারণ প্রতিভা ভদ্রলোকের। আততায়ীকে ঠিক ধরে ফেলবেন তিনি।'

ক্লিষ্ট হাসি শোনা গেল সাইদের কণ্ঠে।

'কে জানে? লিলিরই কোনও খোঁজ করতে পারলেন না অ্যাদ্দিনে! কে জানে ওকেও হয়তো রুবীর মতো খুন করেছে।'

শিউরে উঠলো সাদিয়া। আস্তে আস্তে বললো সাইদ আবার, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনে রুবিনার উপর এই দুর্বৃত্তের এতো আক্রোশ কেন? রুবী তো টাকা পয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করে না। টাকা পয়সা তো মামার কাছে।'

'ওসব কথা ভুলে যাও, সাইদ।'

বাঁ হাতের উপর সাইদের হাতটা রেখে ডান হাত দিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছিলো সাদিয়া। অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বললো না। আলোর দিকে মুখ করে বসেছিল সাদিয়া।

সাইদ হাত টেনে নিতে যাচ্ছিলো। সাদিয়া হাতটা আরও জোরে চেপে ধরলো। ওর হাতটা তখন থর থর করে কাঁপছে। সাইদ অবাক চোখে দেখলো, সাদিয়ার আয়ত চোখের দৃষ্টি সাইদের চোখে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি নত করলো সাদিয়া। বিহ্বল হলো সাইদ। সাদিয়া সাইদের হাতটা তখন আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছে।

সামনে প্রাচীরের উপর থেকে একটি মূর্তি সরে গেল নিঃশব্দে। প্রেমবিহ্বল দুই যুবক-যুবতীর দৃষ্টি তখন পরস্পরকে নতুন করে আবিষ্কারের নেশায় মগ্ন। নিয়নের আবছা আলোয় সাদিয়ার লজ্জারক্তিম মুখটা স্পষ্ট না হলেও তারা 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব' করছিল ক্লাবের অস্পষ্ট অন্ধকারে।

বেশ কিছুক্ষণ পর। সাইদ সিগারেট কেসটা খুলে সাদিয়ার সামনে ধরলো।

'নাও।'

সিগারেট কেস দেখে মাথা নোয়ালো সাদিয়া।

'নাও, লজ্জার কি আছে?'

'তুমি ধরিয়ে দাও।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

শফি একটা চিঠি পড়ছিল। ক্ষুদ্র চিঠিটা যেন সারা গায়ে ওর আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পড়া শেষ করে ক্রোধে ওর চোখ মুখ লাল হয়ে গেল।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। চিঠিটা পকেটে পুরে নিয়ে দরজা খুললো। বাইরে দাঁড়িয়ে জামান।

'আয়, ভিতরে আয়,' সংবর্ধনা জানালো শফি।

জামান ঢুকলো। ক্লান্ত ভঙ্গি। চোখমুখ শুকনো। একটা চেয়ার টেনে বসলো। সিগারেট ধরিয়ে গা এলিয়ে দিলো চেয়ারে। চোখ বুজে কি যেন চিন্তা করতে লাগলো।

শফিও একটা চেয়ার টেনে বসলো। নিঃশব্দে কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল। কেউই কোনো কথা বলছে না। অস্বস্তিকর নীরবতায় হাঁপিয়ে উঠলো শফি। কিই বা বলবে? আলোচনার বিষয় তো মাত্র একটাই হতে পারে। কিন্তু সেতো উভয়ের পক্ষেই নাজুক। জামান তো ধরেই নিয়েছে যে কুয়াশাই লিলিকে চুরি করে নিয়ে গেছে। এ যে কতবড় মিথ্যে আর কেউ তা না জানলেও শফি তা জানে। কিন্তু জামান তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। কুয়াশা লিলির মাকে চুরি করেছিল, আর কুয়াশার পদ্ধতিতেই লিলিকে চুরি করা হয়েছে। কাকতালীয় এই যুক্তির কাছে জামান আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। জামান মূর্খ নয়। তবুও আবেগের প্রাবল্যে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত শফিই মুখ খুললো। জিজ্ঞেস করলো, 'লিলির কোনো খোঁজ পেলি, জামান?'

'এখন পর্যন্ত না। তবে একটা ভুল শুধরেছি এতদিনে। কুয়াশা কিডন্যাপ করেনি লিলিকে।'

শফির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বললো, 'কি করে বুঝলি তুই?'

'কয়েকটা কারণে। প্রথমতঃ, তোর সাথে লিলির বিয়ের সম্ভাবনার কথা মনে কর। তোকে কুয়াশা যতটা ভালবাসে সে অবস্থায় কুয়াশা আর যাই করুক তোর বাগদত্তাকে চুরি করবে না। দ্বিতীয়তঃ, কুয়াশা শুধুমাত্র একজনকে চুরি করে ক্ষান্ত হবে না। করলে লিলির বয়সের অনেককে চুরি করবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত লিলির সমবয়েসী আর কেউ কিডন্যাপ হয়নি। তারপর মিস রুবিনা রহমানের হত্যাকাণ্ডের কথাই ধর। কুয়াশা যদি সত্যি লিলিকে হত্যা করতো তাহলে তার অপরাধবোধই তাকে শহীদ খানের বাসায় যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতো। অন্ততঃ অপরাধতত্ত্বে এই কথাই বলা হয়েছে। তবে মান্টা-সোনিয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারছিনে। ঐখানেই কনফিউশন

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

রয়েছে।'

'কিন্তু এতো নেগেটিভ সাইড। কে কিডন্যাপ করলো তার হদিস পেলি কিছু?' শফি প্রশ্ন করলো। জামান ঘাড় নেড়ে বললো, 'বেশ কিছুটা।'

শফি একটু ইতস্ততঃ করে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করলো। জামানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'পড়।'

জামান চিঠিটা নিয়ে পড়লো।

শফি,

এখনও তোমার শিক্ষা হলো না। যদি লিলির প্রাণ বাঁচাতে চাও তাহলে কুয়াশার থিসিসের যে অংশটা তোমার কাছে আছে সেটা এবার দিয়ে দাও। আমার লোক আজকে তোমার বাড়িতে যাবে রাত ঠিক একটায়। এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। যদি অন্যথা হয় আর যদি কুয়াশাকে দিয়ে গোলযোগ পাকাবার ব্যবস্থা করো তাহলে লিলিকে খুন করে ফেলা হবে। এরপরে আর কোনও সুযোগ দেয়া হবে না।

নুরবক্স।

এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফেললো জামান। কি যেন ভাবলো অনেকক্ষণ ধরে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'বলতে পারিস কে নুরবক্স?'

শফি বললো, 'এই নুরবক্স এক সময় ছিলো কুয়াশার ঘনিষ্ঠ সহচর। তোরা যখন মাস্কস্টোরে হানা দিস তার কিছুক্ষণ পরই লোকটা কুয়াশার থিসিসের একটা অংশ চুরি করে গায়েব হয়ে যায়। সে আগে থেকেই একটা পাকা ক্রিমিন্যাল ছিলো। পুলিস রেকর্ডে ওর নাম আছে। কিভাবে কুয়াশার সুনজরে পড়েছিল জানি না। আল্ট্রা-সোনিক্সের যন্ত্রটা সে কুয়াশার সান্নিধ্যে এসেই আয়ত্তে এনেছে।

'কিন্তু একটা সামান্য ডাকাত কুয়াশার থিসিস নিয়ে কি করবে?' জামান জিজ্ঞেস করলো।

'দুনিয়ার সব দেশের অপরাধীদের মধ্যে আছে ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান। অনেক সময় ওরা একটা দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার চুরি করে অন্য দেশে বিক্রি করে দেয়। হয়তো তেমনি কোনও মতলব আছে ওর। তবে অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে।'

জামান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, 'এই কি তোর কাছে লেখা নুরবক্সের প্রথম চিঠি?'

'না। আরও চিঠি আছে। প্রথমদিন থেকেই আমি জানতাম কে লিলিকে কিডন্যাপ করেছে, আর কেন করেছে। কারণ নুরবক্স বহুদিন ধরেই আমাকে শাসাচ্ছিল। বুঝতেই পারছিস আমাকে জব্দ করার জন্যে লিলিকে চুরি করা হয়েছে।'

www.facebook.com/groups/BoiLoversppJapan

'কিন্তু সে কথা আমাকে এতদিন কেন বলিসনি?' বিরক্ত হয়ে বললো জামান।

'বলিনি, কারণ তোদের কুয়াশা–ম্যানিয়ায় পেয়ে বসেছিল। কিন্তু তাই বলে তো আমি বসে নেই। নুরবক্সকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'তা তুই কি করলি চিঠির ব্যাপারে?' অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলো জামান।

'তার মানে?'

'নুরবক্সের এজেন্ট আজ রাতে আসবে তোর কাছে। তুই কি থিসিসটা দিয়ে দিবি?'

'তুই কি বলিস?'

'দিয়ে দে থিসিসটা।'

শফি অবাক হয়ে জামানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। শফির চোখের দিকে চেয়ে কি একটা ইঙ্গিত করলো জামান। তারপর বেশ উঁচু গলায় বললো, 'দিয়ে দে নুরবক্সকে কুয়াশার থিসিসটা। ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার কথাটা রাখ। তোকে মিনতি করছি।' জামান উঠে গিয়ে শফির হাতটা ধরে চাপ দিলো। 'লিলিকে বাঁচা তুই। ওসব উদ্ভট জিনিস দিয়ে তোর, আমার দরকারই বা কি?' ওর গলায় আকুতি ঝরে পড়লো।

শফি ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে সায় দিলো, 'ঠিক আছে, তুই যখন অতো করে বলছিস, তখন তাই হবে।' কেমন ঠাণ্ডা শোনালো ওর গলা।

বিদায় নিয়ে জামান চলে গেল। একটা লোক অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওর সামনে দিয়ে। সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠলো জামানের ঠোঁটের কোণে।

হাঁটতে হাঁটতে আজিমপুর কলোনীর বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো জামান। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে দেখলো। না, কেউ ওকে অনুসরণ করছে না। নিউ মার্কেটগামী একটা বাসে চেপে বসলো জামান। পরের স্টপেজেই নেমে পড়লো। চলন্ত একটা স্কুটার থামিয়ে উঠে পড়লো তাতে।

রাত সাড়ে বারোটা বাজে। কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার রাত। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মোড়ে লাইটপোস্টের নিচে একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে। হুডতোলা রিক্সাটার মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে সিগারেট টানছে রিক্সাওয়ালা। পথ নির্জন। মাঝে মাঝে দু'একটা মোটর গাড়ি বা স্কুটার নির্জনতা ভঙ্গ করে চলে যাচ্ছে। রিক্সাওয়ালা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে গাড়িগুলো। লুঙ্গি আর ময়লা শার্ট গায়ে একজন সামনের দিক থেকে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছিল।

রিক্সাওয়ালা তার দিকে চেয়েছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। লোকটা এসে দাঁড়ালো রিক্সার পাশে।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

'ওরা এসে গেছে?' প্রশ্ন করলো রিক্সাওয়ালা। তার গলায় উত্তেজনার আভাস।

'হ্যাঁ, মি. জামান।' লোকটা অর্থাৎ কামাল চাপাস্বরে বললো। 'এসে গেছে ওরা ওই দিক দিয়ে। এই দিকে বেরোবে বলে মনে হচ্ছে। আপনি মোটর সাইকেলের কাছে চলে যান। আর কাপড়টা পাল্টে ফেলুন।'

জামান কোনও কথা বললো না। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দ্রুত। কামাল গিয়ে রিক্সায় বসলো। 'বাহ্ বেশ লাগছে'—মনে মনে বললো। এখন একটা সওয়ারী পেলেই খেলাটা জমবে ভালো।

একটা সিগারেট ধরালো কামাল। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। একটু পরে একটা কালো অস্টিন চলে গেল রিক্সার পাশ দিয়ে। পিছনে দূরত্ব বজায় রেখে হেডলাইট নেভানো একটা মোটর সাইকেল বেরিয়ে গেল।

আর কয়েক সেকেণ্ড পর কামালকে বিস্মিত করে দিয়ে আরও একটা মোটর সাইকেল চলে গেল ওর পাশ দিয়ে।

লাইটপোস্ট থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় দেখা গেল মোটর সাইকেল আরোহী হাত নাড়লো কামালের দিকে। সিগারেটে টান দিতে ভুলে গেল কামাল। কুয়াশা!

দশ

সাইদ যখন সাদিয়াকে নিয়ে ক্লাব ত্যাগ করলো বৃষ্টি তখন চেপে এসেছে। সারাপথ নির্বাক রইলো দু'জন। কি যেন এক বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শে দু'জনের কথা হারিয়ে গেছে। তবুও ওদের মনে হচ্ছিলো যেন নীরবে তারা অনেক কথার জাল বুনে চলেছে।

পিছনে একটা গাড়ি অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে ওদের অনুসরণ করতে লাগলো।

সাইদ ভাবছিল রুবিনা বেঁচে থাকলে কতো খুশি হতো। আর ঠাট্টার ছলে পাগল করে তুলতো দু'জনকেই। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো সে।

সাদিয়া মুখ কিরিয়ে বললো, 'রুবিনার কথা ভাবছো?'

'হ্যাঁ। রুবিনা বড্ড খুশি হতো। তাই না?'

সাদিয়া কোনো জবাব দিলো না। দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে গেল।

গাড়ি এগিয়ে চললো নিঃশব্দে। সাইদের চিন্তা-স্রোত মোড় পরিবর্তন করলো। চারদিকের বৃষ্টি, অন্ধকার আর নৈঃশব্দ ছায়া ফেলেছে ওর মনে। সাইদের মনে হলো সমগ্র পৃথিবীটা যেন তার চারদিক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আছে এই পথটা, চলমান এই গাড়িটা! আর ওরা দু'জন। জনহীন এই পথটা যদি হয় সমগ্র পৃথিবী, এই গাড়িটা তাহলে ইডেন উদ্যান। আর ওরা দু'জন আদিম মানব-মানবী। নিয়ন-গ্যাস শোভিত বৃষ্টি-ক্লান্ত এই পথের পৃথিবীটা যেন শেষ না হয়—মনে মনে আর্তি জানালো

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan
সাইদ।

কিন্তু পৃথিবীটা সত্যি বড় ছোটো। ভাবতে বাধ্য হলো সে। চলমান ইডেন উদ্যানটা মোড় ঘুরে সরু পথ বেয়ে এসে থামলো সাইদের সাময়িক পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। সাদিয়াদের বাগানের বড় বড় গাছের পাতাগুলো মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো প্রেমিক দম্পতিকে। গাড়ির ভিতরে বাতিটা জ্বলে উঠলো।

পিছনের গাড়িটা মোড়ের কাছে এসে নিঃশব্দে থামলো।

'ভিজে যাবে যে সাদিয়া। ঠাণ্ডা লাগবে।' সাইদের গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

খিল খিল করে হেসে উঠলো সাদিয়া।

'হাসলে যে?' অবাক হলো সাইদ।

'ওমা, একটু সময়ের মধ্যে এতো। আর আমি তোমাকে কতো শক্ত, কাঠখোট্টা পুরুষ ভেবে বসেছিলাম।' অবাক হবার ভান করলো সাদিয়া চোখ দুটো বড় বড় করে।

'দুষ্টু মেয়ে।' গালে টোকা দিলো একটা সাইদ।

গাড়ির দরজা খুললো সাদিয়া। বৃষ্টির ছাঁট আসছে।

'কাল কখন আসছো?' জিজ্ঞেস করলো সাদিয়া। তারপর নিজেই বললো, 'সকালে এসো। নানীর সাথে আলাপ করিয়ে দেবো। উনি খু–ব–ই খুশি হবেন। এসো কিন্তু।' গাড়ি থেকে নামলো সাদিয়া।

'আমার তো এখুনি যেতে ইচ্ছে করছে।'

'আহা! তা আর করবে না? তোমরা সবাই এক রকম। ছুঁতেই নুয়ে পড়ো। যাও বাড়ি গিয়ে সুশীল বালকের মতো ঘুমিয়ে পড়গে। টা টা।'

মিষ্টি হেসে অপসৃয়মান সাদিয়ার দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো সাইদ।

সরু পথ। সামনে একটা অস্টিন আড়াআড়িভাবে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। এগিয়ে গিয়ে হর্ন দিলো সাইদ কয়েকবার। বিরক্ত হয়ে গাড়ি থামালো। হঠাৎ ওর মনে হলো গাড়ির দু'পাশে জানালার ধারে কারা যেন এসে দাঁড়ালো। অজ্ঞাত আশংকায় বুকের মধ্যে দুরুদুরু করে উঠলো সাইদের। ডাইনে–বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলো বৃষ্টির ফোঁটা জমা জানালার কাঁচের ওপাশে দু'টো অস্পষ্ট মানুষের মুখ। ডাইনের দিকের জানালায় টোকা দেয়ার শব্দ কানে এলো। একটা হাতও দেখা গেল আবছা।

সাইদ কম্পিত হাতে কাঁচ নামাবার হাতল ঘোরালো। বাইরে দাঁড়িয়ে একজন মুখোশ পরা লোক। তার গায়ে রেনকোট, হাতে একটা রিভলভার ওর বুকের দিকে উদ্যত।

চাপা গলায় লোকটা বললো, 'একটু শব্দও করবে না, বাছাধন। করলে জানটা

এখানেই শেষ করে দেবো। দু'হাত তোলো উপরে।' সাইদ যন্ত্রচালিতের মতো দু'হাত উপরে তুললো। লোকটা ইঙ্গিত করতেই আরও দু'জন লোক এগিয়ে এলো।

চারদিকে আবার তাকিয়ে দেখলো সাইদ। অদূরে সাদিয়াদের বাড়ি। সে হয়তো কল্পনাও করেনি যে তাদের বাড়ির এতো কাছে তারই পরম প্রিয় লোকটা দুর্বৃত্তদের হাতে ধরা পড়েছে।

'চুপচাপ বেরিয়ে এসো।' ধমকে উঠলো মুখোশধারী। 'নইলে খুলি উড়ে যাবে এক সেকেণ্ডের মধ্যে। বেরিয়ে এসো জলদি।'

সাইদ ভয়ে কাঁপছিল। ওর দু'টি চোখ তখন বিস্ফারিত। ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নামলো সে হাত মাথার উপর তুলে।

আধ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে গেল সাইদ। মুখোশধারীর পাশের লোকটা গাড়িতে উঠে বাম দিকের আর পিছনের দরজা খুলে দিলো।

'নাও। লক্ষ্মীছেলের মতো গিয়ে বসো।' পিছনের দিকে ইঙ্গিত করলো লোকটা।

পিছনের সিটে গিয়ে বসলো সাইদ। তার দু'পাশে দু'জন লোক এসে বসলো। তাদের হাতে ছোরা। লোক দু'টোর গায়ে গেঞ্জী। পরনে হাফ প্যান্ট। মুখে উৎকট গন্ধ। আর একজন এসে বসলো ড্রাইভিং সিটে।

মুখোশধারী বললো, 'খুব সাবধান, রজব। ওরা কেউ কোনও জবাব দিলো না। পথের পাশে বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল মুখোশধারী চারদিক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে অস্টিনের দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত। সাইদের মনে হলো মুখোশধারীর কণ্ঠস্বরটা যেন তার অতি পরিচিত।

ওর ডান পাশের লোকটা হঠাৎ অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলো, 'কি যে ঝকমারী। কর্তার কাণ্ডটাই এমনি। এখানে শেষ করে দিলেই হতো। তা না বয়ে নিয়ে চলো।'

ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটা গর্জন করে উঠলো, 'বেয়াদবের মতো কথা বলবি না, জুম্মন। নিজের জানটাই শেষ হয়ে যাবে।'

লোকটা আর উচ্চবাচ্য করলো না।

আতংকে অর্ধবিলুপ্ত চেতনায় সাইদের মনে হলো ওকেও নিয়ে যাচ্ছে খুন করার জন্যে। মেরুদণ্ডের ভিতরটা শির শির করে উঠলো। অর্ধমৃতের মতো আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলো সে।

এঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ শোনা গেল। কিন্তু সামনের গাড়িটা তখনও ঠায় আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ সামনের দিক থেকে একটা চাপা গর্জন ভেসে এলো। আর পরমুহূর্তেই সাইদের চোখে পড়লো মুখোশধারী অস্টিন থেকে মুখ থুবড়ে পথের উপর পড়ে গেল।

সাইদের গাড়ির লোকগুলো চঞ্চল হয়ে উঠলো। মুখোশধারী উঠে দাঁড়িয়ে ওদের পাশ দিয়ে দৌড় দিলো। তার পিছনে ছুটে আসছে আরও দু'জন লোক। তাদের হাতের পিস্তল ঝিকমিক করে উঠলো নিয়ন বাতির আলোয়। সাইদের পাশের লোকটা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললো, 'সর্বনাশ! কুয়াশার দল।' তিনজনেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় দিলো এক পলকের মধ্যে।

পিস্তল হাতে যারা দৌড়ে আসছিল তাদের একজন এসে সাইদের গাড়িতে উঁকি দিলো। অন্ধকারে কিছু বোধহয় দেখতে পেলো না। হতভম্ব সাইদের মুখের উপর টর্চের আলো এসে পড়লো। তার হাতটা উঠে এলো চোখের ওপর। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে অন্ধকার দেখলো সাইদ। কিন্তু কণ্ঠস্বর কানে এলো।

'এই যে ভাইয়া, গাড়িতেই আছেন উনি।' দরজাটা খুলে ফেললো লোকটা। সাইদ আবার শঙ্কিত হলো।

দীর্ঘ বিশাল একটা মূর্তি সাইদের চোখে পড়লো জানালার ভিতর দিয়ে রাস্তার দীপালোকে। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। গায়ে রেনকোট। মাথায় হ্যাট।

পিস্তলধারী আর তার সঙ্গীরা ফিরে এসে দাঁড়ালো, নিচু গলায় বললো, 'পালিয়ে গেছে ওরা।' সেই বিশালদেহী মূর্তিটা দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। মাথা নিচু করে বললো, 'কিছু ভয় নেই, সাইদ। ওরা পালিয়েছে।' ভরাট গলা কানে এলো তার।

সাইদ হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কথা বলবার শক্তিটাও সে হারিয়ে ফেলেছে একের পর এক দুঃস্বপ্নময় ঘটনার আবর্তে।

লোকটা বোধহয় তা বুঝতে পারলো। হাত বাড়িয়ে আস্তে করে ঝাঁকুনি দিলো সাইদের কাঁধে। একটু মিষ্টি হাসি হাসলো। সে হাসিতে অভয়ের আশ্বাস।

'ভয় পাচ্ছো, সাইদ। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তোমাকে বাঁচাতেই এসেছি। চলো তোমাকে নিরাপদ কোথাও পৌঁছে দিই। আর দেরি করা যায় না এভাবে পথের মাঝখানে। কে জানে হঠাৎ হয়তো পুলিসের লোকগুলো মাটি ফুঁড়ে উদয় হতে পারে। তবে তোমাকে তো তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়া নিরাপদ নয়। সেখানে তোমার উপর তাহলে আবার হামলা হবে। আপাততঃ আমার সাথে যেতে হবে তোমাকে।'

'কোথায় যেতে হচ্ছে?' সাইদ জিজ্ঞেস করলো। ওর অকস্মাৎ মনে হলো যদি তার একটিমাত্র হিতার্থী থাকে তাহলে সে তার সামনে দাঁড়ানো এই বিশালদেহী মূর্তিটা। বোধহয় শুধু মাত্র তার উপরই নির্ভর করা চলে সমগ্র পৃথিবীতে। সাইদ প্রশ্ন করলো, 'আপনি কে?'

জবাব এলো. 'আমি কুয়াশা।'

স্বপ্ন দেখছিল সাইদ। সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে কাটতে অবশ হয়ে গেছে ওর দেহটা। পাড়ে এসে পৌঁছতে পারছে না। রুবিনা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো। গুণ্ডারা ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সাইদের দিকে নজর পড়ায় গুণ্ডারা রুবীকে এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এলো। ডুব দিলো সাইদ। বিরাট একটা তিমি মাছ হাঁ করে ওকে ধরতে গেল। চিৎকার করতে গিয়ে দেখে মাছটা কামাল হয়ে গিয়ে হাসতে শুরু করেছে। দৃশ্য পালটে গেল। কে যেন বললো, জানিস জর্জিয়া থেকে কাল-চারাল মিশন এসেছে, ঠাটারী বাজারের রাস্তা বন্ধ করে কাওয়ালী গাইবে। হেসে উঠলো লোকটা। রাস্তা দিয়ে চার আনা দামের বেহালা বাজাতে বাজাতে একটা লোক যাচ্ছে। তার পিছনে ভিড়।

ঘুম ভেঙে গেল সাইদের। কে যেন সরোদ বাজাচ্ছে। খুব কাছে। মনে হয় পাশের ঘরে। চমৎকার বাজাচ্ছে তো! কে বাজায়? কুয়াশা? হতে পারে। হাতটা কি মিষ্টি! অপূর্ব সুরেলা বাজনা। সুরের পরিচয় জানে না সাইদ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে ওদের সমাজের উৎসাহ কম। সাইদেরও নেই। কিন্তু এই নিশুতি রাতে সরোদের সুরের মায়াজালে যেন অমৃতময় অতীন্দ্রিয় জগতের দ্বার খুলে দিলো তার সম্মুখে।

এমন সুরেলা সরোদ বাজানো শোনেনি কখনো সাইদ। শিল্পী যেন সুরের ঐশ্বর্য মুঠোয় মুঠোয় ছড়িয়ে দিচ্ছে। একান্ত হয়ে গেছে সঙ্গীতের মূর্ছনার মধ্যে। কুয়াশা বাজাচ্ছে? কুয়াশা এতো বড় শিল্পী! অথচ আইনের চোখে সে ঘৃণিত অপরাধী। হিসেব মেলাতে পারছে না সাইদ। ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়লো সে।

সরোদ থেমে গেল। গভীর স্নেহে প্রিয় বাদ্যযন্ত্রটাকে পাশে রেখে দিলো কুয়াশা। তার-গুলোর উপর আস্তে আস্তে টোকা দিলো। শব্দ হলো টুংটুং।

হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নিলো কুয়াশা। রাত শেষ হয়ে আসছে। পাশের ঘরের নিদ্রিত সাইদের ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সাইদ।

অনেক—অনেক কথা ভিড় জমালো কুয়াশার মনে। কামালের প্রশ্ন মনে পড়লো। মানুষের প্রতি যখন এমন গভীর মমতা আপনার, তাহলে নিজে কেন বিজ্ঞানের নামে প্রাণ সংহারে মেতেছেন? এ প্রশ্ন শুধু কামালের নয়। সারা দেশ, সমগ্র পৃথিবী যেন কামালের মুখ দিয়ে ঐ প্রশ্নটা করিয়ে নিয়েছে। কুয়াশা ভাবছিল এইখানেই তার জীবনের শোচনীয় ট্রাজেডী। কেউ তাকে বুঝলো না। মানুষের কল্যাণই যে তার উদ্দেশ্য, এই কথাটা কেউই সহানুভূতির সাথে ভেবে দেখলো না। সবাই জানলো সে খুনী। আইনের চোখে অপরাধী। তাকে অপরাধী মনে করে নিয়েই তার পশ্চাদ্ধাবন করছে সিম্পসন, জামান, কামাল, এমনকি শহীদ খানও। এই জন্যেই সাধনায়

সার্থকতা লাভের মুহূর্তে আইন নিষ্ঠুর আঘাত করেছে তাকে। কিন্তু কেন? সত্যি কি সে অন্যায় করেছে? হ্যাঁ, মানুষের তৈরি আইনের চোখে সে অন্যায় করেছে বৈকি! কিন্তু বিবেকের কাছে কোনও অন্যায় সে করেনি। তবুও তার সিদ্ধি লাভ বানচাল হয়েছে আইনকে লংঘন করতে গিয়েই। অনন্তকাল ধরে মানুষ যে আইন তৈরি করেছে তার সাথে বিজ্ঞানের এই সংঘর্ষের জন্যে কে দায়ী? তার নিজের অধীরতা? বোধহয় তাই। সে তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ করতে চেয়েছিল। ধৈর্যের বাঁধ মানছিল না তার দ্রুত ফললাভের অসীম আগ্রহে। তাই প্রচলিত পথ ছেড়ে অন্য প্রাণীর উপর পরীক্ষায় সময় অপচয় না করে প্রথমেই পরীক্ষা চালিয়েছে মানুষের উপর। তার জন্যে প্রাণ দিতে হয়েছে অনেককে—কিন্তু তাদের মৃত্যু কুয়াশা চায়নি। কুয়াশা চেয়েছিল তাদের কল্যাণ—জ্বরা থেকে তাদের মুক্তি। তবু সংঘাত বেধেছে আইনের সাথে। এর চেয়ে যদি সে প্রচলিত প্রথায় গবেষণা চালাতো তাহলে আজ তাকে অপরাধী বলে ঘৃণা পেতে হতো না। পালিয়ে ফিরতে হতো না অপরাধ জগতের পশুদের মতো।

কোথায় যেন বিরাট ভুল হয়ে গেছে শুধুমাত্র অধীরতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এবার থেকে শুধরে নিতে হবে।

'এবার থেকে শুধরে নেবো।' আপন মনে আবৃত্তি করলো কুয়াশা।

এগারো

আজিজুল করিমের অফিস থেকে বেরিয়ে জামান সোজা চলে গেল সিম্পসনের অফিসের দিকে। সিম্পসন ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

জামান ঘরে ঢুকতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, কিছু পাওয়া গেল?'

জামান বললো, 'হ্যাঁ, অনেক কিছু। কিন্তু অনেক কষ্টে। ব্যাটাচ্ছেলে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। ধমক খেয়ে সে স্বীকার করলো যে, মিস রুবিনার বিয়ের মজলিসে সে গিয়েছিল ঠিকই, তবে খুনের কথা কিছুই জানে না। কিন্তু সেখানে কেন গিয়েছিল তা কিছুতেই বললো না। অবশ্যি কিছু এসে যায় না। লোকটা আসলে একটা গর্দভ।'

সিম্পসন বললেন, 'এদিকের খবর কিন্তু খুবই খারাপ।'

'যথা?' সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলো জামান।

'সাইদ আর মিস খোরাসানী নিখোঁজ হয়েছে।'

জামান চমকে উঠলো। বললো, 'দু'জনই নিখোঁজ?'

'হ্যাঁ দু'জনই। মিস খোরাসানীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে জানালার শিক গলিয়ে।'

'আর সাইদকে?' সিগারেটে টান দিলো জামান।

'সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে সাইদ রাতে বাড়ি ফেরেনি। ওদের শেষ দেখা গেছে ইস্কাটন ক্লাব থেকে গত রাতে এগারোটার দিকে বেরোতে।'

সিগারেটে টান দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো জামান। তারপর বললো, 'ঠিক আছে, মি. সিম্পসন। আমাদের স্ট্র্যাটেজীটা পাল্টাতে হবে মাত্র।'

এবার দু'জন মিলে অনেকক্ষণ পরামর্শ করলো। কয়েকটা জায়গায় টেলিফোন করলেন সিম্পসন।

জামান চলে এলো বাসায়। সেখানেও তার জন্য দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল।

জামান বাসায় পৌঁছুতেই ছোটচাচা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন, 'শফির খবর কিছু জানিস?'

জামান থমকে দাঁড়ালো, 'তার মানে?'

'মানে আর কি? আমি সকালে গিয়েছিলাম শফির বাসায়। শফি নেই। ওর সমস্ত ঘর কারা তছনছ করে রেখে গেছে। বই-পত্র মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দুয়ার খোলা।'

জামান বললো, 'এমনটিই আশংকা করেছিলাম।'

'আশংকা করেছিলি মানে? তাহলে এমনটি যাতে না হয় তার চেষ্টা করিসনি কেন?'

'চেষ্টার ত্রুটি করিনি, চাচাজান।' নিজের ঘরে ঢুকলো জামান। চাচাজান পিছন পিছন ঢুকলেন, 'লিলির খবর কিছু পেলি?' হতভাগী বেঁচে আছে, না—'গলাটা আর্দ্র হয়ে গেল তাঁর।

জামান কোনও জবাব দিলো না।

বাইরে একটা গাড়ি থামবার শব্দ পাওয়া গেল। জামান নিজেই বেরিয়ে এলো। বারান্দার সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আজিজুল করিম। মুখটা শুকনো।

জামান এগিয়ে এলো। ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি। বললো, 'আসুন আসুন করিম সাহেব। আমি জানতাম আপনি আসবেনই। চলুন ড্রইংরুমে।'

কামাল ফুঁসছিল আর শহীদ মুখ টিপে হাসছিল। তার হাসি দেখে জ্বলে উঠলো কামাল। বললো, 'দ্যাখ, শহীদ। আমার নতুন গুরুদেব যে এতো শিগগির কুয়াশার সন্ধান পাবে, লিলিকে খুঁজে বের করবে, আর রুবিনার হত্যা রহস্যের সমাধান করবে, এমন মনে করার কি কারণ আছে বল? একা কুয়াশাই তো তোকে কম ঘোলা পানি খাওয়ায়নি। পেরেছিস তাকে ধরতে? কলা দেখিয়ে বিদায় দিয়েছে না?'

শহীদ বললো, 'না পারিনি। কিন্তু তোকে তো আমার চাইতে অনেক বেশি ট্যালেন্টেড লোক মনে করি কিনা। তাই তোর ব্যর্থতায় অবাক না হয়ে পারছিনে।'

'কের কাজলানো হচ্ছে?'

'যাকগে, এখন মোদ্দা ব্যাপার দাঁড়ালো তুই তাহলে লিলিরও খবর সংগ্রহ করতে পারিসনি আর রুবী হত্যারও কোনও কিনারা করতে পারিসনি।'

'আহা। যেন আমি একাই মহাপুরুষদের পশ্চাদ্ধাবন করছি।'

শহীদ সিগারেট ধরালো। দেশলাই-এর কাঠিটা নিভিয়ে অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে বললো, 'কিন্তু জামান আর সিম্পসন তো পৌঁছেই গেছে তদন্তের শেষ প্রান্তে। এতদিন জামান তো শুধু শুধুই ঢাকা শহরে ঘুরপাক খায়নি রাতদিন।'

'কই আমাকে তো কিছু বলেনি?'

'বলবে কিরে, হতভাগা। তোর চোখ কান নেই? আমার ধারণা জামান চলছে ঠিক পথ ধরে। দু'একটা ভুল না করেছে এমন নয়। মনে হচ্ছে, ওর মনের সন্দেহটা এখন সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে গেছে।'

'এসব কি উদ্ভট কথা বকছিস তুই?'

'উদ্ভট নয়রে, উদ্ভট নয়। কুয়াশা-নাটকের বর্তমান দৃশ্যে একই ব্যক্তি দ্বৈতচরিত্রে অভিনয় করছে। সেই মহাধূর্ত ব্যক্তিটি এমন একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে আসল অপরাধীকে হাতের মুঠোয় আনতে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছে জামানকে। তাছাড়া মূল নায়ক কুয়াশাও ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে বেড়াচ্ছে। আর জামান দু'দিক দিয়ে তাল সামলাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে।'

'মানে তুই বলতে চাচ্ছিস...'

'আমি বলতে চাচ্ছি যে, তোর মাথায় আচ্ছা করে ঝাঁকুনি দে। ঘিলুর সেলগুলো থেকে মরচে খসে পড়ুক।'

'ঠাট্টা রাখ, শহীদ।'

'ঠাট্টা নয়। ঘটনাগুলোকে আনুপূর্বিক সাজিয়ে ফেল। আর তার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা কর। রুবিনাকে খুন করা হবে কুয়াশা তা জানতো। তার মানে হত্যাকারী তার অতি পরিচিত। এমন কি তার ইচ্ছার সাথেও কুয়াশার পরিচয় আছে। রাতের বেলাই ড. রহমানের ঘরে ডাকাতি হলো। কুয়াশা নিশ্চয়ই ডাকাতি করেনি। সামান্য পণ্যের জন্যে কুয়াশা ডাকাতি করবে না। আবার সকাল বেলাতেই ডাক্তার বেশে কুয়াশা ড. রহমানের বাড়ি গেল। কেন গেল? কি তার উদ্দেশ্য? রুবিনাকে হত্যাই বা করা হলো কেন? ঘটনাস্থলে তার ভূতপূর্ব স্বামীকেই বা দেখা গেল কেন?'

'তুই-ই বল।'

শহীদ হো হো করে হেসে উঠলো, 'আমি বলবো কেন? বলবি তুই। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করলেই নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবি।'

সিগারেটে লম্বা টান দিলো শহীদ। কামাল শহীদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ধোঁয়া ছেড়ে শহীদ বললো, 'তবে জামান শেষরক্ষা করতে পারলে হয়।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ পাখি পালাচ্ছে। তার ডানা ঝটপটানির শব্দ আসছে স্পষ্ট।'

বারো

রাত প্রায় এগারোটা। শ্রাবণের বুড়িগঙ্গা পূর্ণযৌবনা। দু'কূল প্লাবিত করে বাকল্যাণ্ড বাঁধ ছাপিয়ে উঠবার চেষ্টায় ব্যাপৃত।

অসংখ্য ছোটবড় নৌকো, লঞ্চ চলছে। বিশ্রাম নিচ্ছে। ঘাটে মানুষের ভিড় আর কোলাহল। চোঙা হাতে যাত্রীদের প্রতি সাদর আমন্ত্রণ। আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি যুদ্ধে প্রমত্ত।

একটা রিক্সা ওয়াইজঘাটে এসে থামলো। কামাল আর শহীদ নামলো রিক্সা থেকে। সামান্য ছদ্মবেশ নেয়ায় ওদের চেনা যাচ্ছিলো না। দু'জনের হাতে দু'টো ব্যাগ। ইনশিওরেন্সের এজেন্টের মতো দেখাচ্ছিল দু'জনকেই। কামাল একটা সিগারেট ধরিয়ে এদিক-ওদিক চাইলো। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লো না।

রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলো ওরা চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। একটা লোক এগিয়ে এলো, 'এই যে স্যার, কই যাইবেন? মাদারীপুর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা।' জোরে জোরে বললো লোকটা।

'নবীপুরের লঞ্চটা কোথায় বলতে পারো?'

'পুবে, স্যার। মাঝ দরিয়ায়। নৌকা লইয়া যাইতে অইবো। নাইলে চলেন স্যার আমার সঙ্গে এই কোষায়। দুই সিকি দিবেন স্যার। আয়েন।'

'দুই সিকি বেশি চাচ্ছো, মিঞা। এক সিকি পাবে।'

'আইচ্ছা, স্যার। তত্বরি লন। নাইলে লঞ্চ ছাইড়া দিবার পারে। আয়েন, ব্যাগ দুইডা সাবধানে ধইরা আনবেন স্যার, পইরা না যায়।'

ওরা গিয়ে উঠলো নৌকোয়। কামাল জিজ্ঞেস করলো, 'সবাই এসে গেছে?'

'জ্বি, স্যার। একেবারে চারদিকে সাদা পোশাকে পুলিস ছেয়ে গেছে। ভয়, স্যার, এপারে। ওরা যদি পালিয়ে সাঁতার কেটে এপারে কোনও লঞ্চের মধ্যে উঠে যাত্রীদের মধ্যে মিশে যায় তাহলে আর পাওয়া যাবে না।'

নৌকো ছেড়ে দিলো লোকটা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাঝ দরিয়ায় এসে পড়লো।

লোকটা দূরে একটা বিরাট লঞ্চ দেখিয়ে বললো, 'এইটেই এম. ভি. নবীপুর। মি.

সিম্পসন ঠিক বারোটায় লঞ্চে উঠতে বলেছেন। ততক্ষণ আমাদের দূরে থাকাই ভালো। ওদের লোকও চারদিকে নৌকো আর মোটরবোট নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।'

শহীদ বিরক্ত হলো। এমন তো কথা ছিলো না। রাত এগারোটায় হানা দেবার কথা ঠিক হয়েছিল। দেরি করলে সর্বনাশ হতে পারে।

কামাল বললো, 'মি. সিম্পসন আবার প্ল্যানটা কখন পাল্টালেন বুঝতেই পারছিনে।'

শহীদ এম. ভি. নবীপুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো। দূরত্ব খুব বেশি হলে তিরিশ গজ হবে। শহীদের মনে হলো একটা লোক লঞ্চ থেকে ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়লো। সচকিত হলো শহীদ। সঙ্গে সঙ্গে 'গুড়ুম' 'গুড়ুম' পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল দু'বার। প্রতিধ্বনিও শোনা গেল।

'যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে কামাল। শিগগির পানিতে নেমে পড়। ডুব সাঁতার দিয়ে আসবি। পিছন দিক দিয়ে উঠবার চেষ্টা করবি লঞ্চে।'

'হাসান আলী, সিগন্যাল দাও আলো দেখিয়ে।' দুজন নেমে পড়লো নদীতে।

অন্ধকারে দুজন মুহূর্তে হারিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর আবার পিস্তলের গুলির আওয়াজ ভেসে এলো। শহীদ তখন এম. ভি. নবীপুরের কাছে এসে পড়েছে। মাথাটা তুলে এক ঝাঁকুনিতে চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলো। গুলির আওয়াজের প্রতিধ্বনির সাথে সাথে ভেসে এলো চিৎকার। ঝপ করে শব্দ হলো একটা কাছেই। কাকে যেন পানিতে ফেলে দেয়া হলো। তলিয়ে গেল একটা মানুষের দেহ।

লঞ্চটা থেকে ধুপধাপ শব্দ আসছে। যেন সেখানে লোক দৌড়াদৌড়ি করছে। শহীদের পাশেই আর একটা মুখ ভেসে উঠলো। ডুব দিলো শহীদ সাথে সাথে। পরক্ষণেই খেয়াল হল মাথাটা কামালের, আবার মুখ তুলেই দেখে মাথাটা অদৃশ্য হয়েছে। হাসি পেল শহীদের।

লঞ্চটার পাশে এসে পৌছলো শহীদ। একটা মোটা দড়ি নেমে এসেছে। হাঁপাচ্ছিল শহীদ। দড়ি ধরে অবলীলাক্রমে সে উপরে উঠে এলো। কামালের মাথাটা দেখা গেল আবার। ইশারা করলো শহীদ। এদিকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার পিঠে একটা ছোরা আমূল ঢোকানো। পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়ে লঞ্চের ধার বেয়ে এগোল শহীদ। একটা লোক ছুটে আসছে শহীদের দিকে। হাতে ছোরা। শহীদ লঞ্চের প্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়লো। লোকটা ছুটে আসতেই শহীদ সাঁ করে এক পাশে সরে গেল। নিজেকে থামাতে না পেরে লোকটা পড়ে গেল নদীতে।

কামাল ততক্ষণে উঠে এসেছে দড়ি ধরে। অন্ধকার কাঁপিয়ে আবার গর্জন শোনা গেল পিস্তলের। পুলিসের মোটর বোট এসে পড়েছে দুটো। তাদের হাতে উদ্যত

রাইফেল। সিম্পসন এসে পৌঁছেছেন।

নদীর দু'দিক থেকে দুটো সার্চ লাইটের তীব্র আলো এম. ভি. নবীপুরকে আলোকিত করে ফেললো। আর সেই আলোয় দেখা গেল ডেকের একপাশে রেলিং এর উপর একটা লোককে চেপে ধরেছে দারোগা মোজাম্মেল হক। লোকটা হঠাৎ কেমন করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রেলিং টপকাতে যেতেই পাশ থেকে একটা পুলিস রাইফেল তুলে মাথায় আঘাত হানলো। লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

হক সাহেব মোটা ভারি দেহটা টেনে থপথপ করে এগিয়ে এলেন। তাঁর ইউনিফর্মটা ঘামে ভেজা। শহীদ দ্রুত তাঁর কাছে আসতেই হক সাহেব বললেন, 'বড় লেট কইরা ফালাইছেন, শহীদ সাব। আয়েন সামনের সেলুনে পালের গোদা নুরবক্স ঢুইকা পড়ছে। চারদিকে পুলিস বসাইয়া রাখছি। তবে সাবধানে আউগাইতে অইব। হাঁপাতে লাগলেন তিনি।'

'দেখা যাক। দরজাটা ভেঙে ফেলুন,' সিম্পসন বললেন। তিন চারজন পুলিস এগিয়ে গিয়ে একনাগারে প্রচণ্ড লাথি মারতে লাগলো। কিন্তু দরজাটা এতটুকু হেললো না।

মোজাম্মেল হক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তরা বাত খাছ না ঘাস খাছ। সর দেহি।'

সবাইকে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে গেলেন দরজার দিকে। ঝনঝন করে শব্দ হলো। খসে পড়লো দরজাটা চৌকাঠ থেকে।

চমৎকৃত হলো সবাই। হোঁৎকা আয়েসী দারোগা মোজাম্মেল হকের দেহে যে এমন অসুরের শক্তি ছিলো তা কে জানতো?

কামাল মুগ্ধ হয়ে বললো, 'দারোগা সাহেবের প্রমোশন এবার ঠেকায় কে?'

হক সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন। চোখে মুখে ক্লেশের ছাপ। রেলিং ধরে বললেন, 'হেই আর জীবনে অইলো না। সিম্পসন সাবরে যদি একটু কইয়া দেন।'

শহীদ আর সিম্পসন কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কেবিন শূন্য। সেখানে কেউ নেই। বিছানার তলা, বাথরুম কোথাও নেই কেউ। নিশ্চয় কোনও গোপন দরজা দিয়ে সরে গেছে নুরবক্স। বেরিয়ে এলো ওরা।

হক সাহেব বললেন, 'আপনারা দোতলায় উডেন গিয়া। আমি নিচে নামি গিয়া এঞ্জিন ঘরের দিকে। আইয়েন, আসাদ সায়েব। দেরি কইরেন না। এই মিঞারা, তোমরাও কয়েকজন আইয়া পড়ো সাথে। কামাল সাব আপনে কয়েকজন সিপাই লইয়া এহানেই থাইকেন। ডান পা'টা ঈষৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলেন হক সাহেব লঞ্চটার পিছন দিকে। কামাল সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। এই লোকটাকে সে এতদিন অপদার্থ বলেই মনে করে এসেছে।'

হক সাহেব সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন। পুলিসদের হাতের টর্চলাইটগুলো জ্বলে উঠলো। সিঁড়ির উপরে নিচে একজন করে পুলিস দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। দুপাশ থেকে দুজন লোক ওদের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। জামানের বাঁ হাত থেকে টর্চটা ছিটকে পড়ে গেল। হক সাহেব বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন। আর্তনাদ করে উঠলো লোকটা। মাটিতে ফেলে অন্ধকারেই আন্দাজে পাঁজরের উপর লাথি চালালেন।

তেরো

জামান আর একজন পুলিস তখন আর একজন আক্রমণকারীকে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলেছে। ওদের এক নজর দেখে এগিয়ে গেলেন হক সাহেব।

সামনে কোথা থেকে ক্ষীণ আর্তনাদ ভেসে আসছে। এগোলেন সেদিকে।

'ঐ যে আর এক শয়তান আসছে।' ছোরা হাতে এগিয়ে এলো একটা লোক। চোখ দুটো জ্বলছে তার।' হক সাহেবের পিছনে জামানের হাতে সাইলেন্সার পাইপ লাগানো পিস্তলটা আধা অন্ধকারেও চকচক করে উঠলো। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা।

হক সাহেব সামনের দেয়ালে কান পাতলেন। জামান আর পুলিস পিছনে এসে দাঁড়ালো। তিনি ইঙ্গিতে শব্দ করতে নিষেধ করলেন।

'সবগুলোকে মেরে ফেলে দাও।' জিঘাংসা ভরা চাপা কণ্ঠ কানে এলো। হারামজাদী দু'টোকে আগে। হাত চালা। সময় নেই। পাশের ঘরে তিনটে টিকটিকি আটকা পড়েছে। ওদেরও শেষ করতে হবে। কুইক।'

কণ্ঠটা থেমে গেল।

একটু পরে আবার শোনা গেল, 'শফি, এখনও বল কোথায় রেখেছিস কুয়াশার থিসিস। আমার সাথে চালিয়াতি? এখনও বল কোথায় আছে। না হলে পরিণাম কি হবে দেখতেই পাচ্ছিস চোখের সামনে। কুয়াশার সাধ্য নেই তোকে বাঁচাবে।' কোনও জবাব শোনা গেল না।

সপাৎ করে একটা শব্দ হলো। আর সাথে সাথে ভেসে এলো মর্মস্পর্শী আর্তনাদ। জামান দাঁতে দাঁত চেপে উত্তেজনা দমন করলো। ক্রোধে তার হাত দু'টো নিশপিশ করছিল।

আবার সেই গলাটা শোনা গেল।

'তোদের কপাল ভালো। আমার হাতে সময় নেই। খুন করা ছাড়া উপায় নেই আর। রজব, দেরি নয়। আগে হারামজাদীদের চোখগুলো গরম শিক দিয়ে ঝলসে দে।'

জামান শিউরে উঠে বোধহয় চিৎকার করতে যাচ্ছিলো। হক সাহেব বুঝতে পেরে তার হাতের উপর চাপ দিলেন। তারপর তাকে সরিয়ে দিয়ে কয়েক পা পিছনে সরে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। দৌড়ে এসে দেহের সমগ্র শক্তি দিয়ে লাথি মারলেন দেয়ালটার উপর। দড়াম করে ভেঙে পড়লো দেয়াল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন হক সাহেব ভিতরে। ভিতরের উজ্জ্বল আলোয় জামান দেখতে পেল জ্বলন্ত চুল্লীতে একজন লোহার শিক গরম করছে। ধোঁয়ার উৎকট গন্ধ। পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে। তার হাতে চাবুক। আর চেয়ারে বসে মুখোস পরা একজন। নিশ্চয়ই এটেই নুরবক্স।

ঘটনার আকস্মিকতায় বোধহয় সবাই চমকে গিয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই দাঁড়ানো লোকটা চাবুক ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো হক সাহেবের উপর। তারপর একটা আর্তনাদ করে পড়ে গেল। হক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। পিস্তলটা নড়ে উঠলো জামানের হাতে। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে মৃত্যু ঝরে পড়লো নিমেষে। যে লোক শিক গরম করছিল চাকু নিয়ে রুখে এলো সে। হক সাহেব লোকটার তলপেটে জোর লাথি মারলেন। লোকটা পড়ে গেল মেঝের উপর।

হক সাহেব মুখোশধারীর দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলেন, 'তারপর, নুরবক্স, ওরফে ড. রহমান?' কঠিন শোনালো হক সাহেবের কণ্ঠ। জবাবে সে একটা ছোরা ছুঁড়ে মারলো বিদ্যুৎ গতিতে হক সাহেবের দিকে। দ্রুত সরে গেলেন তিনি।

মুখোশের অন্তরাল থেকেও চোখ দু'টো থেকে যেন আগুন বেরিয়ে আসছে। সে একটা ডাইভ দিলো হক সাহেবের দিকে। হক সাহেবের হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে গেল। প্রচণ্ড লাথি চালাল নুরবক্স হক সাহেবের পেটের দিকে। হক সাহেব সরে গেলেন। নুরবক্স টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লিলি, শফি আর সাদিয়া খোরাসানী দেখছিল সমস্ত ঘটনা। ওদের চোখে-মুখে আশার আলো।

জামান আর দেরি করলো না। পুলিসের সহযোগিতায় দ্রুত তাদের বাঁধন কেটে দিলো। অজ্ঞান হয়ে লিলি জামানের গায়ের উপর ঢলে পড়লো। বোনকে কোলে করে নিয়ে বেরিয়ে এলো জামান। নুরবক্সের সাথে যুদ্ধরত হক সাহেব বোধহয় ওদের দিকেও লক্ষ্য রাখছিলেন। তিনি নুরবক্সের চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুসি লাগাবার ফাঁকে বললেন, 'শফি, জামানের সাথে চলে যাও। মিস খোরাসানীকে তুমি নিয়ে যাও ইয়ার মাহমুদ।'

শফি চলে গেল। ইয়ার মাহমুদ অর্থাৎ পুলিসটা হক সাহেবের কথা না শুনে সঙ্গীন উঁচু করে তেড়ে এলো তাঁকে সাহায্য করার জন্যে।

'থামো।' চিৎকার করে উঠলেন হক সাহেব। আমিই ওকে সামলাচ্ছি, তুমি মিস

খোরাসানীকে নিয়ে যাও। পুলিসটা হকচকিয়ে গেল। দ্রুত মিস খোরাসানীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

তাদের কথাবার্তার সুযোগে নুরবক্স হঠাৎ পিছিয়ে গেল।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাসি ভেসে এলো। হক সাহেব মুখ তুলে দেখলেন সামনে শূন্য। নুরবক্স নেই। দেয়ালের একাংশ ফাঁক। সে ফাঁকটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। হাসিটা ক্রমেই দূরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয়েছিলেন বোধহয় হক সাহেব। সে ভাবটা কেটে যেতেই সারা ঘরময় কি যেন খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে এক কোণে একটা বোতাম দেখতে পেলেন।

বোতামটা টিপতেই হাতের ডাইনে ক্রমশঃ ফাঁক হয়ে গেল। ওদিকের ঘরটা বোধহয় অন্ধকার ছিলো। এই কক্ষের আলোতে সেই অন্ধকার কেটে গেল। দেখা গেল কামাল, আর সিম্পসনের হাতে পিস্তল। এখুনি হয়তো গর্জে উঠবে।

হক সাহেব হাঁ হাঁ করে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, 'করেন কি, স্যার। আমি মোজাম্মেল হক, স্যার। আমারে মাইরেন না, স্যার।'

পিস্তল তিনটে নেমে এলো।

সিম্পসন বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। হক সাহেব দেয়ালে কি যেন খোঁজ করছেন দেখে চুপ করে গেলেন। জিজ্ঞাসায় তাঁর ভ্রূ দু'টো কুঁচকে গেল।

দেয়াল পরীক্ষা শেষ করে ফিরে দাঁড়ালেন হক সাহেব। সিম্পসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার, নুরবক্স পলাইয়া গেছে।' আপনারা আর দেরি কইরেন না। এই লঞ্চে ঠিক বারোটায় এক্সপ্লোশান হইবো, মাত্র দশ মিনিট সময় আছে। আপনারা বারাইয়া যান। সামনেই সিঁড়ি। আপনাদের লঞ্চে আসল ড. রহমানরে পাঠাইয়া দেওয়া হইছে পুলিস পাহারায়। পিছনে কয়েকজন পুলিস রইছে তাগো আমি লইয়া আসতাছি। যান, স্যার, আর দেরি কইরেন না।

সিম্পসন আর কামাল প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে এগিয়ে গেল।

শহীদ হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। বললো, 'আর আপনি, হক সাহেব?'

'এঞ্জিন ঘরটা দেখে আসি। নুরবক্স ওখানে থাকতে পারে।'

'এতোটা রিস্ক নেয়া কি ঠিক হচ্ছে, কুয়াশা?'

'ভেবো না, শহীদ। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আছে আমার। তাছাড়া তোমাদের সকলের চোখেই ধরা পড়ে গেছি আমি। হ্যাঁ শোনো, সাদিয়া খোরাসানীকে নিয়ে যাচ্ছি আমার সাথে সাইদের কাছে, আর আসল দারোগা মোজাম্মেল হক জাবেদ বোর্ডিং-এ ঘুমোচ্ছে। আর দেরি নয়। গুড বাই।'

প্রশস্ত হাতটা বাড়িয়ে দিলো কুয়াশা। শহীদ নিবিড় আন্তরিকতায় কুয়াশার হাতে চাপ দিয়ে বললো, 'আবার তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচালে কুয়াশা।'

হাতটা ছেড়ে দিলো দারোগাবেশী কুয়াশা। কোনও জবাব দিলো না। অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

মোটর লঞ্চটা এম. ভি. নবীপুর থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। সার্চলাইট দু'টো এখনো লঞ্চটার দিকে স্থির হয়ে আলো ছড়াচ্ছে।

'শেষ পর্যন্ত কুয়াশাই আমাদের প্রাণরক্ষা করলো,' জামান বললো। তার গলায় কৃতজ্ঞতার রেশ।

কামাল কি একটা জবাব দিলো। কিন্তু একটা গগনবিদারী বিস্ফোরণের শব্দে তার কথা মিলিয়ে গেল। ওরা সবাই তাকিয়েছিল এম. ভি. নবীপুরের দিকে। সার্চলাইটের আলোয় দেখা গেল এম. ভি. নবীপুরের বিশাল কাঠামোটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

চোদ্দ

জামান একে একে রহস্যের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করছিল আর চারদিকে সব নির্বাক শ্রোতারা রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার কথা শুনছিল।

ড. রহমানের ড্রইংরুমে জুটেছিল প্রায় সবাই। আমন্ত্রণকর্তা ড. রহমান স্বয়ং। নুরবক্স অর্থাৎ নকল ড. রহমানের বন্দীশালা থেকে অবিশ্বাস্যভাবে অপ্রত্যাশিত মুক্তি পেয়ে সভ্যজগতের মানুষ আর একমাত্র আত্মীয় সাইদকে পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে তিনি ডিনারে আমন্ত্রণ করেছিলেন সবাইকে।

ডিনার সবেমাত্র শেষ হয়েছে। ড্রইংরুমে বসে কফি খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। প্রধান বক্তা জামান।

সাইদ আর সাদিয়া পাশাপাশি বসে জামানের কথা শুনছে। তাদের এক পাশে সিম্পসন, ড. রহমান আর কামাল। অদূরে বড় সোফাটায় লিলি, মহুয়া, লীনা আর শকি। আর একটা সোফায় শহীদ আর দারোগা মোজাম্মেল হক। তাদের একদিকে আজিজুল করিম অন্যদিকে হামিদ জালাল।

শহীদ একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট এগিয়ে দিলো মোজাম্মেল হকের দিকে। বললো, 'নিন, মি. কুয়াশা।' নিচু গলায় বললেও শহীদের কথা কানে গেল সবার।

হাসির হুল্লোড় উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। মোজাম্মেল হক লজ্জা পেয়ে আড়চোখে সিম্পসনের দিকে তাকালেন। সিম্পসন হাসি থামালেন।

মোজাম্মেল হক সিগারেট বের করতে করতে বললেন, 'কি যে ঠাট্টা করেন, মি. খান।'

শহীদ জামানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'মি. জামান, সবাই আপনার কথা শোনবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আপনি শুরু করে দিন।'

জামান কফির কাপটা ঠেলে দিয়ে বললো, 'আমি ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছিলাম লিলিকে উদ্ধার করার জন্যে। মিস রুবিনা রহমান হত্যা আসলে কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব। কিন্তু আপনাদের বোঝাবার সুবিধার জন্যে সেখান থেকেই শুরু করা উচিত।'

সিগারেট ধরালো জামান। ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'প্রথম থেকেই রুবিনার হত্যাকারী চেয়েছিল হত্যাকাণ্ডের সমস্ত সন্দেহ তার পূর্ব স্বামী মি. আজিজুল করিমের উপর চাপিয়ে দিতে। কারণ সেইটেই ছিলো সহজ। আর তার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে আততায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

'আততায়ী অসম্ভব রকমের ধূর্ত আর বুদ্ধিমান এবং নিজের বুদ্ধির উপর তার অসামান্য বিশ্বাস। যদিও সেই বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত তার সঠিক পরিচয় জানতে আমাদের সাহায্য করেছিল।'

সাকিয়া বললো, 'আচ্ছা নকল ড. রহমানই যে নুরবক্স তা আপনি কি করে বুঝতে পারলেন?'

জামান কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন চিন্তা করলো, তারপর বললো, 'নুরবক্স আর নকল ড. রহমান যে একই লোক তা বুঝতে আমার সময় লেগেছে অনেক। তবে তার আচরণ সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল প্রথম দিকেই।'

'কবে?' প্রশ্ন করলো আজিজুল করিম।

'রুবিনার খুনের পরের দিন যখন আহত ড. রহমানের সাথে দেখা করতে যাই তখন আমার মনে সন্দেহ দোলা দেয় কয়েকটি কারণে। ড. রহমান বললেন যে, রাতে ডাকাত তার ঘরে এসে তাকে মারপিট করে মারাত্মকভাবে আহত করেছে এবং রুবিনার বিয়ের অলংকার নিয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম যে তার স্লীপিং গাউনে রক্তের কোনও দাগ নেই। মনের মধ্যে সন্দেহ খচ খচ করে উঠলো। দ্বিতীয়তঃ ড. রহমানের ক্ষতস্থান থেকে ময়লা বের করার জন্যে যে পরিমাণ তুলো ব্যবহার করা হয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে মারপিট হলে ময়লা সাফ করার জন্যে অতো তুলো দরকার হতে পারে না। তাছাড়া ড. রহমানের ঘরে তার যৌবনের যে ফটো আছে তাতে নাকের বাঁ দিকে ছোটো একটা তিল ছিলো। নকল ড. রহমানের নাকের বাঁ দিকে সেই

তিলটা ছিলো না। আসল ড. রহমানের মুখের দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারবেন। কিন্তু নকল ড. রহমান আহত হয়েছিলেন একথা তো সত্য। তাহলে মারপিট নিশ্চয়ই তার এই ঘরে হয়নি, হয়েছে বাইরে কোথাও। কিন্তু কেন? আর বাইরে মারপিট হলে ড. রহমান মিথ্যার আশ্রয় কেন নিলেন? স্বভাবতই এই প্রশ্নগুলো আমার মনে এলো। এই সন্দেহের বশে ড. রহমানের···কিছু মনে করবেন না ড. রহমান, আমার বর্ণনার সুবিধের জন্যে নুরবক্সকে ড. রহমান হিসেবেই উপস্থাপন করতে হচ্ছে।'

ড. রহমান বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি বলুন।'

সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে জামানের কথা শুনছিল। কামাল অধৈর্য হয়ে বললো, 'চালিয়ে যান, জামান সাহেব।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ড. রহমানের রুম ভালো করে পরীক্ষা করার নাম করে আমি বাথরুমটাও দেখে এলাম। আশা করেছিলাম সেখানে রক্তমাখা কাপড় পাবো। পাইনি। পেলাম একটা ছোট্ট টেপ-রেকর্ডারের স্পুল।'

জামান পকেটে হাত গলিয়ে একটা টেপরেকর্ডারের স্পুল বের করলো। বললো, 'এটার ব্যাখ্যা পরে দিচ্ছি। আগে অন্য কথা বলি। রুম সার্চ করার আগেই আমি বাড়ির আঙিনা দেখতে গিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করি। আমি দেখতে পেলাম বাড়ির পেছনের দেয়ালের বিশেষ স্থান থেকে ভেতর বাড়ির দরজা পর্যন্ত ঘাসের ওপর এক-জোড়া পায়ের দাগ। খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম ঘাসের ওপর এমনভাবে আবছা একটা দাগ পড়ে আছে যা শুধু একদিন নয়, নিয়মিত চলাচলের ফলেই অমন হতে পারে। অর্থাৎ ওখান দিয়ে কেউ অনেক দিন ধরে হাঁটছে। ড. রহমান যে মিথ্যে কথা বলেছিলেন তাতো আগেই আমার কাছে ধরা পড়েছে। ফলে আমার ধারণা হলো হয়তো তিনিই ঐ পথ দিয়ে নিয়মিত চলাচল করেন। কিন্তু কেন? তার জবাব পরে দিচ্ছি।'

জামান থামলো। সিগারেট ধরালো আর একটা। ধোঁয়া ছেড়ে আবার শুরু করলো, 'মিস খোরাসানী একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। কথাটা হচ্ছে মি. আজিজুল করিম টেলিফোনে রুবিনাকে শাসানি দিতেন; কিন্তু সামনে এলে একেবারে কেঁচো হয়ে যেতেন। মিস খোরাসানীর কথায় আমার খটকা লেগেছিল। কারণ, একই লোক সামনে একরকম আর টেলিফোনে অন্যরকম কথা বলবে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কোথাও কিছু একটা কারচুপি আছে। ড. রহমানের বাথরুমে পাওয়া টেপরেকর্ডারের স্পুল সে সমস্যার সমাধান করে দিলো। স্পুলটা বাজিয়ে দেখলাম তাতে নানাভাবে মিস রুবিনাকে শাসানি দিয়ে অনেক কথা রেকর্ড করা আছে আর সে গলার স্বর ড. রহমানেরই। আর কারো নয়। ফলে ড. রহমানের

উপর সন্দেহ আমার বেড়ে গেল।

'এদিকে ড. রহমান আগেই অন্য চাল দিয়ে বসে আছেন। তিনি জানতেন মি. করিমের মারিজুয়ানার নেশা আছে। বস্তুতঃ এই নেশার ব্যাপার নিয়েই তাদের বিবাহিত জীবনে ছেদ নেমে আসে। মিস রুবিনা রহমানকে ইস্কাটন ক্লাবের যে কামরায় খুন করা হয় তার পিছনে সরু পথের উপর জানালার ঠিক নিচে মারিজুয়ানার একটা কৌটা পেয়েছিলাম আমি। আমি সেই সরু প্যাসেজে খোঁজ করার আগে মি. সিম্পসনও ওদিকটা ঘুরে এসেছেন চুপি চুপি। যদিও তিনি প্যাসেজের ভিতরে ঢোকেননি, কিন্তু যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে দেখেছেন সেখান থেকে কৌটোটা নজরে না পড়ে পারে না। তার অর্থ হচ্ছে মি. সিম্পসনের তল্লাশির পর আর আমার তল্লাশির আগে অর্থাৎ হত্যাকাণ্ডের অনেকক্ষণ পর সেখানে মারিজুয়ানার কৌটো ফেলে দেয়া হয়েছে। মি. করিমকে খুনী প্রতিপন্ন করার জন্যে তিনি এছাড়াও আরও এক চাল চেলেছিলেন। মি. করিম মিস রুবিনাকে সত্যিই ভালবাসতেন। তিনি আবার তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। ড. রহমান এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি কুয়াশার নাম ভাঙিয়ে মি. করিমের কাছে এক চিঠি লিখলেন। তার মূল বক্তব্য হচ্ছে মি. করিম যদি ইচ্ছে করেন তাহলে বিয়ের আসরে হামিদ জালালের সাথে বিয়ে ভেঙে দিয়ে তখন তখনই তাঁর সাথে মিস রহমানের বিয়ে হতে পারে। মি. করিম কুয়াশার অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাই আশায় আশায় বিয়ের দিন সন্ধ্যা থেকে ইস্কাটন ক্লাবের সামনে, I must say. বোকার মতো ঘোরাঘুরি শুরু করলেন তিনি। সাইদ মি. করিমকে দেখে ফেলে। ড. রহমানের চাল তখনকার মতো সফল হয়। মি. করিম প্রথমে আমার কাছে কোনও কিছু স্বীকার করতে না চাইলেও পরে সব কিছুই স্বীকার করতে বাধ্য হন। চিঠিটাও আমাকে দেন। অবশ্য সেই চিঠি আমাকে নুরবক্সেরও সন্ধান পেতে সাহায্য করে। হাতের লেখা দেখেই বুঝেছিলাম ঐ চিঠি কুয়াশার লেখা নয়। তার লেখা আমার চেনা। মি. সিম্পসনও আমার অভিমত সমর্থন করেন। তাছাড়া টেপরেকর্ডারে স্পুল, মারিজুয়ানার কৌটা আর আজিজুল করিমকে লেখা চিঠিতে ঠিক একই রকম আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল। অবশ্য চিঠিতে স্বভাবতই মি. করিমের আঙুলের ছাপও পাওয়া গিয়েছিল, আর তাতে আরও ভালো করে বোঝা গেল যে মারিজুয়ানার শিশিতে বা স্পুলে যে আঙুলের ছাপ ছিল তা মি. করিমের নয়। ফলে তাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলাবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন। ড. রহমানই যে রুবিনাকে হত্যা করেছে সে সম্পর্কে আমি তখন নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি।' জামান একটু থেমে আবার বললো, 'আমি আগেই বলেছি ড. রহমান আহত হয়েছিলেন তার বাড়ির বাইরে কোথাও। কিন্তু কেন? তার বাড়ির পেছন দিকে ঘাসের

উপর আবছা সরু দাগ কেন? আর কুয়াশাই বা সকালে কেন ডাক্তার সেজে তার ঘরে হানা দিয়েছিল? মিস রহমানকে হত্যা করা হবে তা কুয়াশাই বা জানলো কি করে? এসবের অর্থ হচ্ছে ড. রহমানের কার্যকলাপের দিকে কুয়াশার দৃষ্টি গভীরভাবে নিবদ্ধ রয়েছে। নইলে মিস রহমানকে যে ড. রহমান হত্যা করবেন তা তার জানবার কথা নয়। কিন্তু এই ইন্টারেষ্ট কেন কুয়াশার? প্রথম দিকে তার জবাব পাইনি। পেলাম পরে। লিলির অন্তর্ধানের রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে। কুয়াশা যে লিলিকে চুরি করেনি তা বুঝতে পেরেছিলাম সহজেই, কিন্তু এটাও অনুমান করেছিলাম যে কুয়াশাই এই কিডন্যাপারকে চেনে। কারণ, কুয়াশার আবিষ্কৃত আলট্রা-সোনিক্স পদ্ধতিতে জানালার শিক গলিয়েই লিলিকে চুরি করা হয়েছে। সাধারণ চোর-বাটপারদের ঐ পদ্ধতি জানবার কথা নয়। কিন্তু কিডন্যাপারের মোটিভটা বুঝতে পারলাম না। ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে গেলাম শফির সাথে। শফির কাছেই শুনলাম লিলিকে চুরি করবার কারণ। ওর কাছেই প্রথম শুনলাম নুরবক্সের নাম। নুরবক্স শফিকে হুমকি দিয়ে যে চিঠি লিখেছে তাতে বলা হয়েছে যে, সে-ই লিলিকে চুরি করেছে। শফি যদি কুয়াশার থিসিসের যে অংশ তার কাছে আছে সেটা নুরবক্সকে দিয়ে দেয় তাহলে লিলিকে ফেরত দেয়া হবে অন্যথায় লিলিকে খুন করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। আমি যেদিন সন্ধ্যায় শফির কাছে গেছিলাম সেই রাতেই থিসিসটা নুরবক্সকে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি আর শফি যখন এই নিয়ে আলাপ করছিলাম তখনি একটা ছায়ামূর্তিকে আবছা অন্ধকারে শফির ঘরের জানালার কাছে থেকে সরে যেতে দেখলাম। সেই মুহূর্তেই আমি ষ্ট্যাটেজী ঠিক করে ফেললাম। বেশ জোরে জোরে শফিকে বললাম, 'থিসিসটা নুরবক্সকে দিয়ে দাও।' শফি আমার ইঙ্গিত বুঝলো।

'সেই রাতেই সে নুরবক্সের লোকের কাছে যাহোক একটা কিছু গছিয়ে দিলো। গাড়ি করে চলে গেল ওরা। আমি মোটর সাইকেলে ওদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। ওদের গাড়ি চললো ওয়াইজ ঘাটের দিকে। নুরবক্সের আস্তানাটা চেনা গেল।'

কামাল বললো, 'কিন্তু আপনার মোটর সাইকেলের পেছনে আরও একটা মোটর সাইকেল ছিলো। জানেন?'

জামান বিস্মিত হয়ে বললো, 'নাতো! কে ছিলো সেই সাইকেলে?'

কামাল বললো, 'কুয়াশা স্বয়ং।'

জামান বললো, 'আশ্চর্য তো!'

ড. রহমান জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

'তারপর আর তেমন কিছু নেই।' শফির কাছে লেখা নুরবক্সের চিঠি আর মি. করিমের কাছে লেখা তথাকথিত কুয়াশার চিঠির হস্তলিপি, দেখা গেল, এক ও অভিন্ন।

সুতরাং আমার কনক্লুশন কি হতে পারে বুঝতেই পারছেন। আর এতেই বোঝা গেল কুয়াশা কেন ড. রহমানের চারদিকে অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে।'

ড. রহমান বললেন, 'নুরবক্স আগেই কুয়াশার থিসিসের একটা অংশ চুরি করে রেখেছিল। অবশিষ্ট অংশের জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিল। তার ইচ্ছে ছিলো হয় সে নিজেই অমরত্বের গবেষণা করবে, নয়তো অনেক দামে থিসিসটা বেচে দেবে বিদেশের কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছে।'

আজিজুল করিম বললেন, 'আশ্চর্য। নুরবক্স নির্বিঘ্নে কয়েকটা মাস আমাদের নাকের ডগায় ড. রহমান বলে নিজেকে চালিয়ে দিলো, আমরা বুঝতেই পারলাম না?'

জামান বললো, 'সেটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ কুয়াশার কাছ থেকে নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণের বিদ্যা নুরবক্স ভালোই আয়ত্তে এনেছিল। আর ড. রহমানকে অনেকেই চিনতো না। কারণ তিনি পনেরো বছর আগে বিদেশে গিয়েছিলেন; সাইদ আর রুবিনা তখন ছোটো। বৃদ্ধ শিল্পপতি হাফিজুর রহমানও তাঁকে চিনতে পারেননি।

তাঁর নিরুদ্দিষ্ট ভাই ফিরে এসেছে এই আনন্দে কিছু সন্দেহ করার অবকাশও তাঁর হয়নি। অথচ তিনিই হয়েছিলেন নকল ড. রহমানের প্রথম শিকার।'

সাইদ আঁতকে উঠলো। ড. রহমানও চমকে উঠলেন। সাইদ বললো, 'বলেন কি মি. জামান?'

জামান বললো, 'হ্যাঁ, he was the first victim. যদিও নিহত হবার আগেই তিনি তাঁর ভাইকে তাঁর ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রুবিনা আর সাইদকে তার ভাগ দিতে হবে এটা নুরবক্স সইতে পারেনি। তাছাড়া ধরা পড়বার আশংকা তো ছিলোই। তাই পথের কাঁটা দূর করবার জন্যে নুরবক্স নৃশংসভাবে হত্যা করলো রুবিনাকে। পরবর্তী শিকার ছিলো সাইদ। কুয়াশা তাকে রক্ষা করলো। কিন্তু নুরবক্স শেষরক্ষা করতে পারলো না। সে বুঝতে পেরেছিল যে তার পরিচয় আর জানতে কারো বাকি নেই। তাই সে ড. রহমানের খোলস ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। আর সাইদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে চুরি করলো সাদিয়াকে। আল্ট্রা-সোনিক্স দিয়ে জানালার শিক গলিয়ে শফি থিসিসের বদলে কতকগুলো আজেবাজে কাগজপত্র দিয়েছিল বলে রাগে উন্মত্ত হয়ে তাকেও ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবে আমার দুঃখ রইলো যে নুরবক্সকে এযাত্রা ধরতে পারলাম না হাতেনাতে। প্রাপ্য শাস্তি পাওনাই রয়ে গেল ওর।'

কুয়াশা ৯

এক

হোটেল শাহরিয়ার।

শহরের সর্বাধুনিক এগারতলা বিশিষ্ট বিলাস-বহুল হোটেল। হোটেলের কাফে শপ—'কাফে লায়লা।'

স্বপ্নে দেখা রংধনুর মতো সাত রং মাখানো পরিবেশ। অভিজাত ও বিলাসী নগরীর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। মোহনীয় পরিবেশে উচ্ছল নারী ও পুরুষ। দেশী-বিদেশী নর-নারী লোভনীয় পারিপার্শ্বিকতায় উপস্থিত। স্বচ্ছলতার অপূর্ব সমাবেশ। এখানে মদ আর উষ্ণ নারী দেহই সবচাইতে লোভনীয়। এ জায়গার মোহময় পরিবেশে বসে অনেকেই নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়।

'কাফে লায়লা'র উত্তর কোণের থামের আড়ালে যে ছোট্ট টেবিলটা, শহীদ সেখানে বসে পর্যবেক্ষণ করছিল। এ জায়গাটা শহীদের অত্যন্ত প্রিয়। সময় পেলেই একবার তার আসা চাই। ইদানীং সে শখের গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে যে সব ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়েছিল, তার অনেক ব্যাপারের সমাধান সে এখানে বসেই করতো।

তার দৃষ্টি গিয়ে থামলো মাথার উপরে। হলের মাঝখানে বিরাট ঝাড়বাতিটায় অসংখ্য হীরের টুকরোর মতো দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে, কত দাম হবে ওটার? শুনেছে, খাস্ মার্কিন মুল্লুক থেকে আমদানী করা হয়েছে ওটা হাজার পঁচিশেক খরচ করে। সেন্ট্রাল এয়ার কণ্ডিশন করা হলে বসে ভাবছিল শহীদ খান।

আলোর নিচেই অন্ধকার।

আজীবন এই আলো-আঁধারের খেলা দেখে আসছে শহীদ তার কর্মময় জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। কত প্রতিভার ভিতর পোকার মতো কিলবিল করতে দেখেছে জঘন্য মনোবৃত্তি। এখানে বসেও এই উচ্ছল জীবনের চলমান গতিতে দেখতে পায় বহু অপরাধ প্রবণতার ছাপ। আরও অনেক কিছু চোখে পড়ে, যা মেনে নিতে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে মন।

এমনি নানান কথা চিন্তা করছিল শহীদ খান। এমন সময় হলের ইনচার্জ 'মেতার দ্য-হোটেল' মি. উইভিং স্বয়ং হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো শহীদ খানের কাছে, ছোট্ট

রূপোর ট্রে'তে একখানা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে।

'গুড ইভনিং স্যার।'

'গুড ইভনিং!'

শহীদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হেড ওয়েটারের দিকে তাকায়।

'বিখ্যাত বিজনেস ম্যাগনেট ও ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মি. রশিদ আহমেদ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্যার।'

কণ্ঠে খানিকটা সম্ভ্রম ঢেলে কথা বলে হেড ওয়েটার মি. উইভিং। শহীদের এবার বিস্মিত হবার পালা।

'তিনি আমার সাথে দেখা করতে চান! কিন্তু কেন? আর আমি এখানে আছি, তিনি জানলেনই বা কিভাবে?'

'সে কথাও তিনি আমাকে বলেছেন। অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করা একান্তই দরকার। সে জন্যে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে খবর পেয়ে সোজা চলে এসেছেন এখানে। এখন এন্ট্রান্স করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

শহীদের দৃষ্টি চলে গেল এন্ট্রান্স করিডরের দিকে। বিরাট আয়না বসানো দরজার ভিতরের দিকে এসে দাঁড়িয়েছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পরনে তাঁর নিখুঁত সান্ধ্য পোশাক। সঙ্গে রয়েছে এক তিলোত্তমা। অপরূপ সুন্দরী, ঠিক যেন ভেনাসের প্রতিমূর্তি।

'যদি আপনি অনুমতি দেন স্যার, তাহলে...।'

'নিশ্চয়ই। আপনি ওদের নিয়ে আসুন আমার টেবিলে।'

কিন্তু শহীদের বিরক্তিভাব অপ্রকাশিত থাকলো না। রূপালী ট্রে থেকে দামী ভিজিটরস কার্ডখানা হাতে তুলে নিলো শহীদ, দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলো কার্ডটার উপর। লেখা আছে শুধু, "রশিদ আহমেদ"। গোল্ডেন এমবস্ প্রিন্টিং-এ নামটা জ্বলজ্বল করছে।

পরিচয়ের পালা শেষ করে, তিলোত্তমার পরিচয় করিয়ে দিলেন রশিদ আহমেদ। 'মিসেস রুনা আহমেদ, আমার স্ত্রী।'

তিলোত্তমা হাত বাড়িয়ে দিলো। পরিচ্ছন্ন আঙুলগুলো অনেক যত্নে ম্যানিকিউর করা। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি। পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলাম।'

মোলায়েম এক টুকরো হাসি উপহার দিলো তিলোত্তমা।

'বসুন।' শহীদ খান তাঁদের অভ্যর্থনা জানালো। ছোট্ট টেবিলটা ঘিরে বসে পড়লো সবাই।

শহীদ এবার ভালো করে লক্ষ্য করলো রশিদ আহমেদকে। ভদ্রলোকের চোখে মুখে এমন একটা কঠোর ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে যেন কর্তৃত্ব করাই তাঁর সহজাত অভ্যাস। এক কথায় বলা যেতে পারে 'গ্র্যানিট হার্টেড'। কিন্তু মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ছিল তাঁর চেহারায়।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল এমনি নীরবতায়। এবার শহীদ খান মুখ খুললো। 'কি

করতে পারি আপনাদের জন্যে।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। 'ইদানীং একটা সমস্যায় পড়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ছি। অনেক চিন্তা ভাবনা করে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। তবে বলাটা সময় সাপেক্ষ, যদিও ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। কখন আপনার সময় হবে জানতে পারলে সে সময় আপনার বাসায় গিয়ে দেখা করতাম।'

শহীদ খান দ্রুত চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, যতো শিগ্গির এদের কথা শুনে বিদায় দেয়া যায় ততোই মঙ্গল। তার এই সুন্দর সন্ধ্যাটা এরা এমনি করে মাটি করে দিলো।

'আপনার কথা সচ্ছন্দে এখানেই বলতে পারেন।'

ভদ্রলোক একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। তারপর চেয়ারটা আরেকটু টেনে নিয়ে ঘন হয়ে বসলেন। মিসেস আহমেদ তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন। শহীদ খানের বিরক্তি এর মধ্যেই চরমে উঠেছে।

'দেখুন আমি বিপদে পড়ে...।'

'আপনার বিপদটা কি তাই তো এখনও জানতে পারলাম না।'

'সে কথাই তো বলতে যাচ্ছি।'

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে দারুণ লজ্জা পেলেন।

'তাহলে গোড়া থেকেই শুরু করি শুনুন। সে আজ অনেকদিন আগের কথা। বাবা তখন বেঁচে আছেন। নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিলো তাঁর ব্যবসা। কর্ম উপলক্ষে প্রায়ই তাঁকে সামডিং থাকতে-হতো। সেখানে দু'টো কোলিয়ারীর মালিক ছিলেন তিনি। একবার কাছাকাছি জায়গায় তিনি আরও একটি কয়লা খনির সন্ধান পান, এক বিজন বনের ভিতরে। তিনি জায়গাটা জরিপ করার জন্যে তাঁর নিজস্ব সার্ভেয়ার পার্টি নিয়ে সেই বনে গিয়ে তাঁবু গাড়েন। এদিকে আবার শিকারে সখ ছিলো খুবই। জরিপ করার কাজে লোকজন লাগিয়ে দিয়ে, তিনি বন্দুক নিয়ে বেরোতেন প্রায়ই। এমনি একদিন বেরোলেন। শিকারের আশায় আরও গভীর বনে গিয়ে ঢুকলেন! পথ চলতে চলতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, হঠাৎ এক জায়গায় বনের ভিতর বেশ কিছুটা ফাঁকা মনে হলো।

'তিনি সামনের দিকে চাইলেন। তাঁর সম্মুখে ভেসে উঠলো পুরনো ধরনের এক বৌদ্ধ মন্দির। ভয়ানক কৌতূহল হলো তাঁর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। ভয় বলে কোনো বস্তু তাঁর জানা ছিলো না। কিন্তু এই বিজন বনে এমন মন্দির দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একটা প্রবল আকর্ষণ তাঁকে মন্দিরের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

'মন্দিরের সামনে খানিকটা পথ গুহার মতো। নিচে ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। দরজার দু'পাশে দু'টো সিংহমূর্তি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। ভিতরটা অন্ধকার। প্রথমে

কিছুই ঠাহর করা যায় না। কিন্তু বাবা অকুতভয়ে ঢুকে পড়লেন ভিতরে। এবার ধীরে ধীরে তিনি অন্ধকারে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। আরও ভিতরে এগিয়ে গেলেন তিনি। গলিপথটার শেষে একটা কুঠুরী দেখতে পেলেন। ঢুকবেন কি ঢুকবেন না চিন্তা করছিলেন, হঠাৎ অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ শুনতে পেলেন ভিতর থেকে। বুঝলেন কোনো মানুষ রয়েছে ভিতরে। তিনি উঁকি মেরে দেখতে পেলেন, অপরিসর একখানা ঘর। একপাশে কয়েকটা মাটির হাঁড়িপাতিল পড়ে রয়েছে। কিছুদূরে একটা মাটির কলস। অদূরে ছোট্ট একটা তাক, তার উপর একটা মৃন্ময় বর্তিকা জ্বলছে, কিন্তু তাতে ঘরের অন্ধকার দূর হচ্ছে না। মাঝখানে মেঝেয় একটা মাদুর বিছানো। তার উপর অস্থি-মজ্জায় কঙ্কালসার এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী শুয়ে ইষ্টনাম জপ করছে। মুমূর্ষু বৃদ্ধের অন্তিম অবস্থা।

'তাঁকে দেখে সন্ন্যাসী কাছে ডাকলেন। অনেক কিছু বলতে লাগলেন বাবাকে কিন্তু বাবা তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলেন না। হাতের ইশারায় বার বার ঘরের একটা কোণের দিকে ইঙ্গিত করতে লাগলেন। বাবা সন্ন্যাসীর নির্দেশ মতো সেই কোণটায় গেলেন। অনেক আবর্জনা ছড়ানো রয়েছে সেখানে। সেই আবর্জনার মাঝখানে হাতির দাঁতের কাজ করা একটা জড়োয়া বাক্স রয়েছে, দেখতে পেলেন বাবা।'

রশিদ সাহেব একটু থামলেন। টেবিলে দেয়া 'আমানটিলাডো' ওয়াইনে একটু চুমুক দিয়ে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আবার শুরু করলেন।

'বাক্সটা তিনি হাতে তুলে নিলেন। সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যেতে ইশারায় সেটা বাবাকে খুলতে বললেন। সেটা খুলতেই চোখে পড়লো, ভিতরে রয়েছে মণি-মাণিক্য খচিত একটা সুদৃশ্য ছোরা। ছোরার বাঁটে আঁকা ভীষণ চেহারার দুটো সাপের যুগল মূর্তি। বাবা চমকে উঠলেন। বাক্সের ভিতর আরেকটা জিনিস দেখতে পেলেন তিনি। পার্চমেন্ট পেপারে আঁকা একখানি ম্যাপের মতো কাগজ। একটা অজানা রহস্যে তাঁর মন ভরে উঠলো। সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে বাক্সটা নিয়ে চলে যাবার জন্যে আদেশ দিলেন। কিন্তু তবুও সন্ন্যাসীকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে যেতে বাবার মন সরছিল না। তিনি আমতা আমতা করে রয়ে গেলেন।

'হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর গোঙানীর শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে বুঝতে পারলেন না। এবার সত্যি বাক্সটা নিয়ে পালিয়ে এলেন। আর পিছন দিকে ফিরেও তাকালেন না। সেই থেকে বাক্সটা তাঁর কাছেই ছিলো। ভিতরের কাগজটার কোনো অর্থ তিনি অনেক চেষ্টা করেও বের করতে পারেননি। সে জন্যে বাক্সটা সিন্দুকে তুলে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হতো বাবা রাতে আতঙ্কে ঘুমোতে পারতেন না। সব সময় কেমন চমকে উঠতেন। বাবা মারা যাবার পর আমি

ওই অভিশপ্ত বাক্সটা যেমন ভাবে সিন্দুকে ছিলো ঠিক তেমনি ভাবে রেখে দিয়েছি।

'কিন্তু এরপর থেকে বাবার সেই আতঙ্ক আমায় পেয়ে বসলো। আমি বুঝতে পারলাম বাবা কেন রাতে ঘুমোতে পারতেন না। কেমন যেন পরিবেশটা ঘোলাটে হয়ে উঠলো। লক্ষ্য করলাম, কে বা কারা সব সময় ছায়ার মতো আমাদের বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। একটা বিষণ্ণ কান্নায় গভীর রাতে অনেক সময় আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। আতঙ্কে আমরা শিউরে উঠি।'

বলতে বলতে রশিদ সাহেব সত্যিই শিউরে উঠলেন। ওয়াইন কাপটা তুলে নিয়ে বাকিটুকু এক চুমুকে শেষ করে দিলেন।

'গতকাল রাতে আরেকটা ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছি। তখন রাত প্রায় দুটো। হঠাৎ একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। পায়ের কাছে কাঁচের জানালাটা বন্ধ। কিন্তু তার বাইরে বারান্দা থেকে একটা ভীষণ কুৎসিত মুখ জানালা দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

'ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠি। সেই চিৎকারে পাশের ঘরে আমার স্ত্রীর ঘুমও ভেঙে গেল। আবার একটা শব্দ হলো। সেই সঙ্গে ঝনঝন করে জানালার একটা কাঁচ ভেঙে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। ভীষণ মুখখানা হঠাৎ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। লোকজন উঠে এলো সব। কিন্তু খুঁজে আর কিছুই পাওয়া গেল না। এখন বলুন মি. শহীদ, আমি কি করবো?'

'এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি বলুন?'

'অনেক আশা নিয়ে আমরা আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি হয়তো এর একটা প্রতিকার করতে পারবেন।'

'দেখুন, এসব ব্যাপারে আমি আজকাল বড় একটা জড়াই না নিজেকে। ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে। তাছাড়া গোয়েন্দাগিরি একরকম ছেড়েই দিয়েছি।' শহীদ জবাব দিলো। 'আর তাছাড়া ইদানীং একটা বড় লট পাট কিনেছি রেলী ব্রাদার্সের কাছ থেকে। বেলগুলোর এক্সপোর্ট নিয়ে অনেক ঝামেলায় আছি। আপনি এক কাজ করুন না! বরঞ্চ পুলিসের সাহায্য নিন, ওরা আপনাকে অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবে।'

মি. আহমেদ একটু দমে গেলেন। তারপর বললেন, 'আমাকে আপনি নিরাশ করবেন না, মি. শহীদ। আপনি আমায় সাহায্য করুন, আমি আপনার সমস্ত পাট কিনে নেবো ডাণ্ডি মার্কেট রেটে। আর এক্সপোর্টের সমস্ত ঝামেলাও আমার ফার্ম নিয়ে নেবে। ওখানকার সি এণ্ড এফ ভ্যালুতে, আপনার সমস্ত টাকা পকিস্তানে আমার ডাণ্ডি এজেন্ট ট্রান্সফার করে দেবে। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে ইনভেষ্টিগেট করতে যা লাগে,

সমস্ত ব্যয়ভার আমি বহন করবো।'

'দেখুন, মি. রশিদ, আপনার ব্যাপারটা আমাকে ভেবে দেখতে হবে। আর তাছাড়া শখে আমি শারলক হোমস হয়েছি। গোয়েন্দাগিরি করে আমি টাকা নিই না কারও কাছ থেকে। প্রয়োজনের তুলনায় টাকা আমার যথেষ্ট আছে।'

এবার তিলোত্তমা মুখ খুললো। কড়া মেকআপ আর রঞ্জিত অধর সত্ত্বেও, মুখখানা তার করুণ দেখাচ্ছিল। কণ্ঠস্বর তার অনেকটা আর্তনাদের মতো শোনা গেল।

'প্লীজ, মিস্টার শহীদ, আরেকটু ভেবে দেখুন। ওই অলক্ষুণে বাক্সটা ঘরে রেখে ও নিজেও পাগল হচ্ছে, আমাকেও পাগল বানাচ্ছে।'

নারীর কমনীয় আহ্বানে শহীদের মতো কঠিন লোকের চিত্তবৈকল্য হলো না। শুধু বললো, 'এর আগে আমায় একটু ভেবে দেখতে দিন, মিসেস আহমেদ। আমি দু'এক দিনের মধ্যেই আপনাদের জানাবো কি করতে পারবো আমি।'

তবুও কৃতজ্ঞতায় মি. আহমেদ গলে গেলেন। মনে হলো, একটা গুরুভার তাঁর বুক থেকে নেমে গেছে।

স্টুয়ার্ড এসে ওদের ফ্রুট ককটেল ও মুলিগাতানী সুপ দিয়ে গেল। পাশ্চাত্যের উষ্ণ মিউজিক বেজে উঠলো স্টেরিওফোনিক রেকর্ড প্লেয়ার থেকে। ওয়ালজ-এর তালে তালে এগিয়ে এলো অনেকে জোড়ায় জোড়ায় মাঝখানের ফ্লোরে। হলের উজ্জ্বল বাতিগুলো ধীরে ধীরে নিবু নিবু হয়ে পাঁচ ওয়াটস-এ স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

দুই

এখন যেখানে পার্ক রো, এককালে সেখানে ছিলো নওয়াবদের ঘোড়ার আস্তাবল। ডি. আই.টি'র উন্নয়ন পরিকল্পনায় সেগুলো ঢাকার ম্যাপ থেকে চিরকালের মতো মুছে গেছে। শুধু রয়ে গেছে চুন্নু মিয়ার মাটকোঠা বাড়িটা। এককালে বারোটা ঘোড়া গাড়ির মালিক ছিলো চুন্নু মিয়া। তারই স্মরণ চিহ্ন হিসেবে ছেঁড়া একটা জিন্‌লাগাম এখনও দেয়ালের গায়ে ঝুলছে। ডি.আই.টি'র নোটিস পেয়েছে সে কবেই, কখন যে উঠে যেতে হবে তাকে সেই কথার জাবর কাটে চুন্নু মিয়া মোড়ের উপর দু'খানা টিনের ছাপড়া দেয়া চায়ের দোকানটায়। তার খানদানী রক্ত টগবগিয়ে ওঠে এ-সব অনাচারের কথা স্মরণ করে। তার কথায় অনেকেই সার্কাসের সঙ-এর মতো ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

কিন্তু পাড়াটার চেহারা যা খুলেছে, তা মনে রাখবার মতো। চুন্নু মিয়ার বাড়ির চারধারে প্রাসাদোপম বাড়িগুলো সুন্দর করে সেজেগুজে আছে, ঠিক যেন তার যৌবনের

গুলাবজান বিবির মতো।

বর্তমানে অভিজাত পল্লী এই পার্ক রো।

২৭২ নম্বর বাড়িটা অন্যান্য বাড়ির চেয়ে একটু স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী মি. রশিদ আহমেদ করেছেন এ বাড়িটা। পূর্ব–দীঘল বাড়ি মনের মতো সাজিয়েছেন তিনি আগাগোড়া ইটালিয়ান হোয়াইট মার্বেলে। ঝকঝকে বাড়িটা দেখলে মনে হয় যেন এই মাত্র শেষ হয়েছে এ বাড়ির কাজ।

ঝিরঝির বৃষ্টির অবিশ্রান্ত বর্ষণে চুন্নু মিয়া অনেকক্ষণ রাজা–উজীর মেরে অবশেষে বিরক্ত হলো। রাস্তার লাইটগুলো বৃষ্টির ঝাপটায় কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কিছুদূরের লোক মালুম হয় না। চুন্নু মিয়া ভাঙা ছাতিটা মাথায় দিয়ে ঘরমুখো হলো।

বিদ্যুৎ চমকে দেখা গেল বর্ষাতি গায়ে একটা ছায়ামূর্তি সেন্ট্রাল পার্কের দিক থেকে পার্ক রো–র ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। ফেল্ট ক্যাপটা মাথার উপর, চোখের নিচে পর্যন্ত নামানো। বর্ষাতির কলারটা উপরের দিকে উঠানো। চুন্নু মিয়া চকিতে একবার তাকালো ছায়ামূর্তির দিকে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। কোনদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চলেছে হন হন করে। আগের বাঁকে গিয়ে ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল, আর তাকে দেখা গেল না।

চুন্নু মিয়া নিজের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। নাহ্! মাটির দেয়ালগুলো অনেক জায়গায় ধ্বসে পড়েছে। জীর্ণ তাদের চেহারা। কিন্তু এককালে তো এমন ছিলো না। তার গুলাবীর তখনকার চেহারা মনে করতে চেষ্টা করে চুন্নু মিয়া। দরজার কড়াটা সজোরে নাড়া দেয় সে। অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধা গুলাবজান বিবি সদ্য ঘুমজড়িত চোখে উঠে এসে দরজাটা খুলে দেয়। চুন্নু মিয়া ভাঙা ছাতাটা বন্ধ করে তার দৌলতখানায় ঢুকে পড়লো।

•

মিসেস রুনা আহমেদ। মি. রশিদ আহমেদের দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রী। এককালে কলেজে পড়া সবচেয়ে স্মার্ট ও সেরা সুন্দরী রুনা।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে মিসেস আহমেদ মানুষজোড়া ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার সামনে। মেকআপবিহীন মুখে স্পষ্ট একটা ক্লান্তির ছাপ। চোখের কোণে গাঢ় কালিমা। কোমর পর্যন্ত ছড়ানো এলোচুলে দু'এক জায়গায় পাক ধরেছে। কতদিন আর সতেজ বাঁধনে বেঁধে রাখবে দেহটাকে। অজানিতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক ঠেলে।

রশিদ সাহেব এখনও ক্লাব থেকে ফেরেননি। ঘরে কড়া টিউব লাইটের আলোয় পরিবেশটা বড় জ্বালাময় মনে হলো তার। পাশে রাখা সাইড টেবিল থেকে কাটগ্লাসে ঢালা নির্জলা হুইস্কিটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দিলো মিসেস আহমেদ। গ্লাসটা একবার চোখের সামনে ধরলো। সেখানে তার চেহারাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে

আছে। তিক্ত হাসি হাসলো মিসেস আহমেদ।

এ জীবনের দেনা-পাওনায় সে দেউলে হয়ে গেছে। কি পেলো আর কি দিলো তার হিসেব করতে গিয়ে, জমার খাতায় শুধু শূন্যই পড়লো। রশিদ সাহেবের ভালবাসা সে পায়নি।

কখন যেন চোখের কোণে দু'ফোঁটা পানি টলমল করে উঠলো। উঠে গিয়ে কাঁচের জানালাটা খুলে দিলো। এক মুঠো ঝিরঝিরে হাওয়া তার চোখে মুখে এসে লাগলো। চেয়ে রইলো ওই আকাশের দিকে, যেখান থেকে বৃষ্টির অক্লান্ত বর্ষণে ধরণী শীতল হয়ে গেছে।

ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো ২৭২ নম্বর পার্ক রো-র পিছন দিকটায়। একবার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক দেখে নিলো। তারপর কাঁচের টুকরো বসানো দেয়ালের উপর উঠে গেল অবলীলাক্রমে। লাফিয়ে পড়লো ভিতরে কামিনী ঝোপটার পাশে। এক মুহূর্ত দাঁড়ালো সেখানে। তারপর এগিয়ে চললো সিঁড়ির দিকে।

রুনা আহমেদের রুমটা দেখা যাচ্ছে বাঁয়ের দিকে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আগন্তুক। কি যেন ভাবলো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে, তারপর ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকলো।

হাতটা জানালার বাইরে বাড়িয়ে দিলো রুনা আহমেদ। বাইরে বৃষ্টির ঝাপটা অনেকটা কমে এসেছে। চেয়ে দেখলো সামনের নিম গাছটায় শিরশিরে হাওয়া লাগছে, আর আন্দোলিত ডালপালা থেকে দু'চার ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছে নিচে।

হঠাৎ একটা ছায়া এসে পড়লো তার কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দেয়ালে। চমকে ফিরে তাকাবার আগেই একটা রেশমি ফাঁস এসে তার গলায় এঁটে বসলো। দু'হাত দিয়ে নিজের গলাটাই চেপে ধরলো রুনা। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ধীরে ধীরে রুনা আহমেদের চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ আর কোনদিন চাইবে না রুনা আহমেদ। মেঝের উপর ঢলে পড়লো সে।

গলার ফাঁসটা একবার দেখে নিয়ে আগন্তুক নিশ্চিন্ত হলো। তাকালো রুনা আহমেদের মৃতদেহের দিকে। তারপর এগিয়ে গেল ড্রেসিং টেবিলটার পাশে। ড্রয়ার ধরে টান দিয়ে দেখলো চাবির গোছাটা যথাস্থানেই আছে। নির্দিষ্ট দু'টো চাবি বেছে নিয়ে দেয়ালে গাঁথা আয়রন সেফের ডালাটা খুলে ফেললো সে। মনে হলো তালার কমবিনেশনটা বহু আগেই জানা।

ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বের করে আনলো ছোট্ট হাতির দাঁতের কাজ করা জড়োয়া বাক্সটা। বোতামে টিপ দিতেই উপরের ডালাটা খুলে গেল। এবার নিশ্চিন্ত

হলো সে। তার পর বাক্স বন্ধ করে রেইন কোটের ডান পকেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো সেটা।

কাজ শেষ হয়েছে ছায়ামূর্তির। এবার একটা সস্তা দামের সিগারেট বের করে ধরালো নিশ্চিন্ত মনে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো, জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে। দেয়াল টপকে পার হয়ে পিছনের রাস্তাটায় এসে দাঁড়ালো। একটু অপেক্ষা করলো। তারপর চলতে আরম্ভ করলো।

একটু পরেই রশিদ সাহেবের গাড়িখানা এসে থামলো সামনের গাড়ি বারান্দায়। ক্লাব থেকে ফিরছেন তিনি। টলতে টলতে উপরে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে। দূরে কোনো গাছে কর্কশ স্বরে একটা পেঁচা ডেকে উঠলো রাতের নীরবতা ভঙ্গ করে, নেহায়েৎ দুঃস্বপ্নের মতো।

সেই পেঁচার ডাক শুনে চুন্নু মিয়া চমকে উঠলো তার মাটকোঠা বাড়িটায়। জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকালো। বৃষ্টিটা এখন একটু ধরে এসেছে, কিন্তু আকাশের মুখ ভার। আবার চমকে উঠলো চুন্নু মিয়া। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখলো, সেই আগের দেখা ছায়ামূর্তিটা পার্কের দিকে চলে যাচ্ছে অত্যন্ত সন্দেহজনক ভাবে! একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় চুন্নু মিয়ার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

তিন

সকাল বেলায় ব্রেকফাস্ট সেরে শহীদ খান চায়ের পেয়ালাটা পাশের পিক টেবিলে রেখে, একখানা দৈনিক ইংরেজি কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলো।

'শোন।' মহুয়া এসে ঘরে ঢুকলো। সদ্যস্নাত এলোচুলে লাল ডুরে শাড়িটায় ওকে মানিয়েছে বেশ। শহীদ হাতের কাগজখানা পাশে রেখে দিয়ে এক দৃষ্টিতে মহুয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'কি দেখছো?'

'তোমাকে। যা সুন্দর মানিয়েছে তোমায় আটপৌরে শাড়িটা।'

লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওঠে মহুয়া।

'ভালো হবে না বলছি। অমন হ্যাংলাপনায় আমার লজ্জা করে না বুঝি? বলছিলাম কি, তোমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না কিছুদিন থেকে। সবাই মিলে কক্সবাজার ঘুরে এলে কেমন হয়?'

'তোমার ইচ্ছায় তো কোনদিন বাধা দিইনি মুহু।'

মহুয়ার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সামনের দেয়ালের উপর। সেই স... পা টাঙানো

রয়েছে সেখানে। হঠাৎ দৃষ্টিটা কেমন ঝাপসা হয়ে এলো মহুয়ার। একটি মাত্র ভাই, কিন্তু কোনদিন কাছে পেলো না আপন করে। কুয়াশার মতো চিরদিন আড়ালেই রয়ে গেল।

গফুর এসে বারান্দায় কাশি দিয়ে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করলো।

'কি রে, গফুর, তোর আবার কি চাই রে?'

'কিছু না দাদামণি। পুলিসের হক সাহেব এসে বসে আছেন। খুব নাকি জরুরী দরকার।'

'তাঁর জন্যে কিছু ব্রেকফাস্ট আর চা নিয়ে আয়। আমি এখুনি যাচ্ছি।'

শহীদ ড্রয়িং রুমে ঢুকে দেখলো, হক সাহেব তখনও বসেননি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন।

'কি খবর হক সাহেব? দাঁড়িয়ে যে—বসুন না।'

মোজাম্মেল হক এবার ধপাশ করে বসে পড়লেন বড় সোফাটায়। ককিয়ে উঠলো সোফাটা এতবড় গুরুভারের পীড়নে।

গফুর ব্রেকফাস্টের প্লেটটা এনে হক সাহেবের সামনে রেখে দিলো। মোজাম্মেল হক মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হলেন। পকেট থেকে বিরাট আকারের একটা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিলেন। ইদানীং হক সাহেবের পেটের পরিধি আগের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি বেড়ে গেছে। সেই অনুপাতে খাবার বহরটাও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। ভদ্রলোকের এহেন বিরাট বপু নিয়ে চলাফেরা করতে বেশ কুসরত করতে হয়।

হক সাহেব কিছু বলতে উদ্যত হলে শহীদ সরবে প্রতিবাদ করে উঠলো।

'আগে এগুলোর সদগতি করুন, তারপর শুনবো আপনার কথা।'

খুশি হয়ে হক সাহেব যুগপৎ সবগুলো খাবারের উপর এক সাথে আক্রমণ চালালেন। তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে দেখে গফুর কিচেন থেকে বাড়তি আরেকটা প্লেট এনে ধরে দিলো হক সাহেবের সামনে। হক সাহেব তখন একসাথে হাত ও মুখ চালাচ্ছেন। ব্রেকফাস্ট শেষ করে পুরো তিন গ্লাস পানি খেয়ে প্রকাণ্ড একটা ঢেকুর তুললেন মোজাম্মেল হক। এইবার চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে শহীদের মুখোমুখি হলেন তিনি।

'শহীদ সাহেব, আপনি নিশ্চয়ই বিখ্যাত মিলোনিয়ার রশিদ আহমেদকে চেনেন। তাঁর পার্ক রো'র বাড়িতে কাল রাতে কে বা কারা হানা দিয়ে মিসেস আহমেদকে হত্যা করেছে, অদ্ভুত উপায়ে খুন করা হয়েছে তাকে। আততায়ী সেই আগের দিনের ঠগীদের মতো রেশমী ফাঁস পরিয়ে তাকে হত্যা করেছে। সেই সঙ্গে উধাও হয়েছে সিন্দুক থেকে হাতির দাঁতের কাজ করা একটা বাক্স। ওতে নাকি কোনো গুপ্তধনের নক্সা ছিলো। টাকা

পয়সা খোয়া যায়নি।'

'বলেন কি, হক সাহেব!'

এবার শহীদের বিস্মিত হবার পালা। সে সোজা হয়ে বসলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেদিন 'কাফে লায়লা'য় দেখা মিসেস আহমেদের মুখখানি। কেমন একটা মোহময় আকর্ষণ ছিলো ভদ্রমহিলার। খানিকটা অনুশোচনায় তার মন ভারি হয়ে উঠলো।

'মি. সিম্পসন রওনা হয়ে গেছেন অকুস্থলে। আমাকে অনুরোধ করেছেন যাবার পথে আপনাকে খবর দিতে। আপনি গেলে আমরা সবাই খুব খুশি হবো।'

শহীদ উঠে দাঁড়ালো। সে যাবে বলে মন স্থির করেছে। 'একটু বসুন, হক সাহেব। আমি কাপড়টা বদলে আসি।'

২৭২ নম্বর পার্ক রো।

শহীদের ক্রিমসন কালারের ফোক্সওয়াগেনটা মৃদু গুঞ্জন তুলে রশিদ আহমেদের বাড়ির ড্রাইভওয়ে দিয়ে ঠিক পোর্চের নিচে এসে থামলো। ডিউটিতে যে সেন্ট্রি ছিলো, ওদের দেখে ঠকাস্ করে দু'পা একসঙ্গে এনে কড়া একটা স্যালুট দিলো। বিনয়ের সঙ্গে জানালো, মি. সিম্পসন দোতলায় মিসেস আহমেদের রুমে রয়েছেন। ওরা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলো। বাঁ'দিকের রুমে মি. সিম্পসনকে পাওয়া গেল।

ঘরে ঢুকতেই মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'আরে এসো, শহীদ। তুমি আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। কেস্টা খুব ইন্টারেস্টিং। খুন খারাবির সাথে গুপ্তধনের নক্সা পর্যন্ত আছে।'

'তাই নাকি।' শহীদ ছোট্ট একটা উত্তর দেয়।

'হ্যাঁ। ঠগীদের মতো রেশমী ফাঁস দিয়ে মিসেস আহমেদকে হত্যা করা হয়েছে। শ্বাস রোধ হওয়াতেই ভদ্রমহিলা মারা গেছেন। আমি ইন্কোয়েরী যা করার ইতিমধ্যেই করে ফেলেছি। ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট এসে সিন্দুকের গা থেকে কিছু ছাপ নিয়ে গেছে। তার রিপোর্ট আমরা পরে পাবো। তোমার যা দেখা দরকার, শহীদ, দেখে নাও। পরে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করবো।'

শহীদ একবার ভালো করে রুমটার চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। ভিতর দিকে একখানা পুরু গদীওয়ালা খাট। সুন্দর ম্যাচ করা বেড কভারে ঢাকা। একপাশে একই কালারের দামী সোফাসেট। উল্টোদিকে জানালার কাছে একটা বড় ড্রেসিং টেবিল। জানালার অপরদিকে উঁচু স্ট্যাণ্ডের উপর মাঝারি সাইজের পেতলের টব। ওতে কতক-গুলো রজনীগন্ধার ঝাড়। ফুলের আবছা একটা মিষ্টি গন্ধ থেকে থেকে নাকে এসে,

লাগছে।

মিসেস আহমেদের মৃতদেহটা জানালাটার পাশেই লাল কার্পেটের উপর পড়ে আছে। অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন মি. আহমেদ। অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত মনে হচ্ছিলো তাঁকে।

শহীদ মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলো।

গলার যে জায়গায় ফাঁস এঁটে বসেছিল, সরু একটা নীল দাগ সে জায়গাটা বেষ্টন করে আছে। চোখে মুখে একটা দারুণ আতঙ্কের ছাপ। দু'চোখের কোণে পানির একটা ক্ষীণ রেখা শুকিয়ে আছে। শহীদ পরীক্ষা শেষ করে বাইরে এসে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে নিচে নেমে কামিনী ঝোপের পাশে গেল। এক জোড়া গভীর পায়ের ছাপ দেখতে পেলো সেখানে। ছাপের গভীরতা থেকে আততায়ীর চেহারার খানিকটা হদিস পেলো সে।

গেট দিয়ে বের হয়ে বাড়ির পিছনটা একবার ঘুরে এলো। তারপর চন্নু মিয়ার মাটকোঠা বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা পায়ের ছাপ চলে গেছে বাড়িটার সামনে দিয়ে বড় রাস্তাটার দিকে। ঢাকার মাটি। শুকোলে পাথর, ভিজলে চিনে জোঁকের মতো জুতোর সাথে লেগে থাকে।

চুন্নু মিয়া বাজারের থলি হাতে সেই মুহূর্তে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো। সম্মুখে শহীদকে দেখতে পেয়ে লম্বা সালাম ঠুকলো।

'সালাম, হুজুর। মাটির দিক চাইয়া চাইয়া কি খুঁজবার লাগছেন?'

শহীদ এবার চোখ তুলে তাকালো চুন্নু মিয়ার দিকে। তাকে কাছে ডাকলো।

'এটাই বুঝি তোমার বাড়ি? বেশ, বেশ। তোমার নামটা কিহে?'

'বাপে আমার নাম রাখছিল, মিয়া চুন্নু, মাইনৃষে আমারে চুন্নু মিয়া কয়। বেবাক নাদানের দল।'

'জানো, মিয়া চুন্নু, কাল রাতে তোমার পাশের বাড়ির রশিদ সাহেবের বিবি খুন হয়েছেন।'

চুন্নু মিয়ার চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। 'কন কি সাব, এক্কেরে খুন? তাও আবার জানানা মানু—। তা হইবার বি পারে। বড় লোকের বাড়ির খবর আমরা রাখুম কেমনে।'

তারপর গলার স্বর খানিকটা নিচু করে বললো, 'হুজুর, কাইল রাইতে আমার ভি সন্দো হইছিল।'

'সেটা কেমন মিয়া চুন্নু?' শহীদ জিজ্ঞেস করলো।

'আপনে বুঝি পুলিসের লোক, এতো কতা জিগাইবার লাগছেন?'

'নাহে. আমি রশিদ সাহেবের বন্ধু লোক।'

'তাইলে আপনের কাছে কইবার পারি। কাল রাইতে বৃষ্টিডা যখন ধইরা আইলো, আমি চায়ের দোকান থেইকা বাড়িত আইবার লাগছি, দেহি এক জোয়ান মর্দ বর্ষাতি পইরা টুপি দিয়া মাথা ঢাইক্কা এই পথ দিয়া চইল্যা গেল, সাবের বাড়ির দিক। পরে বাড়িত ফিইর‍্যা যখন বৃষ্টিডা থামছে কিনা জানালা দিয়া দেখবার লাগছি, দেহি হেই বেডা, দৌড়াইয়া পার্কের দিকে যাইবার লাগছে। কেমন জানি তহনই আমার সন্দো লাগছিল।'

'ঠিক আছে, মিয়া চুন্নু, যদি দরকার পড়ে তবে তোমায় ডাকবো।'

'হ হুজুর, আপনেগর খেদমতের লাইগ্যাই এই চুন্নু বাইচ্যা আছে। আমার গুলাবী হেই দিন কইছিল…।'

চুন্নু মিয়া তাকিয়ে দেখে শহীদ ততক্ষণ অনেকদূর চলে গেছে। খানিকটা বিরক্ত হলো চুন্নু মিয়া। তারপর থলি হাতে বাজারের দিকে চলে গেল।

•

শহীদ আবার মিসেস আহমেদের রুমে প্রবেশ করে রশিদ সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'আচ্ছা মি. রশিদ, কাল রাতে আপনি কখন বাসায় ফিরেছিলেন?'

'আমি যখন ক্লাব থেকে ফিরে আসি, তখন রাত প্রায় পৌনে একটা।'

'তখন কোনো লোককে যেতে দেখেছিলেন রাস্তা দিয়ে?'

'জ্বি না!'

'তারপর?'

'রুনার রুমের পাশেই আমার রুম। এতো রাতে তার ঘরে বাতি জ্বলছে দেখতে পেয়ে দরজার সামনে দাঁড়াই। দরজা খোলাই ছিলো। কিন্তু রুনাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। হঠাৎ কার্পেটের দিকে নজর পড়তেই দেখলাম রুনা পড়ে আছে, ঠিক আপনারা যেমনটি দেখছেন তেমনি। সিন্দুকের ডালাটা খোলা। তখন আমার বুঝতে একটুও কষ্ট হলো না, ব্যাপারটা কি হয়েছে। হতভাগা বাক্সটার জন্যেই রুনাকে খুন করেছে।'

শহীদ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। মি. সিম্পসন শহীদকে বললেন, 'এবার লাশ মর্গে পাঠিয়ে দিই, কি বলো?'

'অবশ্যই। আর দেখার কিছু নেই।'

'তোমার কি মনে হয় শহীদ?'

'এখনও পুরোপুরি ভেবে দেখিনি। সময়ে আমি আপনাকে জানাবো। আচ্ছা এবার তাহলে চলি। গুড বাই মি. সিম্পসন।'

'গুড বাই মাই বয়।' মি. সিম্পসন হাত নাড়লেন।

শহীদের গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো কামালের গাড়ি বারান্দায়। এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে ড্রয়িংরুমের দরজার ভারি পর্দাটা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো শহীদ।

'কামাল কইরে?' শহীদ এবার হায়দারী হাঁক ছাড়লো।

কামাল সোফাটায় বসে এক প্যাকেট তাস নিয়ে পেশেন্স খেলছিল। শহীদকে দেখেই হাতের তাস মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উল্লাস ধ্বনি করে উঠলো।

'কিরে শারলক হোমস্, খবর কি তোর? এই অধম ওয়াটসন্ বেচারা তো বস্তাপচা আলুর মতো গুদামজাত হয়ে আছে।'

'খবর সাংঘাতিক রে, সেই খবরই তোকে দিতে এলাম। মিসেস রুনা আহমেদ বলে এক ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন গতকাল রাতে। সেদিন হোটেল থেকে ফিরে যে জড়োয়া বাক্সটার গল্প করেছিলাম, সেই ভদ্রলোক মি. রশীদ। রুনা আহমেদ তাঁর স্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে জড়োয়া বাক্সটাও আততায়ী নিয়ে গেছে। ঘটনাটা দেখলে মনে হয়, বাক্সটা নেবার জন্যেই আততায়ী মিসেস আহমেদকে খুন করেছে।'

'কিন্তু, শহীদ, একটা কথা পরিষ্কার হচ্ছে না। যদি বাক্সটাই শুধু আততায়ীর লক্ষ্য হতো তাহলে তো সে অন্য কায়দায়ও ওটা নিতে পারতো, সে খুন করবে কেন?'

'ধীরে, বন্ধু ধীরে! সহজ দৃষ্টিতে হয়তো সেই কথাটা মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যারা খুনী তাদের একটা সহজাত সংস্কার আছে। তারা সহজ সরল পথটাই বেছে নেয়। সে হয়তো বহুদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছে, সিন্দুকের চাবিটা কার কাছে থাকে, কোথায় থাকে। কম্বিনেশনের নম্বরগুলো কতো, রশিদ সাহেব কখন ক্লাব থেকে ফেরেন, খুনীর এ খবরগুলো নখদর্পণে। খুনের যে পাগল সে খুনকে আশ্রয় করেই অপরাধ করে বসে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, খুনী কে? তাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু তুই কি সত্যিই বিশ্বাস করিস ওই পার্চমেন্ট পেপারে গুপ্তধনের নক্সা ছিলো?'

'ছিলো নয়, সেটাই এক অজানা দেশের গুপ্তধনের নক্সা। অফুরন্ত ধনভাণ্ডার পাবার চাবিকাঠি।'

'কিন্তু শহীদ, ঘরের খবর কিছু রাখিস? মহুয়াদি কক্সবাজার যাবার জন্যে আমায় ভীষণ ভাবে ধরেছে। তুই কি ঠিক করলি। যাওয়া হবে তো আমাদের?'

শহীদ মাথা নাড়লো।

'এবার আর যাওয়া হচ্ছে কই? অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাপারটা যেভাবে আমার হাতে এসে গেল, এর একটা সুরাহা না করে কোথাও যাওয়া হচ্ছে না। তা না হলে ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যই থেকে যাবে।'

'থ্রি চিয়ার্স ফর শহীদ খান, হিপ-হিপ-হুররে। ওয়াটসন বেচারাও এবার হোমসের সঙ্গে ঝুলে পড়বে। দোস্ত তোর সঙ্গে যে আমি দোজখেও যেতে রাজি। দাঁড়া, এই খুশিতে তোকে আমি টিকিয়া খাইয়ে ছাড়বো।'

ঠিক সেই সময়েই গরম গরম টিকিয়া নিয়ে বয় ড্রয়িংরুমে ঢুকলো। শহীদের হাঁকডাক শুনেই কামালের মা টিকিয়া ভাজতে চলে গিয়েছিলেন। কারণ এ খাবার যে তাঁর দুই ছেলেরই খুব প্রিয়।

'হাত চালা, দোস্ত।'

কামালের আর তর সইছিল না। সে হাত লাগিয়ে দিলো টিকিয়ার প্লেটে। শহীদও বন্ধুর হস্তাঙ্ক অনুসরণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলো না। ততক্ষণে মা এসে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুর কীর্তিকলাপগুলো সন্তোষের সাথে লক্ষ্য করছিলেন।

চার

রাত্রি অন্ধকার।

কোনো অশরীরী অশান্ত প্রেতাত্মা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার রজনীতে। পেচকের অশুভ ডাক যেন প্রহর ঘোষণা করলো।

শফির চোখে ঘুম নেই। নুরবক্সকে সে ঠকিয়েছিল। অমরত্বের অর্ধেকটুকু থিসিস্ তার কাছে ছিলো। আজেবাজে জিনিস দিয়ে তাকে সে বুঝিয়ে দেয়। তার চালাকি নুরবক্স ধরে ফেলে তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। কিন্তু কুয়াশা আরও অনেকের সাথে তাকেও রক্ষা করে শয়তান নুরবক্সের হাত থেকে। শয়তানকে আজও খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু শফি জানে নুরবক্স আবার ফিরে আসবে বাকি থিসিসটুকুর জন্যে। তার আগেই উদ্ধার করতে হবে চুরি যাওয়া থিসিস।

কুয়াশা আসছে। এবার নুরবক্স তার বিশ্বাসঘাতকতা ও স্পর্ধার সমুচিত জবাব পাবে।

এমনি ভাবতে ভাবতে গভীর রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়লো শফি, নিজেও টের পেলো না।

পুবদিকের জানালা দিয়ে যখন কড়া রোদ এসে শফির শরীরে লাগলো, ঘুম ভাঙলো তার। ধড়মড় করে উঠে ঘড়িতে দেখলো ন'টা বেজে পাঁচ। বড্ড দেরি করে

ফেলেছে সে। সর্বনাশ! এখুনি ছুটতে হবে এয়ার পোর্টে। নেপালের যুবরাজ চন্দ্র আউধ সিং আসছেন, এগারোটা দশের প্লেনে। রিসিভ করতে হবে তাঁকে।

কোনরকমে শাওয়ার সেরে নিয়ে, দামী ট্রপিক্যাল অ্যান্টিক্রিজ স্যুটটা পরে নিলো শকি। গাড়ি বের করে ছুটলো এয়ার পোর্টের দিকে। ব্রেকফাস্ট করা আর হয়ে উঠলো না।

কাটমুণ্ডু থেকে যাত্রী নিয়ে পি. আই. এ'র ফকার ফ্রেণ্ডশীপ প্লেন এয়ার পোর্টের উপর দু'বার চক্কর খেয়ে শেষবারে নেমে পড়লো রানওয়েতে। টেক্সিইং পাথ বেয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ালো।

শকি অধীর আগ্রহে তাকালো প্লেনটার দিকে। স্টারবোর্ড এঞ্জিনটার শেষ গর্জন তখন থেমে গেছে। আণ্ডার ক্যারেজ এর চাকায় জ্যাম দিয়ে দিলো গ্রাউণ্ড মেকানিক। কুলীরা ঠেলে নিয়ে সুদৃশ্য গ্যাংওয়েগুলো প্লেনের গায়ে লাগিয়ে দিলো।

দরজাটা খুলে এয়ার হোস্টেস গ্যাংওয়ে বেয়ে নিচে এসে দাঁড়ালো।

একে একে যাত্রীরা সব নামতে শুরু করেছে।

নিপারের সানগ্লাস চোখে এক সুন্দর যুবক প্রথম শ্রেণীর গ্যাংওয়েতে এসে দাঁড়ালেন। নেপালের যুবরাজ চন্দ্র আউধ সিং। প্রেস ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরাগুলো ক্লিক্ ক্লিক্ করে সক্রিয় হয়ে উঠলো।

সব রকমের প্রটোকল ফরমালিটিজ্-এর দায় থেকে মুক্ত হবার পর যুবরাজ শকিকে দেখতে পেলেন।

'হ্যালো, শকি। কেমন আছো তুমি?'

শকি গলার স্বরটা একটু নিচু করে বললো, 'ও. কে., ভাইয়া।'

যুবরাজ শকির সাথে করমর্দন করে হাতে মৃদু চাপ দিলো। এরপর ওরা গাড়িতে উঠে বসলো। মিলন অ্যাভিনিউ পার হয়ে গাড়ি এসে ঢুকলো ঢাকার সবচাইতে অভিজাত হোটেল—শাহরিয়ারে। বিচিত্র কায়দা এই বিদেশী হোটেলটার।

কার অ্যাটেণ্ডেন্ট এসে দরজা খুলে ধরলো। ওরা নেমে মেইন এনট্র্যান্স পেরুবার সময় বিচিত্র বর্ণের জমকালো পোশাকে সজ্জিত ডোরম্যান মুঘলাই কায়দায় কুর্নিশ করে দরজা খুলে দিলো। বেল বয় লাগেজ নিয়ে চলতে আরম্ভ করলো পিছন পিছন।

চাঁদনী বার পার হয়ে পুল টেরাস্। ডাইনে ঢাকার একমাত্র ক্যাবারে 'রুকসানা হল।' আরেকটু এগোলেই সম্মুখে কাফে লায়লা। হোটেলের এসেম্বলী হল 'মিতালী'র পাশ কাটিয়ে লিফটে গিয়ে উঠলো ওরা।

সুইট নাম্বার ৯০০-১। ভি. আই. পি. সুইট। ভেতরে বাঁ'দিকে বেডরুম। একটা কনেক্টিং ডোর দিয়ে সামনে এগোলেই বিরাট ড্রয়িং রুম। ডান ধারে ছোট অথচ

আধুনিক সাজ–সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো ইলেকট্রিক কিচেন।

ড্রয়িং রুমে ঢুকে যুবরাজ দেখলেন একটা রুপার ট্রেতে সাজানো ফ্রুট বাস্কেট। ছোট্ট একটা কার্ড রয়েছে, সাজানো ফলগুলোর মাঝখানে। ওতে লেখা, 'ওয়েলকাম! উইশ ইউ হ্যাপি স্টে অ্যাট ঢাকা,' ফ্রুট বাস্কেটটা হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার মি. বার্লোজ–এর আন্তরিক উপহার। একটু হাসলো যুবরাজ। একবার তাকালো রুমটার চারদিকে। সুদৃশ্য বিচিত্র বর্ণের রকমারি পর্দা সরিয়ে দিলো যুবরাজ। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় বাইরে। মতিঝিলের সুউচ্চ বাড়িগুলো ছাড়িয়ে আরও দূরে শ্যামল আর সবুজের সমারোহ। দৃষ্টি চলে যায় আরও দূরে, একেবারে নদীর পাড় পর্যন্ত।

মুগ্ধ হলো যুবরাজ। বুক ভরে একটা আরামের নিঃশ্বাস টেনে নিলো।

'চমৎকার! বুঝলে, শফি, আপাততঃ এটাই হবে আমাদের হেডকোয়ার্টার। ডিনার, ডান্স, ভ্রমণ সব নিয়ে জমবে ভালো। মনে রেখো আমি এখন নেপালের যুবরাজ চন্দ্র আউধ সিং।'

শফি হেসে এবার কুয়াশার দিকে এক নজর ভালো করে তাকালো। নাহ! স্বয়ং সিম্পসন সাহেবও এ ছদ্মবেশ ধরতে পারবে না।

শফি সকালে ব্রেকফাস্ট করেনি, এবার ভয়ানক ক্ষুধা অনুভব করলো। কুয়াশা শফির মনের ভাব বুঝে নিলো। তার নিজেরও অত্যন্ত ক্ষুধা লেগেছে।

'এসো একেবারে লাঞ্চটাই সেরে নেয়া যাক, শফি।'

কুয়াশা রুম সার্ভিসে টেলিফোন করে খাবারের অর্ডার দিয়ে দিলো।

'Please Bring–Two Shrimp Cocktail

Two Double Consomme (soup)

Two Mushroom Omlette

Two Veal Oscar with Maionaise Sauce

Two Apple Tart

Two Coffee.

অর্ডারের এহেন বিরাট বহর দেখে শফি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো। ঠিক দশ মিনিটেই খাবার এসে হাজির হলো।

'এ যে, ভাইয়া, একেবারে দক্ষ–যজ্ঞ ব্যাপার। এতো খাবে কে?'

কুয়াশা এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, 'জানো শফি! একটা কথা আছে, "এনজয় দ্য মীল অ্যান্ড এলিভেট দ্য মাইন্ড"।যে পরিমাণ ক্ষুধা লেগেছে, ও খাবার তো

একেবারে নস্যি।'

এবার উভয়েই এক সঙ্গে হেসে উঠলো।

রুকসানা হল।

দেবরাজ ইন্দ্রের-প্রমোদপুরীও বোধহয় এমন অপরূপ বেশে সাজতে পারে না। ক্যাবারে চলছে। সুন্দরী ইরানী নর্তকী হোমায়রার নাচে মোহনীয় ছন্দ। হলের মাঝখানে বেশ খানিকটা কাঠের ফ্লোর। মেহগিনি কাঠের উপর মোম পালিশ দিয়ে গ্লেজ করা। লাইটের আলো পড়ে চক্ চক্ করছে। চারদিক ঘিরে ছোট ছোট টেবিল পাতা। গদি আঁটা কুশন চেয়ার পাতা তার চারদিকে। প্রত্যেক টেবিলের উপর একটি করে ক্যাণ্ডেলামব্রা অর্থাৎ মোমবাতিদান। তাতে মোমবাতি জ্বলছে। এর উপরে ব্রাস এর জাফরী কাটা আচ্ছাদন। মোমবাতির আলো সেই জাফরীর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে মায়াময় আলো আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টি করছে। ইরানী সুন্দরী নর্তকী হোমায়রার প্রতি পদক্ষেপে রম্বা শম্বার ছন্দ।

মাঝখানের দুটো টেবিলে দেশী-বিদেশী পার্টির মধ্যমণি হয়ে মি. সিম্পসনকে বসে থাকতে দেখে মৃদুহাস্যে কুয়াশার সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সিম্পসন শ্যাম্পেনের বারো ইঞ্চি লম্বা নলের মতো গ্লাস হাতে নিয়ে, একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছেন। তাঁর চোখে তখন রঙিন স্বপ্ন।

নাহ্! তার ছদ্মবেশ ধরা পড়েনি। এবার নিশ্চিন্ত হলো কুয়াশা।

হোটেল কামরায় তার বর্তমান হেডকোয়ার্টার্সে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে কুয়াশা উত্তেজনায় হঠাৎ একটা ঘুরপাক খেলো। চুরুটের ছাইটা সবেগে ঝাড়লো সামনের কনসিল্ড অ্যাশট্রেটায়, খানিকটা ছাই ছিটকে পড়ে অনেকদূর ছড়িয়ে পড়লো। তারপর অস্থির পদচারণায় জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

শফি চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে অদূরে বসেছিল। কুয়াশা ঘুরে দাঁড়ালো। যখন রেগে যায় কুয়াশা, এমনি ভঙ্গিতে দাঁড়ায় সে। দাঁতে দাঁত চেপে আত্মগত ভাবে বললো, 'নুরবক্স! এবার তোমার রেহাই নেই। তুমি আমার সাধনার ধন ছিনিয়ে নিয়েছো। তোমার একমাত্র দণ্ড—মৃত্যু। সেই মৃত্যুই আমি তোমাকে দেবো, চরম ভাবে। যে কেউ দেখবে, শিউরে উঠবে সে কথা স্মরণ করে।'

ক্ষুধার্ত শার্দুলের মতো কয়েকবার পদচারণা করলো কুয়াশা। শফির কাছে এসে দাঁড়ালো। একটা হাত রাখলো তার কাঁধের উপর।

'শোনো, শফি! নুরবক্সের খবর আমি পেয়েছি। আজ সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় তুমি রমনা গ্রীনের যে ধারটায় রমনা রেস্টুরেন্ট, তার বাঁ দিকের গেট দিয়ে ঢুকে আস্তে আস্তে লেকের দিকে চলে যাবে। ডান দিকের প্রথম বেঞ্চটায় যে লোকটা বসে থাকবে, তাকে তুমি ফলো করবে দূর থেকে। মুহূর্তের জন্যও যাতে চোখের আড়াল না হয়। সে যেখানে যাবে, তুমিও তার পিছু নেবে। এরপর তুমি নিজেই বুঝতে পারবে কি করতে হবে। আমার জন্যে ভেবো না। সবকিছুর উপরেই আমি নজর রাখবো।'

শফি কোনো কথা না বলে এবার নীরবে হোটেল ত্যাগ করলো। কুয়াশার চোখে-মুখে চূড়ান্ত সঙ্কল্পের ছাপ। একটা বিজাতীয় হাসি তার মুখে ঢেউ খেলে গেল। ডিকেন্টারে রাখা হোয়াইট হর্স-এর বোতল থেকে খানিকটা'র হুইস্কি ঢেলে নিয়ে কয়েকটা লম্বা চুমুক দিলো কুয়াশা।

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো কুয়াশা। সরোদখানা পেড়ে নিয়ে রাগ ভৈঁরো বাজাতে শুরু করলো সে। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো অপূর্ব সুরের মূর্ছনা।

পাঁচ

নারায়ণগঞ্জের যে সীমান্তে নিষিদ্ধ পল্লী, সেই গলির মুখে একটা বিরাট বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে বিগত যৌবনা এক দেহপশারিণী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে পানবিড়ির দোকান ফেঁদে বসেছে। বৃদ্ধ বয়সেও পলিত কেশে পাতা কেটে, দোক্তা খাওয়া মিশকালো দাঁত বের করে হেসে পান বিক্রির আসর জমিয়ে রেখেছে। এক শ্রেণীর লোক সব সময় সেখানে ভিড় জমিয়ে রাখে। পান খায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢিমে তেতলায়।

অনেক সুযোগ সন্ধানী, অনেক বারোয়ারী খবরের হদিস এই মুক্তকেশী পানওয়ালীর কাছে থাকে। অপরাধ জগতের বিস্তর খবর তার নখদর্পণে। এসব খবর চালাচালি করে বিস্তর পয়সাও কামায় সে।

তবে বিশ্বাসঘাতকতা করে না মুক্তকেশী। বোমা মারলেও তার পেটের সিন্দুক থেকে বেফাজিল একটা কথাও আরেকজনের কানে ঢুকবে না।

এজন্যেই মুক্তকেশীর উপর অনেকের আস্থা রয়েছে। সেজন্যে এক শ্রেণীর লোক আসে তার কাছে, হরহামেশাই। বিভিন্ন জেলার দাগি, খুনী আসামী, ফেরারী লোক, যাদের গোপন আশ্রয়ের দরকার, তারা মুক্তকেশীর গোপন আড্ডায় লুকিয়ে থাকতে পারে। পুলিসের সাধ্য নেই যে ওদের খুঁজে বের করতে পারে।

সবাই মুক্তকেশীকে তোয়াজ করে সেজন্যে।

বেলারানীর ঘর থেকে কুৎসিত দর্শন একটা লোক দরজার উপর দাঁড়ালো। বেলা ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আজকে এতো সকাল সকাল চললি?'

লোকটা একটা জঘন্য হাসি হেসে বললো, 'তু ঘুম যাস্, বেলা, আমার আসতে একটু দেরি হবেক বটে।'

বেলারানী আর কিছু বললো না। লোকটা রোয়াক ছেড়ে রাস্তায় এসে পড়লো। খানিক পরেই মুক্তকেশীর পানের দোকান থেকে একটা পান কিনলো।

মুক্তকেশী চারদিক দেখে নিয়ে গলাটা খাটো করে বললো, 'রামু! নুরবক্সকে হুঁশিয়ার থাকতে বলিস। কুয়াশা আর পুলিস দু'জনাই তার পেছনে লেগেছে। রকম সকম আমার ভালো লাগছে না।'

রামু মুক্তকেশীর আরও কাছে সরে এলো। 'তু কিছু চিন্তা করিস না, মুক্তা। কর্তার কাজ প্রায় শেষ। এবার বাসা ভাঙা হবেক।'

মুক্তকেশী মিশি দেয়া কালো দাঁত বের করে হাসে। 'ওস্তাদকে বলবি আমায় মোটা বকশিশ দিতে, না হয় ভালো হবে না তা বাপু আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।'

'সে আমি বলব'খন কর্তাকে। তুর চিন্তা নাই।'

রামু আর একনজর চারদিকে দেখে সোজা এগিয়ে গেল, গুলিস্তানের বাসটা যেখানে এসে দাঁড়ায়, সেখানে।

সাতটা বেজে পনেরো মিনিট। রামু রমনা লেকের ধারে বসে আছে একটা বেঞ্চে কর্তার অপেক্ষায়। নুরবক্স আসবে ঠিক সাড়ে সাতটায়। নিয়ে যাবে রামুকে তার গোপন আড্ডায়।

শফির 'টয়োটা করোনা' রমনা গ্রীনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটায় এসে থামলো। গাড়ি থেকে নেমে ধীরে ধীরে লেকের পাশে রমনা রেস্টুরেন্টে বৈকালিক চায়ের অর্ডার দিয়ে শফি লক্ষ্য করলো লেকের পাড়ের নির্দিষ্ট বেঞ্চটার দিকে।

হঠাৎ দেখতে পেলো রামুকে। রামু কুয়াশার অতীত দিনের একজন সহচর। তাকে চিনতে শফির একটুও ভুল হলো না। উত্তেজনায় শফি অধীর হয়ে একটু নড়েচড়ে বসলো। নাটকীয় একটা কিছু ঘটবার অপেক্ষায় সে উদগ্রীব হয়ে রইলো।

ঠিক সাতটা বেজে তিরিশ মিনিট। একটা দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো বেঞ্চটার দিকে। নুরবক্সের ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও শফি তাকে চিনতে পারলো।

শফি চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে, দ্রুতপদে বেরিয়ে এলো রেস্টুরেন্ট থেকে। কাছাকাছি একটা গাছের ছায়ায় আড়াল হয়ে দাঁড়ালো, যেন ওদের কথোপকথন শুনতে

পাওয়া যায়। উত্তেজনায় তার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠলো।

নুরবক্সকে দেখে রামু উঠে দাঁড়ালো। 'শোন, রামু!' নুরবক্সের কণ্ঠে যেন এক বিজাতীয় উল্লাস।

'আমাদের কাজ এখানে প্রায় শেষ। কিন্তু কুয়াশাকে যদি শেষ করে দেয়া যেতো তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে গুপ্তধনের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে পারতাম। যেখানে গুপ্তধনের খোঁজে আমাদের যেতে হবে, সে বড় দুর্গম পথ। তিব্বত মালভূমির অপর প্রান্তে লাসা। সেখান থেকে অনেক পশ্চিমে খামজং লেকের ধারে বার্তক। সেখানে যেতে হবে আমাদের।'

'কিন্তুক, কর্তা, এতবড় বিপদের ঝুঁকি না নিলে হতেক।'

ধ্বক করে জ্বলে ওঠে নুরবক্সের চোখ দু'টো।

'সাবধান, রামু! খবরদার! এমন নেমকহারামী কথা আর বলবি না, বললে জিব টেনে ছিঁড়ে দেবো। নুরবক্স ভঁয় কাকে বলে জানে না। সে গুপ্তধন আমার চাই-ই। সাত রাজার ধন ছেড়ে দেবো, এমন মূর্খ তুই আমায় ভেবেছিস?'

রামু ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বললো, 'আমি তা বলি নাইক, কর্তা। যাবেক যদি, রামু আপনার সাথেই থাকবেক। আপনি যেমনটি বলবেক, আমি তেমনটি করবেক।'

'হ্যাঁ! তাই যেন হয়, রামু। নেমকহারাম আর নিষ্কর্মা লোককে আমি চরম শাস্তি দিয়ে থাকি।'

'জো হুকুম, কর্তা।'

এর পরের কথাবার্তাগুলো এতো নিচু গলায় হলো যে শফি বুঝতে পারলো না।

ধীরে ধীরে ওরা রেস্‌কোর্সের দিকে এগুতে লাগলো। শফি ওদের ফলো করলো। রেসকোর্সের ফেন্সিং এর ধারে একখানা Contessa-de-luxe গাড়ি রাখা ছিলো। নুরবক্স রামুকে নিয়ে সেটায় চড়ে বসলো। গাড়ি চললো ময়মনসিংহ্ রোডের দিকে। শফিও তার টয়োটা করোনাতে গিয়ে বসে স্টার্ট দিলো। গাড়ি ওদের পিছন পিছন ছুটলো। কিন্তু ওরা কেউ লক্ষ্য করলো না, তৃতীয় আরেকখানা গাড়ি ছুটে চলেছে ওদের পিছু পিছু বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে।

টঙ্গি ব্রীজ পার হয়ে হানুফানগর। সেটাকে বাঁয়ে রেখে সোনাভানের গড়। গড়খাইয়ের উপর থেকে চলে গেছে একটা জঙ্গল অনেকদূর পর্যন্ত। কিছুদূর গিয়ে নুরবক্সের গাড়িটা সাঁ করে ডাইনে ঘুরে জংলা পথে ঢুকে গেল।

শফি বুঝলো, পথের এবার শেষ হয়েছে। সে গাড়ি পার্ক করলো বড় রাস্তার বাঁ ধারে, বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে। গাড়িটা লক করে চলতে লাগলো সেই পথে. যে পথে

নুরবক্সের গাড়িটা ঢুকেছিল।

গাঢ় অন্ধকার রাত; শফির গা ছমছম করছে। সম্মুখে ভয়ানক শত্রু, অথচ সে একা। পকেটে হাত দিয়ে একবার অনুভব করে নিলো পিস্তলটা। তারপর আবার চলতে লাগলো।

খানিকদূর গিয়ে দেখতে পেলো নুরবক্সের গাড়িটা, দাঁড়ানো। কিন্তু ধারে কাছে কাউকে দেখতে পেলো না।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে গাড়িটার পাশ কাটিয়ে খানিকদূর এগিয়ে গেল। সম্মুখে পথ বন্ধ। যাওয়ার রাস্তা হঠাৎ এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে। সে ঘুরে দাঁড়ালো। এক মুহূর্ত চিন্তা করলো, এবার কোন দিকে যাওয়া যায়। ডান দিকে যাবার জন্যে পা বাড়ালো শফি।

'হ্যাণ্ড স্ আপ, শফি!'

নুরবক্সের কঠিন গলায় চমকে উঠে শফি উপরে হাত তুললো, কিন্তু অন্ধকারে তাকে দেখতে পেলো না।

'বাঘের গুহায় পা দিয়েছিস, শয়তান, এবার তোর আর নিস্তার নেই। কুকুরের মতো গুলি করে মারবো তোকে।'

নুরবক্সের গলায় প্রচণ্ড উল্লাস! এক পা দু'পা করে এগিয়ে এসে শফির সামনে দাঁড়ালো সে।

'বড় আশা ছিলো, যে জাল পেতেছিলাম, তাতে কুয়াশা ধরা পড়বে। কিন্তু তোর মতো ছারপোকা মেরে হাত গন্ধ করতে হবে ভেবে ভয়ানক আপসোস হচ্ছে। একবার আমার হাত থেকে বেঁচে গেছিস, কিন্তু এবার সুদে আসলে তার মাশুল গুণে দিতে হবে।'

শফি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল; এবার দপ করে বারুদের মতো জ্বলে উঠলো। দেখলো নুরবক্সের হাতে ধরা পয়েন্ট থ্রি-টু ক্যালিবারের পিস্তলটা তার দু'চোখের মাঝখানে ধরা। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না।

'তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস, কিন্তু তোর সাধ্য নেই যে আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিস।'

'এতদূর স্পর্ধা!'

সক্রোধে ভীষণভাবে সে শফিকে দু'গালে কয়েকটা চপেটাঘাত করলো। তাতে টাল সামলাতে না পেরে শফি মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নুরবক্সের দু'পা জড়িয়ে এমন কৌশলে এক প্যাঁচ কষলো যে, নুরবক্স লাটুর মতো ঘুরে, শফির পাশেই ধপাস করে পড়ে গেল। হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে পড়লো দূরে।

নুরবক্সের শরীরে মত্ত হাতীর বল। শফির ব্যায়াম করা পুষ্ট শরীরটাকে সে নিজের আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শফি বাম মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে নুরবক্সও উঠে দাঁড়িয়েছে। উভয়ের চোখে হত্যার নেশা। নুরবক্স আর্তনাদ করে বসে পড়লো। তার বাঁ হাতটা মুচড়ে গেছে শফির জুজুৎসুর এক প্যাঁচে। এবার শফি ঝাঁপিয়ে পড়লো নুরবক্সের উপর। নুরবক্সের ডান হাতটা পিঠের নিচে পড়ে গিয়েছিল। শফি ওর বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে সাঁড়াশির মতো গলা চেপে ধরলো। নুরবক্স প্রাণপণ চেষ্টা করে তার ডান হাতটা ধীরে ধীরে বের করে কোমরের কাছে নিয়ে লুকানো ছোরাটা বের করে ফেললো। কিন্তু শফি বুটসুদ্ধ বাঁ পা দিয়ে ছোরাসহ ডান হাতের কব্জিটা মাড়িয়ে ধরলো। নুরবক্সের তখন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

এমন সময় শফির মনে হলো ভারি একটা কিছু পিছন দিক থেকে সজোরে আঘাত করলো তার মাথায়। জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

নুরবক্স বসে বসে তখনও হাঁপাচ্ছে। রামুকে হুকুম দিল, 'কুত্তাটাকে টেনে নিচে নিয়ে যা। পরে যা হয় করা যাবে।'

রামু দু'হাত দিয়ে একটা বিরাট পাথর খানিকটা সরিয়ে দিলো। একটা সুড়ঙ্গ পথ নিচের দিকে নেমে গেছে। টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চললো শফিকে সেই পথে।

মাটির নিচে গুহার মতো ঘর। ঘরটি বেশ বড়, অনেকটা হল ঘরের মতো। সেখান থেকে দু'দিকে দু'টো পথ চলে গেছে, উপরের দিকে।

ঘরের এককোণে খানিকটা জায়গা চৌকো করে কাটা। সেখানে একটা বিরাট আগুনের কুণ্ড জ্বালা হয়েছে। রামু ঘরের এককোণে রাখা কতগুলো অস্ত্রের মাঝখান থেকে দু'টো মোটা শিক বের করে আনলো। শিকগুলোর একটা দিক খুব সূঁচালো। ওই ধারটা রামু আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে শিকগুলো গরম করতে লাগলো। শিক দু'টো আগুনে ঝলসে লাল হয়ে উঠেছে।

'হতচ্ছাড়াটার চোখ দু'টো আগে গেলে দিবি রামু ওই শিক দু'টো দিয়ে। তারপর গলাটা ফুঁড়ে শিক দু'টো চালিয়ে দিবি—একেবারে কলিজায়। বাছাধনের কলিজা চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

নুরবক্স সক্রোধে বন্ধনরত শফির পাঁজরে এক লাথি মারলো। শফি ককিয়ে উঠলো।

রামু লোহার শিক দু'টো পরীক্ষা করে নিলো। উজ্জ্বল লাল উত্তপ্ত লোহার শিক

দু'টো থেকে সূর্য কিরণের মতো আভা বেরুচ্ছে। ভয়ানক উত্তপ্ত। দু'টো কাপড় দিয়ে রামু শিক দু'টোর অন্য ধার ধরেছে। নুরবক্স দু'হাত দিয়ে শফির মাথাটা তার হাঁটুর সঙ্গে চেপে ধরলো, যাতে শফি নড়াচড়া করতে না পারে। ওর হাত দু'টো পিছমোড়া করে বাঁধা। রামু ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো উত্তপ্ত শিক দু'টো নিয়ে। শফি চোখ বুজলো। এবার আর রেহাই নেই।

হঠাৎ রামু দু'হাত তুলে গগন বিদারী আর্তনাদ করে উঠলো। গরম শিক দু'টো ছিটকে পড়লো হাত থেকে। বুলেটটা ঠিক তার দু'চোখের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। তার দেহটা দুলে উঠলো। তারপর পিছনের অগ্নিকুণ্ডটার মধ্যে পড়ে গেল রামু। কাঁচা চামড়া পোড়ার গন্ধ মুহূর্তের মধ্যে চারদিক ছেয়ে গেল।

হতভম্ব নুরবক্স চকিতে শফিকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। কুয়াশার কোল্ট অটোমেটিকটা তার দিকে চেয়ে আছে। হাত দু'টো তার এমনিতেই উপরে উঠে গেল।

এতক্ষণ কুয়াশা একটি কথাও বলেনি। এবার গর্জন করে উঠলো।

'নেমকহারাম, কুকুর। যে বিশ্বাসঘাতকতা তুই করেছিস, তোকে হত্যা করে কুকুরের পেটে দিলেও তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। আমার থিসিস কোথায় রেখেছিস বল।'

'সে তুমি খুঁজেও পাবে না। আমার জান নিয়ে নাও তুমি, তবুও আমি ওটা তোমায় দেবো না।'

'তুই মনে করেছিস সেটা কোথায় রেখেছিস তা আমার অজানা?'

নুরবক্স কিছু বুঝবার আগেই, চকিতে ওর বাঁ চোখটা এক ঝটকায় খুলে নিলো কুয়াশা। কাঁচের চোখ। বাঁ চোখের লাল গর্তটা ভয়ানক দেখা যেতে লাগলো। নুরবক্স একচোখে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো।

'ওই আগুনের কুণ্ডটার পাশে গিয়ে দাঁড়া শয়তান, যেখানে তোর কুকর্মের সহচর রামুর মৃতদেহটা অঙ্গার হচ্ছে।'

নুরবক্স-একবার কুয়াশার হাতের কোল্ট অটোমেটিকটা, আরেকবার তার কঠিন মুখখানি দেখে সুবোধ বালকের মতো আগুনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। তাপে মনে হলো তার শরীরটা ঝলসে যাচ্ছে।

'নুরবক্স! এবার তোর রক্ষা নেই। তোকেও তোর সঙ্গীর কাছে পাঠিয়ে দেবো।'

'সে চেষ্টা আর করো না, কুয়াশা, ওরফে যুবরাজ চন্দ্র আউধ সিং।'

পিছনে মি. সিম্পসনের গলা শুনে কুয়াশা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কোল্টের অব্যর্থ লক্ষ্যটা তখনও নুরবক্সের দিকে তাক করা।

কিন্তু কি যেন চিন্তা করে কুয়াশার সারা মুখ মৃদু হাস্যে ভরে গেল। ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলো, কয়েকজন সেন্ট্রি তাদের ঘিরে রেখেছে। রাইফেলগুলো সব

এদিকে তাক করা।

'তারপর, কুয়াশা? এবার আশা করি তোমার খেলা সাঙ্গ হলো। নুরবক্স চেয়েছিল তোমাকে জালে ফেলে এখানে টেনে আনতে। শুধু এটুকু তোমার জানা ছিলো না, সব খবর আমরাও জানতাম। তুমি শফিকে কাজে লাগালে। আমরাও চোখ কান খোলা রেখেছিলাম। শফির উপর নজর আমাদের বরাবরই ছিলো। কিন্তু সত্যিই তোমায় ধন্যবাদ জানাতে হয়, কুয়াশা। তোমার এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ প্রথমে ধরতেই পারিনি।'

এবার কুয়াশা মি. সিম্পসনের কাছে এগিয়ে এলো। তাঁর হাতে নিজের কোল্ট অটোমেটিকটা তুলে দিলো। হাসিমুখে বললো, 'আমি আত্মসমর্পণ করছি, মি. সিম্পসন। আমি নিজে ধরা না দিলে, কিছুতেই আপনি আমাকে ধরতে পারতেন না। কিন্তু শয়তান নুরবক্স শফির যে অবস্থা করেছে, তাতে তাকে ফেলে আমি যেতে পারি না।'

'ব্রাভো, কুয়াশা! তোমার মহত্ত্বের জন্য তারিফ না করে পারা যায় না। তুমি শফির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দাও। নুরবক্স, তোমাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম অনেকদিন ধরে। এখন দয়া করে এদিকে এসে দাঁড়াও। আমরা যে প্রমাণ সংগ্রহ করেছি, তাতে তোমাকে রুনা আহমেদের হত্যার অপারাধে গ্রেপ্তার করলাম।'

কুয়াশা শফির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে আরম্ভ করলো। হঠাৎ সবার অলক্ষ্যে হাতের স্লিভের ভিতর থেকে একটা গোলাকার বস্তু বের করে আনলো। তারপর ছুঁড়ে মারলো মি. সিম্পসনের দিকে। শফিকে বললো, 'দম বন্ধ করে রাখো শফি।'

মি. সিম্পসন লাফ দিয়ে একদিকে সরে গেলেন, কিন্তু তার আগেই স্মোক বোম্বটা সশব্দে ফেটে গিয়ে একরাশ ধূম্রজালের সৃষ্টি করলো। সমস্ত ঘর অন্ধকার হয়ে গেল এক মুহূর্তেই। রাইফেল চালাবার কোন সুযোগই পেলো না সেন্ট্রিরা।

এই গোলমালের মধ্যে কুয়াশা আর নুরবক্সকে খুঁজে পেলো না। নুরবক্স তাহলে পালিয়েছে। কুয়াশা শফিকে তুলে নিঃশব্দে ওখান থেকে বের হয়ে গেল।

আধঘন্টা পরে মি. সিম্পসনের যখন জ্ঞান ফিরে এলো তিনি দেখলেন সেন্ট্রিরা তখন উঠে বসার চেষ্টা করছে। কুয়াশা, নুরবক্স বা শফি—কেউ নেই। শুধু রামুর দেহটা পুড়ে ততক্ষণে অঙ্গার হয়ে গেছে। বিশ্রী একটা চিমশে গন্ধ সারা ঘর ছেয়ে রয়েছে।

ছয়

মি. সিম্পসন আই. বি. হেড কোয়ার্টার্সে বসে [illegible] লেন। পরাজয়ের গ্লানিতে তিনি

মুষড়ে পড়েছিলেন। কুয়াশার সাথে বুদ্ধির খেলায় কখনও এঁটে উঠতে পারলেন না তিনি। বার বার হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও ফসকে বেরিয়ে গেল।

শহীদ খান মিসেস আহমেদের হত্যার ব্যাপারে খুনী কে বের করার জন্যে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সে যে লাইনে তদন্ত করেছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে মিসেস আহমেদের হত্যাকারী নুরবক্স। গুপ্তধনের নক্সাটা বের করার জন্যে সে মিসেস আহমেদকে খুন করেছিল। সমস্ত প্রমাণ শহীদ খান সংগ্রহ করে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল। তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও শুধু নিজের হঠকারিতায় সে ফসকে পালিয়ে গেল। তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলেন কই? উপরওয়ালার কাছে তাঁর এ ব্যর্থতার কি কৈফিয়ৎ দেবেন তিনি?

এমন সময় শহীদ খান তাঁর ঘরে ঢুকলো।

'হ্যালো, শহীদ! কেমন আছো?'

মি. সিম্পসন তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন শহীদ খানের দিকে। এমনিতেই কারো সাথে আলাপ করবার জন্যে তিনি মুখিয়ে ছিলেন। শহীদকে কাঁছে পেয়ে তাঁর মন অনেকটা প্রফুল্ল হলো।

শহীদ খানের হাতে ছোট্ট একটা চিঠি। মি. সিম্পসনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে চিঠিটা হাত বাড়িয়ে তাঁকে দিলো।

সিম্পসন চিঠিটা নিলেন। কুয়াশার চিঠি; শহীদ খানকে লেখা। সিম্পসন পড়তে আরম্ভ করলেন চিঠিটা।

প্রিয় শহীদ,

মি. সিম্পসনের হাতে আমি নুরবক্সকে তুলে দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে ধরতে গিয়ে নুরবক্সকেও হারালেন। তাকে আমিও ধরতে পারিনি। আমার স্মোক্ বোম্ব-এর ধোঁয়ার সুযোগে সে-ও পালিয়ে গেছে। কিন্তু যে গুপ্তধনের নক্সাটা ওর কাছে ছিলো সেটা আমি পেয়েছি। আমি আগেই জানতাম, তার বাঁ চোখটা ছিলো কাঁচের। সুতরাং সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু সে সেখানে Micro-Film করে রেখে দিতে পারে। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে ওর চোখটা খুলে নেই আমি। কিন্তু থিসিস্টা ছিলো না সেখানে। ছিলো গুপ্তধনের নক্সা।

নুরবক্সের কাছে হয়তো আরও কোন কপি আছে, সুতরাং তার আগেই কোটি কোটি টাকার গুপ্তধন উদ্ধার করতে হবে আমাকে।

চললাম। হয়তো নুরবক্সের সাথে, আবার দেখা হবে। সে সময় পর্যন্ত হতভাগার জন্য কঠিন শাস্তি তোলা রইলো।

যদি নুরবক্সকে ধরার মতলব থাকে, তবে সিম্পসনকে নিয়ে সোজা চলে এসো

বার্তক, তিব্বতের মালভূমিতে। কিন্তু সাবধান!

ইতি—

কুয়াশা।

মি. সিম্পসন চিঠিটা ভাঁজ করে শহীদ খানের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর বুক থেকে।

'A great personality—কুয়াশা। কিন্তু Dr.Jackyl আর Mr. Hyde-এর দ্বৈত মানসিকতায় জর্জরিত। নইলে এতো বড় বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা যার, তার পিছনে আমাদের পুলিসি অভিযান চালাতে হয়?'

শহীদ খান অপেক্ষা করে পরবর্তী ভাবধারার। মি. সিম্পসন বলতে লাগলেন, 'মিসেস আহমেদের হত্যাকারীকে পেয়েও আমি ছেড়ে দিলাম; কিন্তু তাকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। সেজন্য তিব্বত তো ঘরের কাছে, দক্ষিণ মেরুতেও অভিযান চালাতে রাজি।'

কথাটা বলে সিম্পসন একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতোই। শহীদ একথার কোনো উত্তর দিলো না। এতক্ষণ সে নির্বাক দর্শকের মতোই মি. সিম্পসনের একতরফা বক্তব্য শুনে যাচ্ছিলো। তিনি আবার আরম্ভ করলেন। 'সেদিন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাইনি ইচ্ছে করেই। ভেবেছিলাম কুয়াশার ব্যাপারে তুমি নিষ্ক্রিয় থাকবে। আর তাছাড়া দু'জনকে এক সঙ্গে গ্রেপ্তার করবার লোভটাও সামলাতে পারিনি।'

শহীদ এবার মুখ খুললো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা, মি. সিম্পসন—গুড বাই। নুরবক্স আমার চোখের আড়াল হতে পারবে না। খবর পেলে আপনাকে জানাবো।'

'গুড বাই।'

মি. সিম্পসন আন্তরিক ভাবে করমর্দন করলেন শহীদ খানের সঙ্গে। যে ভাবের বিনিময় হলো তাদের, উভয়েই নীরবে সেটুকু বুঝে নিলো।

শহীদ খান যখন তার ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলো, অনেক বিস্ময় তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

দেয়ালে টাঙানো সেই সরোদখানা পেড়ে নিয়ে কুয়াশা মারওয়া ঠাটে সোহিনী রাগের আলাপ করছিল একমনে। সুরের মায়াজাল অপূর্ব সুর লহরী তুলে যেন চারদিকের পারিপার্শ্বিকতার সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আর মহুয়া কুয়াশার পায়ের কাছে কার্পেটে বসে তন্ময় হয়ে সে মায়াজালে ধরা

পড়ে হরিণ শিশুটির মতো বিস্ফারিত নেত্রে মুগ্ধ হচ্ছিলো। গাল বেয়ে মহুয়ার দু'ফোঁটা চোখের জল যে রেখা সৃষ্টি করলো তাতে মনের ফাটল মিশে গিয়ে ভাই-বোনের মাঝে অলক্ষ্যে মায়ার এক অপূর্ব সেতু রচনা হলো।

শহীদ খান চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। ওদের ধ্যান আর ভাঙালো না। তৃপ্ত হলো মনে মনে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সুরের মূর্ছনা শেষ হয়ে গেল। কুয়াশা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। মহুয়ার আবেগ এতটুকুও কমেনি। গলার কাছে কি যেন একটা ওঠানামা করছিল।

'ভাইয়া!'

হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে মহুয়া জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো কুয়াশার পদতলে। ঝড়ের বেগে শহীদ খান ঘরে ঢুকে মহুয়ার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলো। নাড়ি ধরে দেখলো, পালস বিট্ অনেকটা কমে গেছে।

'Don't be nervous. my friend! তোমার ঘরে Atropine-dia-hydro-sulphate বলে কোনো মেডিসিন আছে নাকি?'

'হয়তো থাকতে পারে। ওই রুমে। ড্রেসিং টেবিলটার নিচের তাকে। সব রকম মেডিসিন আছে ওখানে। খোঁজ করে দেখো।'

কুয়াশা তড়িৎ গতিতে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। এক মিনিট পরেই নির্দিষ্ট অ্যামপিউল নিয়ে এলো কুয়াশা। অ্যামপিউলটার মাথা ভেঙে, দু'ফোঁটা তরল পদার্থ মহুয়ার মুখের ভিতর ঢেলে দিলো। তারপর আবার ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে বসলো।

'চিন্তা করো না শহীদ, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।'

মিনিট পাঁচেক পর জ্ঞান ফিরলো মহুয়ার। শহীদ এক মনে তাকিয়ে ছিলো তার মুখের দিকে। এবার চোখ মেলে চাইলো মহুয়া। মুখে একটা পরিতৃপ্তির ছাপ।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো শহীদ খান। মহুয়াকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

ড্রয়িংরুমে শহীদ কিছুক্ষণ পর আবার যখন ঢুকলো, কুয়াশা তখন তন্ময় হয়ে বসে আছে। দীর্ঘ চেহারা, প্রশস্ত ললাট আর উন্নত নাশায় এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। ভাস্বর এক জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে তার দিব্যকান্তি থেকে।

শহীদ ওর কাছের সোফাটায় এসে বসলো। এবার ধ্যান ভাঙলো কুয়াশার। 'খুব অবাক হয়ে গেছো শহীদ, তাই না? অনেক মানসিক আঘাত দিয়েছি তোমাকে। এবার তার পুরস্কারও কিছুটা দিতে চাই। যাবে তুমি আমার সাথে গুপ্তধন আবিষ্কারে? তাহলে

নুরবক্সকে তুলে দেবো তোমার হাতে। মি. সিম্পসনও খুশি হবেন। অন্ততঃ ভাববেন, কুয়াশা অকৃতজ্ঞ নয়।'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে ডিটেকটিভ শহীদ খান বললো, 'তোমার সাথে না গেলেও সেখানে আমায় যেতে হবে। কারণ নুরবক্সের এমন ক্ষমতা হয়নি, শহীদ খানের চোখে ধুলো দিয়ে আড়াল হতে পারবে। ওকে আমি ধরবই।'

কুয়াশা উঠে দাঁড়ালো।

'Good luck to you. Shahid. so long...' একলাফে কুয়াশা ঘরের বাইরে গিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

শহীদ বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। গেটের বাইরে একটা গাড়ির গর্জন উঠে ক্রমে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিলো। পিছনে টেইল লাইট দু'টো ছোটো হয়ে এসে এক সময়ে তা শেষ বিন্দুতে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ কার মৃদু করস্পর্শে শহীদ পিছন ফিরে তাকালো। মহুয়া এসে কখন তার পাশে দাঁড়িয়েছে সে টের পায়নি। 'চলো, ঘরে চলো।'

শহীদ মহুয়ার একখানা হাত ধরে ভারি কার্টেনটা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

কয়েকদিন পর।

শহীদের ক্রিমসন কালারের ফোক্সওয়াগেনটা এসে মি. সিম্পসনের অফিস গেটে ঢুকলো।

অফিস রুমে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বসেছিলেন মি. সিম্পসন। শহীদ রুমে ঢুকতেই তিনি উঠে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম, শহীদ। আমরা দু'চার দিনের মধ্যেই রওনা হচ্ছি। সেই মর্মে চীন সরকারকে এক টেলিগ্রামে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছে। Are you ready. Shahid?'

'Yes. Mr. Simpson.'

'সাথে কামালকে নিচ্ছো তো?'

'কামাল এবার আমাদের সঙ্গে যেতে পারছে না। ওকে একটা ছোট্ট অপারেশন করাতে হচ্ছে। ওর জন্যে সত্যি আপসোস হচ্ছে।'

মি. সিম্পসন টেলিফোনটা তুলে নিলেন। ডাকলেন তাঁর সহকারীকে। 'হ্যালো, তারিক! প্লেনের টিকিট বুক করা হয়ে গেছে? হয়নি—তাহলে আরও দু'খানা টিকিট বুক করে ফেলো একই সঙ্গে। ও. কে···।'

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে মদু হাসলেন মি. সিম্পসন। একটা কি যেন কৌতুকে চোখ

দু'টো তাঁর নাচতে লাগলো।

শহীদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো মি. সিম্পসনের দিকে।

সাত

ক্যান্টনগামী একখানা প্লেনে মি. সিম্পসন ও শহীদ খান Ist Class-এর ডান দিকের প্রথম সিট্‌টায় বসেছিল। মাইক্রোফোনে পাইলটের স্বর ভেসে এলো, 'Fasten your seat belts. please. The plane is going to take off.'

একজন দীর্ঘকায় ফ্লাইট স্টুয়ার্ড এসে সকলের বেল্ট বাঁধা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে গেল। মি. সিম্পসনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'Anything I can do for you. Sir?'

'No thanks.'

মি. সিম্পসন স্টুয়ার্ডের দিকে ফিরে না তাকিয়েই বললেন। স্টুয়ার্ডের মুখে সূক্ষ্ম একটা বিদ্রূপের রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

প্লেন তখন অনেক উপরে উঠে গেছে। শহীদ খান ভেলভেটের কোঁচান গাঢ় লাল রঙয়ের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে চাইলো।

পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ভিতর দিয়ে প্লেন চলেছে। মনে হলো, জানালা দিয়ে হাত বাড়ালেই মেঘকে ছোঁয়া যায়। শহীদ তার কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো রূপকথার রাজপুত্রের মতো। সে-ও যেন ঠিক তেমনি চলেছে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে রাক্ষসের দেশে, অসুরকুল নিধন করতে।

শহীদ নিচের দিকে তাকায়। নদীগুলো কতো ছোট্ট মনে হচ্ছে। পাহাড়গুলো যেন কতকগুলো পাথরের ঢিবি। একলাফেই পার হওয়া যায়।

মাঝে মাঝে দু'চারটে বাড়ি খেলাঘরের মতো সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে, ঠিক যেন কোনো শিল্পীর আঁকা নিখুঁত ছবি।

আসবার সময় মহুয়া অনেক কেঁদেছিল। তার এক কথা, দূর দেশে গিয়ে এতবড় বিপদের ঝুঁকিটা তার নিজের কাঁধে না নিলেই ভালো হতো। কিন্তু যেখানে কর্তব্যের বাঁধন তাকে ঘিরে রেখেছে, সেখানে দয়িতার ডাক তাকে পিছু টানবে কেন? তবুও মনের কোণে একটা কাঁটা খচ খচ করে ওঠে।

কামালের অপারেশনটা সাকসেস্‌ফুল ভাবেই হয়েছে, কিন্তু তার বেশ কিছুদিন

বিশ্রাম নেয়া দরকার। তার জন্য শহীদের মনটা কেমন যেন লাগছে। ওকে আনতে পারলে অ্যাড্‌ভেঞ্চারটা জমতো ভালো। কামাল যা ভালো জমাতে পারে!

কিন্তু যখন গফুর এসে সামনে দাঁড়ালো তার মনোভাব বুঝতে শহীদ খানের একটুও কষ্ট হয়নি। শহীদ খান যখন ঘরে ছিলো না, মি. সিম্পসনের টেলিফোনটা এসেছিল ঠিক সেই সময়ে। গফুর ধরেছিল ফোনটা। তাদের মধ্যে কি কথা হয়, শহীদ তা জানে না। কিন্তু সেদিন মি. সিম্পসনের অফিসে তাঁর রহস্যময় হাসির অর্থ পরে খুঁজে পেয়েছিল সে।

এদিকে শহীদ খান যতদিন ফিরে না আসবে কামাল থাকবে শহীদের বাড়িতে, আর তার মহুয়াদির দেখাশুনা করবে।

সেই কারণে গফুর সবদিক দিয়েই একেবারে নিশ্চিন্ত। তার গাম্ভীর্য দেখে শহীদের মনে হয়েছিল পাষাণকে টলানো যেতে পারে কিন্তু গফুরকে টলানো যাবে না। তার দাদামণিকে একেলা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সেই কোন্ বাহাত্তুরের দেশে যেতে হবে, আর সে খাঁচার মুরগীর মতো বাড়িতে বসে ছটফট করবে, সে কিছুতেই সহ্য হচ্ছিলো না গফুরের।

মিরপুরের দরগায় পাঁচশিকে মানতি দিয়ে অবশেষে একরাশ মালপত্র লাগেজে বুক করে যখন গফুর তার দাদামণির পিছন পিছন এসে টুরিস্ট ক্লাসে ঢুকলো, দেখে তার সীটটা দরজার পাশেই পড়েছে। সে খুশি হয়ে উঠলো। কিন্তু যখন পাশের সীটটায় একটি চাইনীজ মেয়ে হাসিমুখে এসে বসলো, গফুর মনে মনে ভয়ানক অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো।

গফুরের চীন সম্বন্ধে ভয়ানক একটা ভীতি আছে। এবং সেই ভীতি এখন কুসংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। গফুরেরও একটা নিজস্ব মতামত আছে 'যাহা চীন তাহা সযত্নে পরিহার করিও।' মেয়েটিকে প্রথম থেকেই সে সুনজরে দেখেনি।

কিন্তু সেই লম্বা লোকটির সাথে (ফ্লাইট স্টুয়ার্ড) তার বেশ ভাব হয়ে গেল। যখন তাকে খাবারের ডবল প্যাকেট দিয়ে গেল, গফুর ভাবলো লোকটা নেহায়েৎ মন্দ নয়।

ক্যান্টনে তাদের জন্য চীন সরকারের বিশেষ হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছিল তাদের পিকিং নিয়ে যাওয়ার জন্য। পিকিং-এ গুপ্ত পুলিস হেড কোয়ার্টার্সের সুপ্রীম কমাণ্ডার মি. চ্যাং ফু তাঁর বিশেষ দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ক্যান্টনে তাদের যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ট্রেনিংপ্রাপ্ত খ্যাতনামা ডিটেকটিভ মি. সিম্পসন ও শখের গোয়েন্দা শহীদ খান মি. চ্যাং ফু'র অফিস কক্ষে ঢুকে অপেক্ষা করছিল; অল্পক্ষণ পরেই মি. চ্যাং ফু অন্য দরজা দিয়ে সে ঘরে প্রবেশ করলেন।

অত্যন্ত সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি তাঁর বিদেশী কাউন্টারপার্টদের। শহীদ খানের সাথে করমর্দন করে বললেন, 'আপনার সুখ্যাতি অনেক শুনেছি, মি. শহীদ। আপনার প্রতিটি সাফল্যের সাথে আমরা পরিচিত। এদিকে আপনাদের জরুরী cable পেয়ে আমাদের সরকারের সম্মতিক্রমে বিশেষ ছাড়পত্র তৈরি করে রাখা হয়েছে আপনাদের নামে। মনে রাখবেন চীন সরকারের সামগ্রিক শক্তি আপনাদের পিছনে রয়েছে। সেজন্যে আপনারা বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না।'

মি. চ্যাং ফু তাঁর ড্রয়ার খুলে বিশেষ ছাড়পত্রখানা বের করে মি. সিম্পসনের হাতে দিলেন।

'আমাদের জনসাধারণ ও সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের এ সহযোগিতার জন্য অজস্র ধন্যবাদ,' মি. সিম্পসন যথাসম্ভব কণ্ঠ মোলায়েম করে, চূড়ান্ত ভদ্রতা বজায় রাখতে চেষ্টা করলেন।

মি. চ্যাং ফু Intercom-এর বোতাম টিপে কি যেন হুকুম দিলেন তাঁর দেশীয় ভাষায়। মিনিট দুই পরেই দেখা গেল তাদের টেবিলের উপর এসে গেছে রকমারি চীন দেশীয় খাবার। ওরা মি. চ্যাং ফু'র আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে গেল।

অনেক ধন্যবাদ বিনিময়ের পর যখন বেরিয়ে এলো, শহীদ দেখতে পেলো একজন ঢ্যাঙা মতন চীনাম্যান চকিতে দেয়ালের আড়ালে সরে গেল। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। মনে হলো লোকটাকে এর আগেও যেন কোথায় দেখেছে, কিন্তু মনে করতে পারলো না।

শুধু এটুকু বুঝতে পারলো, তাদের গতিবিধি অন্য পক্ষের হয়তো অজানা নেই। একটা নির্দিষ্ট ক্যাবে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের পিপলস্ হোটেলে। সেখানে চীন সরকার তাদের জন্যে রাজকীয় ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হলো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দু'জন চীনাম্যান 'শতপুষ্পের সিঁড়ি' নামীয় রাস্তা দিয়ে 'দেবদূত রোডে' এসে পড়লো। কিছুদূর চলার পর বাজারের ঘিঞ্জি এলাকায় গিয়ে ঢুকলো ওরা। রাস্তার একপাশে পুরানো জিনিসপত্রের দোকান (Curio Shop)। তারা দাঁড়িয়ে সামনের ফেরিওয়ালার কাছ থেকে সূর্যমুখীর বিচি কিনে খেলো।

ওরা দোকানে ঢুকতেই দোকানী তাদের দেখে অভিবাদন জানালো। একজন চীনাম্যান পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে দোকানীর চোখের সামনে ধরলো।

ছোট্ট একটা গলি। দু'জন একসঙ্গে পার হওয়া যায় না। দোকানী ওদের পথ

দেখিয়ে নিয়ে চললো। কিছুদূর গিয়েই ডানদিকে একটা সিঁড়ি। সিঁড়িটা অন্ধকার। দোকানী সেই সিঁড়ি দিয়ে অন্ধকারে উপরের দিকে মিলিয়ে গেল।

আগন্তুক চীনাম্যান দু'জন অন্ধকার হাতড়ে উপরে উঠতে লাগলো। কিছুদূর ওঠার পর ওরা দেখলো অন্ধকার একটু তরল হয়ে এসেছে। দোকানী বাঁ দিকের একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা কাগজের লণ্ঠন দরজার উপরে ঝুলছে, মৃদু আলো অন্ধকার দূর করবার ব্যর্থ চেষ্টা।

দরজায় তিনবার টোকা মারলো দোকানী। ভিতর থেকেও তেমনি তিনটে টোকার শব্দ পাওয়া গেল। তারপর নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধ চীনাম্যান।

আগন্তুকদ্বয় বৃদ্ধকে নীরবে অভিবাদন জানিয়ে ভিতরে ঢুকলো। ছোট্ট অপরিসর কক্ষ। একটা ভাঙা তক্তপোষ একপাশে রাখা। দু'টো পুরানো চেয়ার আর তার পাশে ছোট্ট একটা টেবিল। টেবিলের উপরে রঙ-বেরঙ কাগজের একটা চাইনীজ লণ্ঠন ঝুলছে। আগন্তুকদ্বয় যখন ভিতরে ঢুকলো, দোকানী দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে আবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

বৃদ্ধ চীনাম্যান আগন্তুকদ্বয়কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন।

'ব্রাভো মি. সিম্পসন, ব্রাভো মি. শহীদ। এ যে একেবারে আস্ত চীনাম্যান হয়ে গেছেন দেখছি। কে বলবে আপনারা চীনা বাপ-মায়ের ঘরে জন্ম নেননি। একেবারে চমৎকার হয়েছে ছদ্মবেশ।'

'সে তো আপনাদেরই বদৌলতে,' ,শহীদ ফোড়ন কাটলো।

ছদ্মবেশী পুলিস চীফ মি. চ্যাং ফু চারপায়াটার উপর গিয়ে বসলেন। ওরাও চেয়ার দু'টো দখল করে নিলো।

'এবার আমরা নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা করতে পারবো।'

মি. চ্যাং ফু পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন। একটা রুট ম্যাপে পরিচ্ছন্ন ভাবে যাত্রার বিশেষ বর্ণনা দেয়া রয়েছে। মি. সিম্পসন ও শহীদ খান ম্যাপটার উপর ঝুঁকে পড়লো।

মি. চ্যাং ফু এবার একটু কেশে বলতে আরম্ভ করলেন, 'আমরা যাত্রীবাহী রেগুলার কনভয়ে, সাধারণ নাগরিক হিসাবে চীন সীমান্ত পার হয়ে যাবো। তারপর আরম্ভ হবে আমাদের দুর্গম পথ। সেই পথ ধরে আমাদের যেতে হবে লাসা।

'আমাদের আগামীকাল রওনা হতে হবে। পিকিং থেকে কনভয়ে আমরা প্রথমে যাবো ইয়ান, সেখান থেকে চেং টু। তারপর কানটিং হয়ে বাটাং। ওখানে আমরা

কনভয় ছেড়ে দেবো। মিটার গজ টেনে আমরা যাবো চাঙো। চাঙোর খানিক পরেই সীমান্ত। মাঝখানে পড়বে সালোঘিন নদী। প্রচণ্ড স্রোত সে নদীতে। ওখানে আমাদের একদিন বিশ্রাম নিতে হবে।

'যে জায়গায় আমরা যাচ্ছি সেটা হলো ভারত সীমান্ত থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে। বিখ্যাত মানস সরোবরের ধার ঘেঁষে এক গিরিবর্ত সোজা চলে গেছে উত্তর দিকে' যেখানে গিয়ে শেষ হলো, জায়গাটার নাম বার্তক। সেখানেই সব রহস্য ঘনীভূত হয়ে আছে।

'কিন্তু একটা জিনিস আপনাদের সাবধান করে দিতে চাই। বার্তক-এর লোক এক শ্রেণীর হিংস্র পাহাড়িয়া। ভয়ঙ্কর সে সব লোক। তাউ সম্প্রদায় হলো ওদের দীক্ষাগুরু। চীন সরকারকে ওরা স্বীকার করে নেয়নি। অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা ওদের কাবু করতে পারিনি। সুতরাং আমরা চাই ওদের কিছু শিক্ষা দিতে। সে জন্যে আপনাদের যতদূর সাহায্যের প্রয়োজন সেটা আমরা দিতে কুণ্ঠিত হবো না। যে গুপ্তধনের নক্সা নুরবক্স বা কুয়াশার কাছে আছে, সেটা ওই জায়গারই কোথায়ও হবে। কিংবদন্তী আছে, সেখানে তাউয়ের মন্দিরের নিচে কোনো বিশেষ জায়গায় এতো ধনরত্ন লুক্কায়িত আছে যেটা ওরা বংশ পরম্পরায় রক্ষা করে আসছে। যুগ যুগ ধরে ওরা দস্যুবৃত্তি করেছে, হত্যা, লুণ্ঠন করেছে একাদিক্রমে। কতো জনপদ ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে, ইতিহাসের পাতায় তার সাক্ষী নেই। জায়গাটা এতোই সুরক্ষিত যে সহজে কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। কোনো অজানা লোক বা কোনো বিদেশী কাউকে দেখতে পেলে ওরা নির্মমভাবে হত্যা করে।

'এখন কথা হচ্ছে নুরবক্স বা কুয়াশাকে ধরতে হলে, শুধু তাদের বিরুদ্ধে নয় গোটা তাউ সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বুদ্ধির লড়াই করতে হবে। না হলে সেখানে গিয়ে পৌছুতে পারা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।

'আর একটা স্ট্র্যাটেজি আমাদের নিতে হবে। লাসায় তাউ সম্প্রদায়ের বহু লোক ছড়িয়ে আছে। এরাই খবর আদান প্রদান করে বাইরের জগতের সাথে। কোনো লোক বার্তকের দিকে চলতে আরম্ভ করলেই সমস্ত পথে বার্তাটা তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। সে লোক শেষ পর্যন্ত হয়তো বার্তকে পৌছুতে পারে না। রাস্তায়ই শেষ হয়ে যায়।'

মি. চ্যাং ফু এবার একটু থামলেন। কুঁজো থেকে খানিকটা পানি ঢেলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিলেন। তারপর চীন দেশের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সিগারেট বের করে ওদের অফার করলেন, নিজেও একটা ধরালেন। বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'স্ট্র্যাটেজিটা হলো, লাসায় আমাদের জন্যে একটা হেলিকপ্টার থাকবে। আমরা সোজা বার্তকের দিকে না গিয়ে এমন ভাব দেখাবো যেন আমরা ফিরে

যাচ্ছি পিকিং-এ। কিন্তু আমরা ঘোরা পথে নেপাল সীমান্তের ধার ঘেঁষে মানস সরোবরের কাছে নামবো। তারপর আরম্ভ হবে আমাদের সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার।'

'Let us hope for the best, Mr. Cheng Fu.,' মি. সিম্পসন তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন।

'I do hope so.' অপর পক্ষের উত্তর এলো।

এরপর ওদের শলাপরামর্শ চললো অনেকক্ষণ ধরে। রাত তখন গভীর হয়ে এসেছে, হঠাৎ দোকানী দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো। কয়েকটা ক্যারিয়ারে তাদের জন্যে রকমারি খাবার নিয়ে এসেছে। নৈশ ভোজের বিপুল আয়োজন দেখে ওরা এবার সেদিকে মনোযোগ দিলো।

আট

মানস সরোবর।

গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মাতৃ জঠর।

হিন্দু পুরাণে কথিত আছে, এই জায়গায় আছে স্বর্গের সিঁড়ি। যেখান থেকে গঙ্গা নেমেছে তার বাহনে চড়ে, ভগীরথের আকুল আহবানে। দুকূল প্লাবিত করে ভারতবর্ষকে করেছে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। ওদিকে ব্রহ্মপুত্র শতনামে গরীয়ান হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে বহু জনপদ বিধৌত করে।

ভারত সীমান্ত পার হয়ে নেপাল। যেখানে নেপালের শেষ সেখানে তিব্বতের আরম্ভ। ঠিক পঞ্চাশ মাইল উত্তরে এই সরোবর। পাহাড়ের দেশে সমতল জলাভূমি। বিশাল সরোবরের স্নিগ্ধ পানি টলমল করছে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ সে পানি। সুউচ্চ পর্বত চূড়া দিয়ে ঘেরা সমতল প্রদেশ। দূরে নিচে অরণ্যরাজি বিরাট বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কতো রকম রঙ-বেরঙ-এর পাখিরা জলকেলী করছে হ্রদের বুকে। কোথাও লাল, কোথাও নীল আবার কোথাও সবুজের মেলা সুদূর বিস্তৃত এই সরোবরে। আকাশের নীলের প্রতিচ্ছবি সেই স্বচ্ছ পানিতে। সুন্দর একটা নীলাভ পরিবেশ গড়ে উঠেছে চারপাশে, যেন ধ্যানমগ্ন কোনো যোগী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে যুগ-যুগান্ত ধরে।

পড়ন্ত রোদের অপরাহ্নিক আসর জমে উঠেছে হ্রদের চারদিকে। ক্ষীণ একটা কুয়াশার প্রলেপ মেখে, বিচ্ছুরিত সূর্যের আলোকে, নব বধূর মতো অবগুণ্ঠন তুলে দিয়ে বসে আছে মানস-প্রতিমা। চারদিকের তুষারমাখা পর্বতে একটা শুভ্র শুচিতার পরশ। যেন স্বয়ম্বর সভায় রাজকুমারীকে মাঝে বসিয়ে অনেক দেশের রাজপুত্তর করছে

কানাকানি।

হঠাৎ মৌমাছির মতো একটা গুঞ্জন ধ্বনি ভেসে এলো দূর থেকে। কলুষিত করলো মানসের অখণ্ড নীরবতাকে।

ছোট্ট একটা ফোর-সিটার হেলিকপ্টার দক্ষিণ-পুব কোণ থেকে এগিয়ে আসতে লাগলো দ্রুত লেকের উপর দিয়ে। কয়েকবার চক্কোর খেলো 'কপ্টারটা, তারপর ভালো দেখে একটা জায়গা বেছে নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে পড়লো লেকের পাড়ে। 'কপ্টারে আরোহী চারজন।

রোটর বন্ধ করে দিয়ে শহীদ খান ককপিট থেকে নেমে পড়লো। ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একে একে মি. সিম্পসন, মি. চ্যাং ফু ও গফুর।

দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি ওদের চোখে মুখে। ওরা হাত পা ছড়িয়ে লেকের ধারে মাটিতে বসে পড়লো। ওদের চোখের সামনে এক অপূর্ব সৌন্দর্য দিগন্ত উদ্ভাসিত করে আছে। মুগ্ধ হলো ওরা।

'যাক, বাঁচা গেল।'

মি. সিম্পসন পিঠের দাঁড়া সোজা করে বসলেন। শহীদ চেয়ে ছিলো একদৃষ্টে গভীর হ্রদের পানির দিকে। মি. চ্যাং ফু তার শরীর থেকে কিটস্ ব্যাগ ইত্যাদি খুলে নামিয়ে রাখলো। গফুর হেলিকপ্টার থেকে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এলো। একটা প্লেটে অনেকগুলো চিকেন স্যাণ্ডউইচ্ সাজিয়ে দিয়ে সবার সামনে রেখে দিলো। এরপর বড় থারমোফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে সবাইকে পরিবেশন করলো।

'তাহলে আজকের মতো এখানেই যাত্রা বিরতি করা যাক,' শহীদ মি. চ্যাং ফু'র মতামত জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ! এখানেই আমাদের রাতটা কাটাতে হবে। কাল ভোরে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে অজানার উদ্দেশে। কোথায় কি বিপদ লুকিয়ে আছে, কে বলতে পারে। গফুর, জিনিসপত্রগুলো সামনের ওই গুহাটার কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

সবাই মিলে ওরা গুহাটার ভিতর গিয়ে ঢুকলো। আজ রাতটা এখানেই থাকবে ওরা। গুহার ভিতর আড়ালে ওরা ক্যাম্পফায়ার করলো। নৈশকালীন ভোজ শেষ করে রাতে শোবার বিছানা করে নিলো। দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে সবার ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। চারদিকে অদ্ভুত নীরবতা। গুহার বাইরে দেখা যায় এক টুকরো আকাশ। একটা ম্লান আলো চারদিকে ঘিরে রয়েছে। এক সময় মনের অজান্তেই ওদের ক্লান্তদেহ গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো। শুধু সপ্তর্ষিটা হ্রদের পূর্ব দিগন্তে এক চোখো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

গভীর রাতে কেন যেন শহীদের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো কি যেন একটা থপ্ থপ্

শব্দে এগিয়ে আসছে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকালো। হঠাৎ তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

একি স্বপ্ন, না সত্যি?

জীবনে এমনি অনেক ঘটনা সে বহুবার শুনেছে, কিন্তু বিশ্বাস করেনি। প্রকাণ্ড একটা মানুষ, দেহটা দীর্ঘ লোমশ আবরণে ঢাকা, আজানুলম্বিত বাহু, অতি সন্তর্পণে হ্রদের দিক থেকে হেলিকপ্টারের কাছে এগিয়ে আসছে।

সে দু'হাতে চোখ দু'টো ভালো করে রগড়ে নিলো। নাহ্! স্বপ্ন নয়, সত্যি। যে হিমালয়ের তুষার মানবের কথা এতদিন শুনে আসছিল, সেই 'ইয়েতি' ওর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। তার নির্ভীক হৃদয়েও হৃৎকম্প উপস্থিত হলো।

শহীদ দু'হাতে মুখ ঢাকলো। মনে তখন তার অনেক কথার ঝড় বইছে। সে কোনদিনই বিশ্বাস করতো না, তুষার মানব বলে কিছু থাকতে পারে। ১৯৫৫ সালে একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'য়েতি' কথাটা তিব্বতের 'লাল ভালুক' কথাটার অপভ্রংশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ওরা মানুষের মতো দু'পায়ে ভর করে চলাফেরা করে।

আবার অনেকের মতে 'য়েতি' দীর্ঘ লোমশ মানুষের মতো এক অদ্ভুত জীব। ওরা হিমালয়ের 'ইয়াকের' মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করে, আর তা না পেলে মানুষ ধরে খায়।

অনেকেই নাকি এই তুষার মানবকে দেখেছে। পর্বতে আরোহণকারী শেরপাদের অনেকেই এদের গল্প করে। আর এদের পায়ের ছাপও পাওয়া গেছে বহু জায়গায়।

১৯৫১ সনে পর্বতারোহী মি. এরিক শিপ্টন পায়ের রেখা ধরে এক মাইল ধাওয়া করেছিলেন 'য়েতির' পিছনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেন মেনলুং-সি পর্বতের এক জায়গায়।

বিশেষ কথা কি, এভারেস্ট বিজয়ী স্যার এডমাণ্ড হিলারীও বিশ্বাস করেন যে 'য়েতি' আছে। এভারেস্ট বিজয়ী অন্যতম বীর শেরপা তেনজিং এক গল্পে বলেছিলেন, তাঁর বাবা সত্যি সত্যি একবার এই তুষার মানবের খপ্পড়ে পড়ে লড়াই করেছিলেন।

১৯৫৮ সনে রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক ড. আলেকজাণ্ডার জি. প্রনিন্ তো বলেই বসলেন, পামির মালভূমিতে তিনি এই তুষার মানব দেখেছেন।

এইসব তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও শহীদ তুষার মানবকে গাঁজাখুরি বলে একদম উড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু আজ সে নিজের চোখে যা দেখছে তাকে কি করে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেয়?

একটা বাঁশির মতো তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে শহীদ চোখের উপর থেকে হাত নামালো। মনে হলো ভূমিকম্পের মতো সমস্ত জায়গাটা কাঁপছে। আরেকটি 'য়েতি' প্রথমটির

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর আরেকটি…। প্রায় দশ–বারোটি হিমালয় মানব 'কপ্টারটার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। ওদের চোখে বিস্ময়। ওরা এটা সেটা নাড়াচাড়া করে দেখতে আরম্ভ করেছে। শহীদ মনে মনে প্রমাদ গুণলো।

শহীদের সাথে সাথেই বাকি সবাই কখন যে উঠে বসেছে, তা সে টের পায়নি। মি. সিম্পসন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছেন। মি. চ্যাং ফু দু'হাত একসঙ্গে জোড় করে, অর্ধ নির্মীলিত চোখে ইষ্ট নাম জপ করছেন। আর বেচারা গফুর তখন ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

হঠাৎ শহীদ দেখতে পেল, গফুরের চোখ দু'টো ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে মুখ খুলছে চিৎকার দেবার জন্যে, কিন্তু সেটা বুঝতে পেরেই শহীদ দু'হাতে গফুরের মুখ চেপে ধরলো। একটা অস্পষ্ট গোঙানী উঠেই মিলিয়ে গেল।

শহীদ ফিসফিসিয়ে বললো।

'খবরদার, গফুর। চিৎকার করলে মরতে হবে। ওরা যদি একবার টের পায়, তবে কোনো অস্ত্রই আর আমাদের বাঁচাতে পারবে না।'

'দাদামণি!'

'কি?'

কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে গফুর গোঁ গোঁ করতে করতে গুহার ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

শহীদ সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ করলো না। মি. সিম্পসন উঠে গিয়ে ফ্লাস্ক থেকে পানি নিয়ে গফুরের চোখে মুখে ছিটাতে লাগলেন।

এরপর শহীদ যা দেখলো, প্রথমে তার রোমাঞ্চ হলো, পরে সে রো মাঞ্চ হতাশায় পরিণত হলো।

তুষার মানবগুলো কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে হেলিকপ্টারের চারদিকে ঘোরাফেরা করলো। মনের আনন্দে কেউ কেউ হাততালি দিলো। আবার কলকণ্ঠে কেউবা বাঁশির মতো কণ্ঠস্বরে হেসে উঠলো।

হঠাৎ একটি তুষার মানবের ক্রুদ্ধ গর্জনে চারদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। সে শব্দ ক্রমে দূর, বহুদূর থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে লাগলো। ওর চোখে ফুটে উঠেছে তখন সাপের মতো ঠাণ্ডা আর তীক্ষ্ণ দ্যুতি।

ক্রমাগত সে হেলিকপ্টারটার উপর লাথি চালালো। তারপর সবাই মিলে সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওটার উপর।

মুহূর্তে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হয়ে গেল। দু'তিন মিনিটের মধ্যে 'কপ্টারটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললো ওরা। তারপর দূরে হ্রদের পানিতে টুকরোগুলো সক্রোধে

ছুঁড়ে ফেলে দিলো। পাঁচ মিনিট পরে তার শেষ টুকরো পর্যন্ত আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

এবার ধীরে ধীরে ওরা শান্ত হয়ে এলো। আবার থপ্ থপ্ করে ভারি পা ফেলে চললো দল বেঁধে, দূরের ঐ পাহাড়টার দিকে। যেখান থেকে জায়গাটা ঢালু হয়ে নিচের দিকে চলে গেছে দূর বনানী পর্যন্ত। এক সময় সবাই মিলিয়ে গেল সেই পাহাড়ের অন্তরালে। বাঁশির মতো হাসির তীক্ষ্ণ শব্দটা তখনও থেকে থেকে শোনা যেতে লাগলো।

কিন্তু শহীদের তখন বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্তির পথে।

শহীদ যখন সম্বিত ফিরে পেলো, সে দেখলো, মি. সিম্পসন ও মি. চ্যাং ফু'র অবস্থাও তার চাইতে ভালো নয়।

ধীরে ধীরে সে গুহার বাইরে এসে দাঁড়ালো। মৃদুমন্দ বাতাস হ্রদের পানিতে একটা হিল্লোল তুলে বয়ে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন কুয়াশার ভাবটা কেটে গিয়ে সেখানে জ্যোছনার স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে পানির বুক জুড়ে। আকাশে চাঁদটা তাকিয়ে আছে মুখখানি বাঁকা করে। আর সে আলো ভেঙে ভেঙে লুটিয়ে পড়েছে শতধা হয়ে।

শহীদ এসে আবার ঢুকলো গুহার ভিতরে।

এবার সে গফুরের দিকে মনোযোগ দিলো। গফুর এতক্ষণে চোখ মেলে তাকালো। তার প্রথম কথাই হলো, 'দাদামণি, এমন অলুক্ষণে জায়গায় মানুষ আসে?'

সভয়ে গফুর উঠে বসে। বাইরে তাকিয়ে দেখে, 'কপ্টারটা ওখানে নেই। তার বুঝতে একটুও বিলম্ব হলো না ওটার ভাগ্যে কি ঘটেছে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে গফুরের বুক থেকে।

'ওরা আমাদের ফেরবার পথটুকুও বন্ধ করে দিলো, দাদামণি। আর গিয়ে কাজ নেই। চলো আমরা যে ভাবেই হোক ফিরে চলে যাই।'

শহীদের মুখটা কঠিন আকার ধারণ করে।

'গফুর!'

গফুর চমকে ওঠে। মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে যায়।

'আমার ভুল হয়ে গেছে, দাদামণি। মাফ করে দাও।'

'শোন, গফুর। যে জন্যে এতো বিপদ তুচ্ছ করে এখানে এলাম, সে কাজ শেষ না করে একপাও নড়ছি না।'

এতক্ষণ মি. সিম্পসন ও মি. চ্যাং ফু একটিও কথা বলেননি। এবার মি. সিম্পসন মুখ খুললেন।

'মি. চ্যাং ফু, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। এখনই যাত্রার আয়োজন করুন। যে বিভীষিকা দেখলাম তা কোনদিন ভুলবার নয়।'

মি. চ্যাং ফু'র মুখে একটা করুণ হাসি ফুটে উঠলো।

'দেখুন, এরা অতিমানব। সহজে কারও কোনো ক্ষতি করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এদের ক্ষতি না করেন। সে যা হোক, আমাদের এবার যাত্রা করা দরকার। ওহে গফুর, চলো এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

যে জিনিসপত্র ওরা 'কপ্টার থেকে নামিয়ে রেখেছিল, সেগুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিলো।

নয়

মুকুলেশ্বর বান্দাসী।

পাহাড়ের ধারে ছায়াঘেরা নিবিড় বনানী। সুদীর্ঘ পাইন আর দেবদারুর ঘন বন। দু'টো দীর্ঘকায় মূর্তি এগিয়ে চলেছে মাঝখানের একটা সরু পথ ধরে। কাঁটায় কাঁটায় সমস্ত পথ আচ্ছন্ন। ফার্ন ও অন্যান্য গুল্মলতায় সমস্ত পথ ছেয়ে আছে। আর ভয়ানক পিচ্ছিল। দীর্ঘ পথশ্রমে ওরা তখন ভয়ানক ক্লান্ত।

'ভাইয়া, আর যে চলতে পারছি না।'

'হ্যাঁ! এসো এবারে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়া যাক।'

ওরা পথের পাশে একটা বড় গাছের নিচে গিয়ে বসলো।

'শোনো, মান্নান। আমার অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে নুরবক্স মানস সরোবরের ধার ঘেঁষে গুহাপথ দিয়ে এগুচ্ছে। সে বড় ভয়ঙ্কর পথ। কতদিন সে পথে কোনো মানুষ চলাফেরা করেনি তা কে জানে। তাছাড়া কত বিপদ ওর ভিতর এখানে সেখানে ওঁৎ পেতে বসে আছে। বিশেষ করে এক ধরনের বিযাক্ত সবুজ সাপ সব সময় চারদিকে কিলবিল করে। যার এক ছোবলে মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হয়।'

'কি ভয়ানক, ভাইয়া!'

'হ্যাঁ। আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এই নিখুঁত ছদ্মবেশে আমরা বার্তকের উপকণ্ঠে ঢুকবো।'

'কিন্তু সেটা তো আরও বিপজ্জনক।'

'দেখো,, মান্নান, বিপদকে যতো ভয় করবে বিপদ ততো তোমার ঘাড়ে চড়বে। আর কুয়াশা কোনদিন কোনো বিপদকে ভয় করে না।'

গাছের উপর কতকগুলো বানর কিচিরমিচির করছিল। দূরে কোথাও একটা বন-মোরগ ডেকে উঠলো। কুয়াশা মুখ তুলে তাকালো উপর দিকে। বানরগুলো ভয়ানক লাফাচ্ছে। আর সামনের দিকে ছোটো ছোটো ডাল ছুঁড়ে মারছে। এবার হঠাৎ কুয়াশা

পিছনের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল। তার হাত দশকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চলন্ত মৃত্যু।

ভয়াল দর্শন এক শ্বেত ভল্লুক দু'পায়ের উপর ভর করে এগিয়ে আসছে। এতবড় ভল্লুক কুয়াশা জীবনে কখনও দেখেনি। নিজের অজান্তেই মান্নান এক পা দু'পা করে পিছু হটে গেল।

এক মুহূর্তে মনস্থির করে নিলো কুয়াশা। লড়তে হবে। এবং খালি হাতে। গুলি ছুঁড়লেই সতর্ক হয়ে যাবে নুরবক্স, টের পেয়ে যাবে ওদের অবস্থান। আর যাই হোক, ফল তার শুভ হবে না—ছলে বলে কৌশলে চেষ্টা করবে সে ওদের হত্যা করতে। কতো লোক আছে ওর সঙ্গে কে জানে?

উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা। পিছিয়ে গিয়ে রাইফেল তুলেছিল মান্নান, হাতের ইশারায় বারণ করলো ওকে। অবাক হয়ে দেখলো মান্নান, পিঠের উপর থেকে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে কুয়াশা। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ভাইয়ার! খালি হাতে ঐ প্রকাণ্ড ভল্লুকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে নাকি সে? ভয়ঙ্কর সব বিপদের মুখে অকুতোভয় কুয়াশাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছে সে জীবনে অনেকবার। সে জানে কুয়াশার বুকের মধ্যে বাস করে এক দুর্দান্ত সিংহ, মাঝে মাঝে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। ভেঙে চুরে তোলপাড় করে দিতে চায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে—কিন্তু তাই বলে···

আর ভাবতে পারলো না মান্নান। কুয়াশার হাত তিনেকের মধ্যে এসে গেছে ভয়ঙ্কর ভল্লুকটা। কুয়াশার অপরাজেয় উদ্ধত ভাব দেখে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়লো সে একটা। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বীর বিক্রমে। ঝট্ করে সরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড এক রদ্দা মারলো কুয়াশা ভল্লুকটার ঘাড়ে। নিজের হাতেই ব্যথা পেলো সে, জন্তুটার কিছু হলো না। ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে আবার। নাকের উপর দমাদ্দম দু'টো ঘুসি খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল জন্তুটা। আরও খেপে গেছে সে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে সে ঐ বেয়াড়া দু'পেয়ে জন্তুটাকে। মান্নান জানে একবার ঐ শক্তিশালী বাহুর মধ্যে যদি জড়িয়ে ধরতে পারে তাহলে আর ছুটবার ক্ষমতা থাকবে না কুয়াশার।

হঠাৎ দেখতে পেলো মান্নান ভল্লুকটার অতর্কিত এক থাবায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল কুয়াশা মাটিতে। মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালো কুয়াশা কিন্তু পিছন থেকে জাপ্টে ধরেছে জন্তুটা। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে রাইফেল তুললো মান্নান। কিন্তু মারবে কোথায়? এখান থেকে গুলি ছুঁড়লে গুলি সোজা গিয়ে লাগবে কুয়াশার বুকে। এমনি সময় ভোজবাজির মতো কাণ্ড ঘটলো একটা। যতো বড় শক্তিশালীই হোক জুজুৎসুর জ্ঞান ছিলো না ভল্লুকটার। শূন্যের উপর এক ডিগবাজি খেয়ে দশ হাত তফাতে গিয়ে পড়লো বেচারা—মান্নানের তিন হাতের মধ্যে।

'ও বাবা গো!' বলে চোঁ চাঁ দৌড় দিলো মান্নান।

কিন্তু জন্তুটির মনযোগ তখন কুয়াশার উপর। লক্ষ্যও করলো না সে এতবড় ভারি শরীরটা নিয়ে পাথরের উপর আছড়ে পড়ায় ডান পায়ের উরুর বাইরের দিকটায় ছয় বর্গ ইঞ্চিঃ পরিমাণ চামড়া ছিঁড়ে নেমে গেছে নিচে। প্রথমে সাদা পরে লাল হয়ে গেল জায়গাটা। থপ থপ করে এগিয়ে গেল সে কুয়াশার দিকে। ফোঁশ ফোঁশ নিঃশ্বাস পড়ছে ওর, ঘড়র্ ঘড়র্ করে একটা শব্দ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে, ভয়ঙ্কর জিঘাংসায় বেরিয়ে পড়েছে চকচকে ধারালো দাঁত।

শেষ বারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো দু'জন পরস্পরের উপর। জড়াজড়ি করে পড়ে গেল মাটিতে। গড়িয়ে চলে গেল ওরা বেশ খানিকটা দূরে।

আবার সাহস সঞ্চয় করে ফিরে এসেছে মান্নান। আবার সেই দ্বন্দ্বে পড়েছে। এমন ভাবে লুটোপুটি খাচ্ছে ওরা মাটিতে পড়ে যে গুলি করবার উপায় নেই।

হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনতে পেলো মান্নান। কার মুখ থেকে এই আর্তনাদ বেরোলো ঠিক ঠাহর করতে পারলো না সে। কুয়াশার বুকের উপর তখন জন্তুটা—কারও মুখই দেখতে পাচ্ছে না ও। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ভল্লুকটা, কুয়াশাও উঠলো সাথে সাথে। মান্নান শুধু বুঝলো অদ্ভুত এক কৌশলে বেকায়দা মতো মুচড়ে ধরে আছে কুয়াশা ভল্লুকটার একটা হাত। ব্যথায় বেঁকে গেছে জন্তুটার দেহ—বিকৃত হয়ে গেছে কুৎসিত চেহারাটা। ঘাম ঝরছে কুয়াশার কপাল থেকে, সেই সাথে মিশেছে রক্তের ধারা। পরমুহূর্তেই মট্ করে একটা শব্দ শুনতে পেলো মান্নান। ককিয়ে উঠলো ভল্লুকটা অবর্ণনীয় ব্যথায়। বেকায়দা মতো এক চাপ দিয়ে ভেঙে দিয়েছে কুয়াশা ওর হাত—এবার ছেড়ে দিলো সে জন্তুটিকে। দেখা গেল কাঁধ থেকে আলগা ভাবে ঝুলছে ওর হাতটা।

একমুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ভল্লুকটা। তারপর পিছিয়ে গেল কয়েক পা। ভীতি ফুটে উঠেছে ওর ছোটো ছোটো চোখ দু'টোয়। ওর কাছে পরাজয় মানেই মৃত্যু—এক্ষুণি হয়তো আবার আক্রমণ করবে ওর চেয়েও শক্তিশালী ঐ অদ্ভুত লোমহীন ভল্লুকটা। তিন পায়ে ভর দিয়ে প্রাণভয়ে ছুটলো সে এবার। বিশ গজ গিয়ে থামলো একবার, ফিরে তাকালো কুয়াশার দিকে। একবার চাইলো নিজের রক্তাক্ত উরুর দিকে, তারপর দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল দূরের কয়েকটা পাথরের আড়ালে।

কুয়াশার দৃষ্টি সর্বক্ষণ অনুসরণ করছিল জন্তুটার গতিপথের দিকে। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। দস্তুরমত হাঁপাচ্ছে সে।

মান্নান এক দৌড়ে কুয়াশার কাছে ছুটে এলো। অপসৃয়মান জন্তুটার উদ্দেশে খানিকক্ষণ হাতপায়ের কসরত দেখালো।

'ঠিক হয়েছে, আবার লাগতে আসবি ভাইয়ার সাথে?'

তারপর কুয়াশার শরীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, 'কী অদ্ভুত শক্তি আপনার গায়ে, ভাইয়া! আপনি ভল্লুকের বাবা।'

'কি বললি? পাজী, হতচ্ছাড়া! তার মানে আমিও ভল্লুক?'

মান্নান তাড়াতাড়ি জিব কেটে বললো, 'না, ভাইয়া! আমি কি তাই বললাম নাকি! হুঁ। তবে ফের যদি লাগতে আসে তবে পাজীটাকে এমন একহাত দেখিয়ে দেবো যে, বাপধন মজাটা টের পেয়ে যাবে।'

মান্নান এবার গাছের গুড়িটার উপর এসে বসলো। কুয়াশাও মান্নানের পাশে বসলো, 'মান্নান! আমাদের সামনে হয়তো আরও বড় বিপদ থাকতে পারে, বীরত্বটা সে সময়ের জন্যে তুলে রেখে দাও।'

এবার মৃদু মৃদু হাসছে কুয়াশা। হঠাৎ পিছন থেকে কি যেন একটা আওয়াজ শুনতে পেলো মান্নান। চমকে পেছন ফিরে চাইলো।

'ও ভাইয়া। এযে দেখছি দু'টো ভল্লুকের বাচ্চা।'

কুয়াশা তাকিয়ে দেখলো, পিছনে একটা গুহার মতো। ওর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে দু'টো ভল্লুক ছানা।

'এতক্ষণে বুঝলাম, জন্তুটা হঠাৎ এতো খেপে গেল কেন? এমনিতে ওরা কাউকে আক্রমণ করে না। পিছনে ওর বাচ্চারা রয়েছে বলে রাগ সামলাতে পারেনি।'

'দেখ না, ভাইয়া, কেমন কুঁতকুঁতে চোখে তাকাচ্ছে পাজীর ছানাগুলো।'

এবার দু'জনেই খুব একচোট হেসে নিলো। যে সব জায়গায় ছড়ে গিয়েছিল, রক্ত মুছে একটা মলম লাগিয়ে নিলো কুয়াশা। মান্নান হ্যাভার স্যাক্স্ থেকে খাবার বের করে তার ভাইয়াকে খাবার দিয়ে নিজেও খেতে লাগলো।

কুয়াশা দু'টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিলো ভালুক ছানা দু'টোর দিকে। ওরা রুটি কুড়িয়ে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলো মনের আনন্দে।

আবার দীর্ঘ পথ চলা।

এক জায়গায় একটা পাথর দেখা গেল। উপরটা অনেকখানি মানুষের মূর্তির মতো। এটা কি মানুষের হাতে গড়া না প্রকৃতির নিছক খেয়াল বলা সম্ভব নয়। কুয়াশা পাথরটার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

বুকের কাছে শার্টের পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে আনলো। তারপর কি যেন মিলিয়ে দেখতে লাগলো।

কুয়াশা নিশ্চিন্ত হলো। ঠিক জায়গায় এসে পড়েছে। যদি এ পাথরটা একটুখানি

সরাতে পারে, তবে এর নিচে একটা সুড়ঙ্গ পথ পাওয়া যাবে। সুড়ঙ্গ পথে ঢুকতে পারলেই, মন্দিরের নিচে যাবার একটা রাস্তা পাবে।

বহুদূরে, প্রায় মাইল দু'য়েক চড়াই উতরাই শেষে বার্তকের তাউ মন্দিরের সোনা বাঁধানো চূড়া দেখা যাচ্ছে। সে এক নয়ন মুগ্ধকর দৃশ্য।

'মান্নান, আমাদের এখান দিয়েই নিচে নামতে হবে।'

'কিন্তু যাবো কি করে, ভাইয়া? পথ কোথায়?'

কুয়াশা পাথরটা দেখিয়ে দেয়। 'এটা সরাতে হবে।'

মান্নানের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। কি করে সম্ভব বিশ-পঁচিশ মণ ওজনের পাথরটা সরানো?

কুয়াশা পাথরটার সরু কোণের দিকে গিয়ে জোরে এক চাপ দিলো, কিন্তু পাথর যেমনটি ছিলো ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

'আসুন ভাইয়া, দু'জনে মিলে দেখা যাক।'

অনেক চেষ্টা করেও কিছু হলো না। মান্নান কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলো, তারপর উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো।

'পেয়েছি, ভাইয়া! পেয়েছি!'

'কি পেয়েছো, মান্নান?'

'হদিস পেয়ে গেছি। আসুন ডিনামাইট দিয়ে পাথরটা উড়িয়ে দিই।'

'চমৎকার! এ না হলে বুদ্ধি? ডিনামাইট দিয়ে পাথরটা উড়িয়ে দেবে। আর সেই শব্দে সমস্ত বনানীতে খবর হয়ে যাবে তোমার কীর্তিকলাপের। যে যেখানে থাকবে ছুটে আসবে, আর তোমায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাবে জামাই আদর করতে করতে। তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে, মান্নান?'

মান্নানের এতবড় প্ল্যানটা মাঠে মারা গেল দেখে সে একেবারে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। ঘর্মাক্ত কলেবরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুয়াশা পাথর সরাবার পথ খুঁজছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়লো, খানিকটা পাথর একটা লিভারের মতো বেরিয়ে আছে। কুয়াশা কি যেন দ্রুত চিন্তা করলো, তারপর একলাফে উপরের দিকে উঠে গেল।

'কি আশ্চর্য, এই সম্ভাবনাটা আমার মনে একবারের জন্যেও উদয় হয়নি!'

কুয়াশা পাথরটা ধরে ঝুলে পড়লো। পাথরটা ধীরে ধীরে খানিক নিচে নেমে এলো। পাথরের গোড়ায় খানিক জায়গা দরজার মতো ফাঁক হয়ে গেল। ভিতরে একসার সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। কুয়াশা লাফিয়ে পড়লো নিচে।

কুয়াশা মান্নানের মুখের দিকে তাকালো একবার। তারপর ঢুকে গেল ভিতরে। মান্নানও তার পিছন পিছন চললো। পাথরটা এবার উল্টোদিকে ঘুরে নিজের জায়গায়

গিয়ে থামলো। বন্ধ হয়ে গেল পিছনের দরজাটা।

এক অজানা উত্তেজনায় তখন মান্নানের সর্ব শরীর শিউরে উঠছিল। খানিকটা এগিয়ে গেলে একটা হিমেল বাতাস ওদের শরীরে এসে লাগলো। সম্মুখে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কুয়াশা তার হাতের নিওন টর্চটা অন্ করে দিলো। এক ঝলক আলো অন্ধকার ভেদ করে আগে আগে ছুটে চললো।

এই নিয়ন টর্চটা তৈরি করতে কুয়াশার অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ছোট্ট একটা সেল এ মাইক্রো জেনারেটর ফিট্ করে একটা সূক্ষ্ম তার উপরের দিকে একটা নিয়ন গ্যাস ভর্তি টিউবের সঙ্গে সংযোগ করে দেয়া হয়। একটা ছোট্ট বোতাম টিপলেই মাইক্রো জেনারেটর চালু হয়ে যায় কিন্তু রিডাকসন গিয়ার থাকাতে কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। ইলেকট্রিক এনার্জী গ্যাসে কণ্ডাকটেড হলেই একটা সুন্দর নীলাভ আলো বের হয়ে আসে।

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তারা নিচে নামতে লাগলো। তাদের মনে হলো বহুদিন যেন এ পথে কেউ চলাফেরা করেনি।

কেমন একটা গ্যাসের গন্ধ তাদের নাকে এসে লাগলো।

'গ্যাস মাস্কটা পড়ে নাও মান্নান, হয়তো আমরা কার্বন মনোক্সাইড্ বা সালফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাসে trapped হয়ে যেতে পারি।'

ওরা গ্যাস মাস্ক দু'টো বের করে পরে নিলো। আর পিঠে দু'টো করে মাঝারি আকারের 'ডিউরেলিমিনে'র সলিড্ অক্সিজেন ভর্তি বোতল পরে নিলো। এখানে ব্যাপার হচ্ছে 'ডিউরেলিমিন' লোহার চেয়ে বহুগুণে হালকা, তাই অক্সিজেন নেয়ার জন্যে কুয়াশা এই উপায় আবিষ্কার করেছে, যাতে সহজভাবে চলাফেরা করা যায়।

এমনি করে ওরা এগিয়ে চললো আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে।

দশ

একটি বিদেশী পর্বত আরোহী দল কাটমুণ্ডু থেকে যেদিন নেপালের ছাড়পত্র নিয়ে এগিয়ে চললো ধবল গিরিপর্বতের দিকে, ২৬৮১০ ফিট উঁচু শৃঙ্গ জয় করবার মানসে, সেদিন দু'জন পরিচিত শেরপা যোগ দিয়েছিল এ দলটিতে। কেউ অবশ্য তাদের চিনতো না, কিন্তু নিজেদের ফটোসহ নেপাল গভর্নমেন্টের শেরপা হিসেবে বিশেষ অনুমতিপত্র তাদের ছিলো।

কিন্তু ধবলগিরির base স্টেশনে যেদিন দলটি পৌছুলো, তারপর থেকে তাদের আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

ততক্ষণে অপরিচিত শেরপা দু'জন দুর্গম পথ বেয়ে 'মুক্তিনাথে'র উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। মুক্তিনাথ থেকে একটা ছোটো গিরিপথ চলে গেছে তিব্বতের দিকে। এই 'গয়া' গিরিপথ বেয়েই নেপাল থেকে তিব্বত প্রবেশ করা যায়। কিন্তু ভয়ানক বন্ধুর সে পথ। শেরপা দু'জন এগিয়ে চলেছে সেই পথ বেয়ে। বহু দুর্গম পথ হেঁটে অবশেষে তারা মাতসাং (ব্রহ্মপুত্র) এর পাড়ে এসে হাজির হলো। সেখানে গাছের ভেলা বেঁধে ওরা মাতসাং পার হয়ে ত্রিদামে এসে পৌঁছুলো। সেখান থেকে নদীর উৎস লক্ষ্য করে চলতে আরম্ভ করলো। অবশেষে এক সময় ওরা মানস সরোবরের পাড়ে এসে পৌঁছুলো। তখন তাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। এগিয়ে চলার মতো জীবনী শক্তিও ওদের তখন ফুরিয়ে গেছে।

'হুজুর, এবার আমাদের যাত্রা করা দরকার।'

'হ্যাঁ ভুলুয়া, এবার আমরা যাত্রা করবো।'

'উহ্! মুক্তিনাথের সেই সন্ন্যাসীর পাল্লায় যেভাবে পড়েছিলাম। আরেকটু হলে আর আসতে হতো না।'

'নাহে! সত্যিকারের বিপদ সবে আরম্ভ হয়েছে। যদি তাউ মন্দিরের পুরোহিতরা একটুও টের পায়, তবে আর ফিরে যেতে হবে না। প্রত্যেক মাসে পূর্ণিমায় ওরা বার্তক থেকে মানস সরোবরে আসে। শুধু এই তাউ পুরোহিতদের সংখ্যাই হলো প্রায় দু'হাজার। এদের কথায় তিব্বতের যে কোনো লোক জান দিয়ে দেবে। তাতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করবে না।'

'তাহলে উপায়?'

'উপায় আছে বৈকি। কুয়াশা যে নক্সাটা আমার চোখের কোটর থেকে চুরি করেছে, তার duplicate আমার কাছে আছে। ওতে একটা সুড়ঙ্গের কথা উল্লেখ রয়েছে। ওই যে উত্তর-পুব কোণে যে চূড়াটা দেখছো, ওর নিচে রয়েছে একটা গুহা। সেই গুহার ভিতর দিয়েই সুড়ঙ্গ পথটা চলে গেছে বার্তকে ঠিক তাউ মন্দিরের নিচে। সেখান থেকেই গুপ্ত ভাণ্ডারে যাবার সংযোগ রয়েছে কোনো পথের। সেটা খুঁজে নিতে হবে। এই যে যুগল সাপের মূর্তি আঁকা ছোরাটা দেখছো, এটা হচ্ছে সেই গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করবার চাবিকাঠি। এই ছোরাটা আসলে গুপ্তকক্ষের দরজার চাবি।'

'কিন্তু হুজুর, ব্যাটা কুয়াশা যে আমাদের পেছনে লেগে নেই তা কে বলতে পারে?'

এবার নুরবক্সের চোখে ধ্বক করে আগুন জ্বলে উঠলো। সে আগুন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

'কুয়াশা! কুয়াশা!! তাকে একবার এখানে দেখতে চাই। আমার অনেক আয়োজন সে পণ্ড করে দিয়েছে। এবার হাতের মুঠোয় পেলে আমি তার উচিত প্রতিশোধ নেবো।

তারপর—গুপ্তধন নিয়ে দেশে ফিরে যাবো। সেখানে নিশ্চিন্তে অমরত্বের সাধনা করবো। শয়তান! থিসিস মনে করে নক্সাটা নিয়ে গেছে। থিসিসটা পায়নি।'

নুরবক্স ভয়ঙ্কর ভাবে হেসে ওঠে। সেই নির্জন জায়গায় শব্দটা অনেকগুলো প্রতি-ধ্বনি হয়ে তাদের কাছে আবার ফিরে আসে। সেই শব্দে কতকগুলো অচেনা পাখি লেকের এদিক থেকে উড়ে গিয়ে খানিকটা দূরে বসলো।

'আসুন, হুজুর, কিছু খেয়ে নেয়া যাক।'

'দাঁড়াও আমি প্রথমে দু'একটা পাখি মেরে নিয়ে আসি। ঝলসে খাওয়া যাবে।'

নুরবক্স তার উইনচেস্টার রাইফেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সরোবরের শান্ত পরি-বেশে অশান্তির রক্ত-স্রোত বইয়ে দিতে।

নুরবক্স যখন ফিরে এলো, তার এক হাতে রাইফেল, আরেক হাতে দু'টো সাইবেরিয়ান গিজ্। ভুলুয়া হাঁস দ'টো দেখে আনন্দে উদ্‌বাহু নৃত্য আরম্ভ করলো।

'উহ্! কতদিন এরকম মাংস চোখে দেখিনি। আজকে বেশ মজা করে খাওয়া যাবে।' মুখ দিয়ে তার লালা ঝরতে লাগলো।

বেলা গড়িয়ে সূর্য যখন পশ্চিমের আকাশে অস্ত যাবার উদ্যোগ করছে, ওরা পাহাড়টার নিচে এসে দাঁড়ালো। সম্মুখে উল্লিখিত গুহাপথটা বিরাট মুখব্যাদান করে আছে। ভিতরটা গাঢ় অন্ধকার, যেন কেউ একপোচ কালি মাখিয়ে দিয়েছে তার অন্তরটায়। ভুলুয়ার মনটা ভীষণ দমে যায়। সভয়ে তাকায় নুরবক্সের দিকে।

'একটা কথা বলবো।'

'কি, ভুলুয়া?'

'এখনও সময় আছে হুজুর। চলুন আমরা ফিরে যাই।'

'ভুলুয়া!'

চমকে উঠলো ভুলুয়া। নুরবক্সের তীব্র কঠিন চিৎকারে ভয়ে কেঁপে উঠলো। সে চেয়ে দেখলো, নুরবক্সের উদ্যত উইনচেস্টারটা তার বুকের দিকে তাক করা। তাকে সাপের মতো ভয়ানক ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিল। ভুলুয়ার মাথা আপনাতেই নত হয়ে এলো।

'তাই হোক, হুজুর। আপনার সঙ্গে আমি জীবন দিতেও রাজি।'

'শোন, ভুলুয়া। যে জন্যে এতো বিপদ এতো কষ্ট সহ্য করে এতদূর এলাম, সেই গুপ্তধন উদ্ধার না করে আর ফিরে যাবো না। তাছাড়া কুয়াশার সাথে আমার হিসাব নিকাশ এখনও বাকিই রয়ে গেছে। যদি দুনিয়ার তামাম লোককে খুন করতে হয় আমি তাতে রাজি, কিন্তু পিছু হটা চলবে না।'

নুরবক্স একবার চারদিকে তাকালো। অপরাহ্নের ম্লান আলোটা গুহার সামনে এসে পড়েছে। সেদিকে শেষবারের মতো চেয়ে দেখলো সে। আবার পৃথিবীর আলো কবে

দেখবে কে জানে?

ওরা ভিতরে ঢুকে পড়লো। একটা গাঢ় অন্ধকার যেন গ্রাস করে নিলো ওদের।

কুয়াশার বুক থেকে একটা দীর্ঘ–নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। বহু দুঃসাহসিক অভিযান সে করেছে। বহু বিপদে সে পড়েছে। সাফল্যের সুবর্ণ পরশ সব সময়ই তাকে ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু এবার কেন যেন তার উৎসাহ ঝিমিয়ে আসছে, কোথায় যেন একটা নৈরাশ্য তাকে শুধু পিছু টেনে ধরছে। তবে কি—সে এতদূর সঠিক পথে এসেও শেষ রক্ষা করতে পারবে না? যতো বিপদের ঝুঁকিই তাকে নিতে হোক না কেন এগিয়ে তাকে যেতেই হবে। আজ পর্যন্ত কোনদিন সে পরাজয় বরণ করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না।

কাঁধে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে আবার নামতে শুরু করলো নিচের দিকে। মান্নান তার পিছু পিছু চলেছে সামনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে। কিছুদূর নামার পর তারা একটা সমতল গলি পেয়ে গেল। গলিটা ধরে খানিকটা এগিয়েই দেখতে পেলো মুক্ত প্রাঙ্গণের মতো জায়গা। মাথার উপরে অনেক উঁচুতে ছাদ। টর্চের আলো ফেলে কুয়াশা ছাদ দেখতে পেলো না। সেখানে গভীর অন্ধকার।

ঝির ঝির একটা শব্দ কানে আসতে লাগলো। একটা হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে তখন। দেখলো একটা ঝর্নার ধারা বয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় পানিটা জড়ো হয়ে খানিকটা চৌবাচ্চার মতো দেখাচ্ছে। দু'চারটা পাথর পড়ে আছে আনাচে কানাচে।

পিপাসায় মান্নানের ছাতি ফেটে যাচ্ছিলো। সে দৌড়ে গিয়ে আঁজলা ভরে পানি তুলে নিলো খাবার জন্যে। কিন্তু কুয়াশা তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে সে পানি ফেলে দিলো।

'সর্বনাশ! আরেকটু হলেই হয়েছিল আর কি! এ যে খুব বিষাক্ত পানি, মান্নান। এই রকম ঘোলা পানিতে থাকে সবুজ রঙের বিষাক্ত সাপ। যার ছোবলে মানুষ এক মুহূর্ত বাঁচতে পারে না। এ পানি খেয়েছো কি মরেছো।'

'বাপরে বাপ! এক শত্রুর মোকাবেলা করতে এসে দেখছি এখন বহু শত্রুর মোকাবেলা করতে হচ্ছে।'

'বিষের বাঁশরী বাজিয়েই তোমাকে অমৃত তুলতে হবে, মান্নান। ঘাবড়ালে চলবে কেন?'

কুয়াশা তার water carrier খুলে মান্নানকে পানি খেতে দিলো।

আবার কিছুদূর যাবার পরে দু'টো রাস্তা দু'দিকে চলে গেছে। কুয়াশা জায়গাটা পরীক্ষা করবার জন্যে চারদিকে টর্চের আলো ফেললো। অনেকগুলো বাদুড় উপর থেকে ঝুলছিল, আলো দেখে ভয় পেয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো।

কুয়াশা মান্নানকে সাবধান করে দিলো। 'ওই যে ওদের রক্ত–মুখ দেখছো,

ওগুলো Vampire Bats, রক্ত শোষক বাদুড়। ঘুমিয়েছ কি রক্ষা নেই। একেবারে সাবড়ে দেবে। তোমায় আর তাহলে দেখতে হবে না। এদের এলাকার বাইরে গিয়ে আমাদের বিশ্রাম করতে হবে।

কুয়াশা অনেকক্ষণ চিন্তা করলো, তারপর বাঁদিকের গলিটা ধরে এগোতে লাগলো। যেতে যেতে এমন জায়গায় গিয়ে পড়লো, সামনে কোনো পথ নেই। সম্মুখে খাড়া দেয়াল পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

থমকে দাঁড়ালো ওরা। আবার বুঝি অন্যপথে যেতে হবে তাদের। কিন্তু এবার বিশ্রামের প্রয়োজন। ওরা ওখানেই আস্তানা গাড়লো কিছু সময়ের জন্য। খুঁজে বের করতে হবে রাস্তাটা কোন্‌দিকে গেছে।

মান্নান ঘুমিয়ে পড়েছে। কুয়াশা শুধু জেগে আছে। চারদিকে বন্ধ দেয়াল, কিন্তু মনের রুদ্ধ দেয়াল খুলে গেল। মনে পড়লো বোন মহুয়াকে। যে স্নেহ থেকে সে চিরকাল বঞ্চিত, সে স্নেহের দান পেয়েছে বোনটির কাছে। জীবনের অনেক অপূর্ণতা ক্ষণিকের মাঝে ভরিয়ে দিয়েছে। চিরদিন সে স্মৃতি জাগরুক হয়ে থাকবে তার জীবনে ধ্রুবতারার মতো। সে যেন হাসি–কান্নার, সুখ–দুঃখে ভরা সহজ মানুষ হয়ে গেছে।

এমনি অনেক কিছু কুয়াশা ভাবছিল কিন্তু সে জানতেও পারলো না, তাদের ডানপাশে কোন এক গলি দিয়ে নুরবক্স এগিয়ে চলেছে। হয়তো নুরবক্সও ধারণা করতে পারেনি, তার ভীষণতম প্রতিদ্বন্দ্বী কুয়াশা তার এতো কাছে, শুধু খানিকটা দেয়ালের ব্যবধান তাদের মাঝে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে ওরা একে অপরকে ভাবছিল। কখন তাদের নাটকীয়ভাবে দেখা হয়ে যাবে তারই প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তারা মনে মনে।

উপরে তাদের শক্ত মাটি। সে মাটির বুক থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে দীর্ঘ পাইন আর দেবদারুর সারি। আকাশটা যেন থমকে দাঁড়িয়েছে লম্বা গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। সেখানে অনেক চেনা অচেনা তারার মেলা, এলোমেলো হয়ে ফুটে রয়েছে।

এগারো

নেপালের গিরিপথ বেয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে মানস সরোবর হয়ে বার্তক, তারপর পূর্ব দিকে চলেছে লাসার দিকে সে পথ অতি দুর্গম, বন্ধুর পথ।

ছদ্মবেশী মি. সিম্পসন, মি. চ্যাং কু, শহীদ আর গফুর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সেই পথ বেয়ে, যেন কোন পাহাড়িয়া কাঠুরের দল চলেছে কাঠ কাটতে।

গফুর চলেছে সবার পিছনে। বেশ ভারি একটা বোঝা তার পিঠে। কিন্তু আসুরিক

শক্তি তার গায়ে। অবলীলাক্রমে এগিয়ে চলেছে সে পাহাড়িয়াদের মতো পা টেনে টেনে।

খাম্বাজং লেকের ধারে তারা পৌঁছে গেছে। চোখের সামনেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পুণাক্ষর পাদপীঠ। আরও দূরে বার্তকের তাউ মন্দিরের হাজার স্বর্ণ–চূড়া সম্মুখে নয়নগোচর হয়ে আপন মহিমায় ঝলমল করছে। মাঝখানে আর দু'একটা চড়াই উৎরাই মাত্র। এবার ওরা গিয়ে পৌঁছুতে পারবে বার্তকে আর ঘন্টা চারেকের মধ্যেই।

তবে ভয়ানক পরিশ্রান্ত ওরা। আর মানস সরোবরের দুঃস্বপ্ন এখনও মন থেকে মুছে যায়নি।

ধীর পদে চলেছে ওরা। চলতে চলতে এক সময় চ্যাং ফু'র কান সজাগ হয়ে উঠলো। হাত তুলে ইশারা করতেই সমস্ত দলটা থেমে গেল।

মিঃ সিম্পসন তাই দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। চাপা গলায় জিজ্ঞাস করলেন, 'ব্যাপার কি, মি. চ্যাং ফু? হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন কেন?'

মি. চ্যাং ফু মুখে আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন কোনো রকম শব্দ না করার জন্যে। তারপর গিয়ে হাজির হলেন জঙ্গলের আরও গভীরে। বাকি সবাইও তাঁর পিছন পিছন গিয়ে দাঁড়ালো তাঁর পাশে।

মি. সিম্পসনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, Bamboo Telegraph (বাঁশের খবর)। বাঁশে বাঁশে আওয়াজ তুলে ওরা ওদের ভাষায় সংকেতে খবর পাঠায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। ওরা হয়তো টের পেয়ে থাকবে। দেখাই যাক না কি হয়। আপাততঃ আমাদের এখানে চুপ করে সময় কাটানো ছাড়া কোনো পথ দেখছি না।'

প্রত্যেকটি মুহূর্ত এক এক যুগ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু গফুর চুপ করে থাকতে পারলো না। মশার ভীষণ উৎপাত এ জঙ্গলটায়। ছিনে জোকের মতো লেপটে ধরেছে গফুরের গায়ে। সে চটাস্ চটাস্ শব্দে মশা মারতে থাকে। শহীদ তার এই বেয়াড়াপনায় ধমকে উঠলো চাপাস্বরে।

কিছুক্ষণ এই অস্বস্তিকর পরিবেশে ওরা নীরবে সময় কাটালো। হঠাৎ শহীদের মনে হলো বনটা কেমন যেন সজীব হয়ে উঠলো। যেন বহু চোখ একদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে আছে। ভয়ানক অস্বস্তি লাগলো তার।

এমন সময় একটা তীব্র বাঁশির আওয়াজ ভেসে এলো। তারপর তাদের সামনে যেন আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো অনেক লোক। বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত এই লোকজনের চেহারা দেখে মনে হলো লোকগুলো ভয়ানক হিংস্র। মারাত্মক রকম সব অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওরা এগুতে লাগলো।

ডাইনে তাকালো ওরা, সেখানেও বহু পাহাড়িয়া জড়ো হয়ে রয়েছে। বাঁয়ে

দেখলো সেদিকেও ফাঁক নেই। গফুর এবার পিছনের দিকে তাকিয়েই হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললো। পিছনেও বহু লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। কোনো দিকেই আর তাদের পালাবার পথ নেই।

গফুরের আক্ষেপ হলো দিদিমণিকে বোধহয় আর দেখতে পাবে না। চোখের পানি আর বাধা মানলো না।

এখান থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব জেনেও ওরা যেদিকে ভিড়টা একটু কম সেদিকে ছুটে গেল। এবার অনেকগুলো বল্লম ছুটে এসে ওদের চারদিকে ছিটকে পড়লো। অল্পের জন্য ওদের গায়ে লাগলো না। শত শত লোক ছুটে আসছে তাদের দিকে, আর বুঝি রেহাই নেই।

এর মধ্যে অগ্রগামী একটা দলের সাথে ওদের সংঘর্ষ বাধলো। ওরা একটা ঝোপের কাছে সরে এলো। শহীদ তার রিভলভারটা বের করে পর পর দু'টো গুলি ছুঁড়লো। দু'জন শত্রু ধরাশায়ী হলো। এবার সবাই হাত চালাতে লাগলো। ওদের গুলির মুখে তারা খানিকটা পিছু হেটে যেতে বাধ্য হলো। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন পাহাড়িয়া ঘায়েল হয়ে গেছে ওদের রিভলভারের গুলিতে।

গফুরও বসে নেই। তার দাদামণির পাশে দাঁড়িয়ে সেও গুলি ছুঁড়ছে। অদ্ভুত লক্ষ্যভেদ তার। কিন্তু আধঘন্টার মধ্যেই সব গুলি তাদের ফুরিয়ে গেল। রাগে দুঃখে মি. সিম্পসন হাতের রিভলভারটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ওরা এগিয়ে এলো কাছে, আরও কাছে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের উপর। যুঝবার কোনো উপায় নেই। একে একে ওরা হলো বন্দী। জয়ের উল্লাসে পাহাড়িয়া লোকগুলো চিৎকার করতে লাগলো। ঢাকগুলো বেজে উঠলো ধ্রিম ধ্রিম করে। ওদের বেঁধে চ্যাংদোলা করে নিয়ে রওনা দিলো বার্তকের পথে। লম্বা লাইনে ধীর পদে চলতে লাগলো ওরা প্রসেশন করে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সকলের সামনে একজন তাউ গুরু মশাল হাতে এগিয়ে চলেছে উচ্চস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে। ভয়ানক হিংস্র সে মুখ। প্রতিশোধের চরম প্রতিচ্ছবি সেখানে।

বার্তকের রাজপথে যখন ওরা ঢুকলো মন্দিরের সবগুলো ঘন্টা একসঙ্গে বেজে উঠলো। হট্টগোল করতে করতে অসংখ্য নারী-পুরুষ-শিশু ছুটে এসে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমিয়েছে ওদের প্রসেশন দেখতে।

ভয়ানক উত্তেজিত ওরা। ওদের আন্দোলিত হাত পায়ের ভঙ্গিতে শহীদ এটুকু বুঝতে পারছে যে, ওরা তাদের মৃত্যু কামনা করছে।

মন্দিরের সিংহদ্বার থেকে রাস্তাটা ক্রমশ ঢালু হয়ে ভিতরের দিকে চলে গেছে।

দরজার দু'পাশে দু'টো ড্রাগনের মূর্তি। শহীদ একবার উপরের দিকে চাইলো। সুউচ্চ মন্দির চূড়া। সোনার কলসীগুলো তারার আলোতে স্নিগ্ধ হয়ে আছে।

ওদের যেখানে নিয়ে এলো, সেটা মাটির একশো ফুট নিচে একটা বিরাট হলঘর। প্রায় চার হাজার লোকের জায়গা হতে পারে, এমনি বিরাট সে জায়গা। দেয়ালে দেয়ালে মশাল জ্বলছে। সম্মুখে একটা উঁচু বেদী। বেদীর মাঝখানে বিরাট অগ্নিকুণ্ড। মন্দির তৈরির পর থেকে এই আগুন জ্বলছে, কোনদিন নেভেনি। ওদের নিয়ে যাওয়া হলো ওই বেদীর সম্মুখে। সেখানে কয়েকটা থাম মাটিতে পোঁতা রয়েছে। ওদের প্রত্যেককে একেকটা থামের সাথে বেঁধে ফেলা হলো। বেদীর পিছনে বহু জায়গা, কিন্তু সেখানে কেমন একটা আবছা অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। অস্বাভাবিক পরিবেশ চতুর্দিকে। শুধু হৈ চৈ আর ঢাকের ড্রিম ড্রিম শব্দ।

একজন ভীষণ দর্শন তাউ পুরোহিত বেদীর উপর উঠে এলো। সকলের উপরেও একমাথা উঁচু সে। মাথাটা পরিষ্কার করে কামানো। কুলার মতো কান দু'টো এতবড় যে চেহারার সাথে একেবারে বেমানান। দু'টো বড় বড় সোনার বালা সে কানের শোভা বর্ধন করছে। গায়ে লম্বা আলখেল্লা।

ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে এসে ডান হাত উঁচু করে ধরলো সে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ একদম চুপ হয়ে গেল। একটা সূঁচ পড়লেও মনে হয় সে শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। সে হাত পা নেড়ে অনবরত বহু কথা জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলে যাচ্ছে, কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গ শহীদ বুঝতে পারলো না। শুধু এটুকু বুঝলো যে মৃত্যু তাদের অনিবার্য। এদিকে পুরোহিত বলে চলেছে নিজ ভাষায়,

'বার্তকের নাগরিকবৃন্দ!'

ভীষণ গর্জনের মতো তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো।

'যুগ যুগ ধরে আমাদের পিতা-প্রপিতামহের অমর আত্মারা তিল তিল করে তাদের বুকের রক্ত ক্ষয় করে যে ধনরত্ন আহরণ করে গেছেন, সেগুলো আমরা আমাদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রক্ষা করছি। কিন্তু আপনাদের জানা উচিত সেগুলো কিছু বিদেশী তস্কর অপহরণ করার চেষ্টা করছে। তার প্রমাণ আপনার সম্মুখে রয়েছে।'

'এই যে চারজন তস্কর আপনাদের সম্মুখে বন্দী অবস্থায় রয়েছে, এরা সেই সুযোগই নেবার জন্যে এসেছিল। কিন্তু আমাদের দেবতার কৃপা আমাদের উপর আছে যার জন্যে এখানে পৌঁছবার আগেই এরা ধরা পড়েছে। এদের গুলি চালনায় আমরা বহু বান্ধব হারিয়েছি। এখন এদের বিচার করা হবে।'

'আপনারা এদের বিচার করে রায় দিন কি শাস্তি এদের দেয়া হবে?'

সমবেত জনতা চিৎকার করে উঠলো। 'মৃত্যু! মৃত্যু! এদের ড্রাগনের কূপে ফেলে দিন। দেবতা তুষ্ট হবে।'

পুরোহিত দু'হাত তুললেন।

'হ্যাঁ! ড্রাগনের কূপেই ওদের উৎসর্গ করা হবে। কিন্তু তার আগে আরও ভয়ানক শাস্তি এদের দিতে হবে। তিলে তিলে হবে ওদের মৃত্যু। এতো ভয়ঙ্কর সে মৃত্যু যে লোকে শুনলে শিউরে উঠবে। আগামীকাল ওদের উৎসর্গ করা হবে ড্রাগন দেবতার পাদমূলে।'

এরপর ধীরে ধীরে পুরোহিত অগ্নিকুণ্ডের কাছ থেকে একটা অগুরু চন্দনের বাটি নিয়ে ওদের সবার কপাল চর্চিত করে দিলো। একটা ধূপদানে খানিকটা ধূপ দিয়ে আগুনটা একটু খুঁচিয়ে দিলো। ধূপের ধোঁয়ায় আর গন্ধে জায়গাটা আমোদিত হয়ে উঠলো। এবার পুরোহিত ধ্যানে বসলো অগ্নিকুণ্ডটার সম্মুখে।

আবার ঢাক বেজে উঠলো। অট্টোরোলে চতুর্দিকে কান পাতা ভার। জায়গাটায় তিল ধারণের স্থান নেই।

কুয়াশা যে জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছিলো, সেখানে একটা খাড়া দেয়াল পথ বন্ধ করে উপরে উঠে গেছে। একমাত্র ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। কিন্তু কুয়াশার অভিধানে 'পরাজয়' শব্দটা ছিলো না—বোধহয় ছাপার ভুলে।

সে চারদিকে দেখতে লাগলো। দেয়ালে দেয়ালে টোকা দিয়ে পরীক্ষা করলো। কিন্তু সব জায়গাই মনে হলো দুর্ভেদ্য। হঠাৎ কেমন যেনো সন্দেহ হওয়ায় সে কান পেতে নিচের দিকে কি যেন একটা আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করলো।

মনে হলো পাথরের নিচে কুলু কুলু রবে যেন একটা ঝর্না বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতো অস্পষ্ট সে আওয়াজ যে শোনা যায় না একেবারেই।

কুয়াশা হতাশ হয়ে গেল। ভাবতে লাগলো কি করে পাথর ভেঙে রাস্তা করা যায়। মান্নান একটা বড় ভাঙা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে জোরে জোরে পায়ের নিচের পাথরে আঘাত করতে লাগলো।

এবার কুয়াশা চেষ্টা করলো। পাথরটা নিয়ে বিপুল বিক্রমে নিচের পাথরটায় জোরে মারতে লাগলো। কিছু একটা শব্দ হলো। খানিকটা জায়গা ফেটে গেছে। অবশেষে সে জায়গাটুকু ভেঙে ফেললো। কুয়াশা ভাঙা পাথরটুকু তুলে নিলো।

এবার পানির স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলো কুয়াশা। সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে পাথরটাকে টানতে লাগলো। বেশ বড় একটা পাথর দেয়ালের অন্য দিক থেকে চলে এলো। নিচে একটা ঝর্নার পানি ভীষণ বেগে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ছুটে চলেছে।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

অত্যন্ত স্বচ্ছ সে পানি। কুয়াশা সেই পানিতে হাত দিলো। হিম শীতল পানি, কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার। আঁজলা ভরে সেই পানি বেশ খানিকটা খেয়ে নিলো।

এবার নিচের দিকে মুখ দিয়ে দেয়ালের অপর দিকটা দেখে নিলো সে। রাস্তাটা চলে গেছে আবার ঠিক ভাবেই। এবার পানি মাপলো, খুব বেশি গভীর নয়, হাঁটু পানি মাত্র। ওরা সেই পানিতে নেমে খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের ওপারে গিয়ে উঠলো।

নিয়ন টর্চটা জ্বাললো কুয়াশা। সম্মুখে ভীষণ অন্ধকার, কিন্তু উঁচু আর চওড়া রাস্তাটা অনেক প্রশস্ত হয়ে গেছে।

আরও খানিকদূর এগিয়ে গেল ওরা। এবার ঢাকঢোলের আওয়াজ শুনতে পেলো। ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হলো সে আওয়াজ। দূরে একটা মৃদু আলোর রেখা ফুটে উঠলো। ওরা এবার অতি সন্তর্পণে এগোতে লাগলো। কুয়াশা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো, যেখান থেকে খানিকটা নিচে দেখতে পেলো একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। তার সম্মুখে বসে এক ভীষণ দর্শন পুরোহিত ধ্যানে সমাহিত। আগুনের আভায় সে মুখ আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

একি! থামে বাঁধা রয়েছে কারা? মি. সিম্পসন যে! ওদিকে শহীদ ও গফুরও রয়েছে। আর মাঝখানে ওই চীনাম্যানটা কে? এইবার মনে পড়ছে। পিকিং-এ দেখেছে তাকে। গুপ্ত পুলিসের বড় সাহেব মি. চ্যাং কু। এতক্ষণে তাহলে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শেষ রক্ষা করতে পারেনি ওরা। ধরা পড়ে গেছে পাহাড়িয়াদের হাতে।

কুয়াশা ও মান্নান এগিয়ে এসে বেদীর পিছনে একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়েছে। কিছু নিচে বিরাট হলঘরে কয়েক হাজার লোক উৎসব মুখরিত।

এরা এসেছিল কুয়াশাকে বন্দী করতে, কিন্তু ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, নিজেরাই ধরা পড়ে গেল।

কিন্তু কুয়াশা তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না। বিবেকের দংশনে সে জর্জরিত হবে তাহলে। যেমন করে হোক ওদের বাঁচাতেই হবে। তারপর দেখা যাবে মি. সিম্পসনের শক্তি কতখানি। সে মোটেও পরোয়া করে না ওই আই. বি-র জাঁদরেল বড় সাহেবটাকে।

কুয়াশা এক সময় ভেন্ট্রিলুকুইজম শিখেছিল অত্যন্ত যত্নের সাথে। শহীদের মনে হলো কে যেন তার কানের কাছে মুখ রেখে কথা বলছে।'

'শহীদ, **Don't lose your heart, my friend!** আমি তোমার কাছেই আছি।',

শহীদ চমকে ফিরে তাকালো. এ যে কুয়াশার কণ্ঠস্বর! **Good. God!** সত্যি

 www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

কুয়াশা তাদের কাছে আছে?

এবার মনে পড়লো তার পিকিং-এর কথা। মি. চ্যাং ফু'র অফিস থেকে বেরোবার সময় একজন চীনাম্যান চকিতে সরে গিয়েছিল। চেনা চেনা মনে হলেও সে মুখ চিনতে পারেনি। এবার মনে পড়লো, সে মুখ কুয়াশার।

একটা আরামের নিঃশ্বাস তার বক্ষ ভেদ করে উপরের দিকে উঠে এলো। সে চাপাস্বরে সিম্পসনকে খবরটা জানালো। গম্ভীর হয়ে গেলেন সিম্পসন। শহীদ আর কিছু বললো না। কিন্তু কি জানি কেন, মি. সিম্পসন খবরটা শুনে হঠাৎ উৎসব মুখরিত পাহাড়িয়াদের মাথার উপর দিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বারো

জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে কুয়াশা, যেখান থেকে মোড় ঘুরবার আর কোনো পথ নেই। অর্থাৎ তার মিশনের সবে মাত্র আরম্ভ। যে উদ্দেশ্যে তার এতদূর আসা, এখন তার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। একদিকে শহীদ খান প্রমুখরা বন্দী, অন্য দিকে বিরাট তাউ সম্প্রদায় তার পথে দুর্জয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নুরবক্স এখন কোথায় কে জানে। হয়তো আশেপাশেই ওৎ পেতে বসে আছে। কিন্তু নুরবক্স এখন থাক। আগে শহীদদের মুক্ত করতে হবে।

বেদীর পিছন দিকটায় কিছুটা জায়গা কার্নিশের মতো বেরিয়ে রয়েছে। ওখানটায় জমাট অন্ধকার। কুয়াশা মান্নানকে সাথে নিয়ে সেই কার্নিশটায় এসে দাঁড়ালো।

উৎসব শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত লোকজন চলে গেছে যে যার জায়গায়। সমস্ত হলঘরটা খালি। শুধু নিবু নিবু মশাল থেকে কিছুটা আলো অন্ধকার দূর করবার চেষ্টা করছে। বেদীর উপর পুরোহিত তেমনি ধ্যানে সমাসীন। ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী এবার চোখ খুললো। চোখ দু'টো অঙ্গারের মতো জ্বলছে। রোষ কষায়িত নয়নে একবার দেখে নিলো শহীদদের।

তারপর উঠে দাঁড়ালো। কোমর থেকে দীর্ঘ একটা ছোরা বের করে প্রথমে সে এগিয়ে গেল শহীদের কাছে। সভয়ে শহীদ চোখ বুজলো। আর বুঝি রক্ষা নেই।

সেই মুহূর্তে কুয়াশা লাফিয়ে পড়লো বেদীটার উপরে। পুরোহিত এবার দেখতে পেলো কুয়াশাকে। সে শহীদকে ছেড়ে কুয়াশার দিকে অগ্রসর হলো।

পরস্পর পরস্পরকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিলো। এতদিনে বোধহয় ওরা যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছে।

'তাহলে তুমিই হচ্ছো পালের গোদা। তোমার জন্যেই আমাদের এ অবস্থা। তবে

মরো হতভাগা।'

কুয়াশা কথাগুলো বুঝলো না কিন্তু ভাবার্থ সে ঠিকই বুঝে নিলো।

পুরোহিত সাঁই করে তার হাতের ছোরাটা ছুঁড়ে মারলো কুয়াশার দিকে। সেই মুহূর্তে যদি কুয়াশা একটু সরে না দাঁড়াতো তবে ছোরাটা আমূল বিদ্ধ হতো তার বুকে। কিন্তু ছোরাটা গিয়ে লাগলো মি. সিম্পসনের মাথার উপরে থামটার গায়ে।

নিরস্ত্র পুরোহিতের সামনে এগিয়ে এলো কুয়াশা। হাতের মুঠোয় ধরা রিভলভারটা পকেটে রেখে দিলো।

কুয়াশার প্রচণ্ড এক মুষ্ট্যাঘাতে পুরোহিত পিছন দিকে ঢলে পড়লো। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। আহত বাঘের মতো আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়লো কুয়াশার উপর।

কুয়াশা এবার তার তলপেটে বাঁ হাতের আর একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত যোগ করলো। পুরোহিত বেদনায় নীল হয়ে মাটিতে বসে পড়লো। কুয়াশা তার ঘাড়ে দু'হাতের এক বিরাশী সিক্কার রদ্দা ঝাড়লো। পুরোহিতের তখন চোখে শর্ষে ফুল দেখার মতো অবস্থা। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল কুয়াশার পায়ের উপর। সে পুরোহিতকে টেনে তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলো কিন্তু দাঁড়াতে পারলো না সে। কুয়াশা দু'হাতে তাকে অবলীলাক্রমে শূন্যে তুলে নিলো। এক মুহূর্ত চিন্তা করলো, তারপর তাকে সেই বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আবহমানকাল থেকে যে আগুন জ্বলছে, সে গ্রাস করলো কুল-পুরোহিতকে।

এবার মান্নান এসে কুয়াশার পাশে দাঁড়ালো।

'মান্নান, তুমি তাড়াতাড়ি গফুরের হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দাও। দেরি করলে যে কেউ চলে আসতে পারে। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারপর, শহীদ, তোমাদের খবর কি? হ্যাল্লো, মি. সিম্পসন—আমার ভয়ানক দুঃখ হচ্ছে আপনাদের জন্যে। এতো চালাক মানুষ হয়ে এতো বোকামি করতে পারেন তা ভাবতেই পারিনি।'

মি. সিম্পসন সে কথার কোনো জবাব দিলেন না।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। গফুরকে মান্নান মুক্ত করে দিয়েছে। আমরা চলে গেলে সে তোমাদের বাঁধন খুলে দেবে। শহীদ, এই রুট ম্যাপটা রেখে দাও, ঐ গুপ্ত দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে, তারপর এই ম্যাপ অনুযায়ী রাস্তা খুঁজে নিও। তা' হলে নিরাপদে দেশে ফিরতে পারবে। হ্যালো, মি. চ্যাং ফু। আপনার জন্যে রইলো অভিনন্দন। তবে একটা কথা হচ্ছে, কুয়াশাকে কোনদিন under-estimate করবেন না। আশা করি সে কথাটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন? O.K. Good bye to everybody. গফুর তুমি সাহেবদের বাঁধন খুলে দাও চট করে।'

অসহায় মি. সিম্পসনের চোখের সামনে কুয়াশা মান্নানকে নিয়ে চলে গেল গুপ্ত পথ

ধরে। সিম্পসন বিরক্ত হয়ে গফুরকে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি বাঁধনগুলো খুলে দাও।'

কিন্তু শহীদের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে এক কৃতজ্ঞতা বোধ। এভাবে বিপদের সময় কুয়াশা তাকে কয়েকবারই রক্ষা করলো।

মি. চ্যাং ফু মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন এতক্ষণ ধরে এই অসীম বলশালী মহৎ লোকটিকে। শ্রদ্ধায় তাঁর সমস্ত অন্তর ছেয়ে গেল। নিজের বিপদকে তুচ্ছ করে, যে শত্রুকে এভাবে বাঁচাতে পারে সে সত্যিই মহৎ। তিনি কুয়াশার উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। 'ধন্য কুয়াশা!'

'দেখ মান্নান, পেছনে শত্রু সম্মুখেও শত্রু রয়েছে, সুতরাং সাবধানে আমাদের এগোতে হবে। নুরবক্সকে যে ভাবে হোক আমাদের ধরতে হবে। কারণ ওর কাছে রয়েছে গুপ্তধনের চাবিকাঠি। যে যুগল সাপ আঁকা ছোরাটা রয়েছে তার কাছে ওটা আমাদের হাত করতে হবে।'

'কিন্তু সে শয়তানকে আমরা খুঁজে পাবো কোথায়?'

'ধীরে, বন্ধু ধীরে। নুরবক্স আর যেখানেই থাক আমাদের ধারে কাছেই রয়েছে। সে চায় গুপ্তধন। সুতরাং গতি তার নির্দিষ্ট পথেই। তাকে পেতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না।'

ওরা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলে সুড়ঙ্গ পথে। যে জায়গাটায় দু'টো পথ দু'ধারে চলে গেছে, কুয়াশা বেছে নিয়েছিল ডান দিকের পথটা। এবার ওরা বাঁ দিকে চলতে আরম্ভ করলো। অতি সন্তর্পণে ওরা এগিয়ে চলেছে। এক জায়গায় গলি পথটা ছোট হয়ে এলো অনেকখানি। হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হবে এ পথে। ওরা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল সেই জায়গাটায়। দু'ধারে অনেক পাথর কাঁটার মতো বেরিয়ে আছে। হাত–পা ছড়ে গেল তাদের অনেক জায়গায়, তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই। কুয়াশা মনে মনে হিসেব করে দেখলো একটা কিছু। আর এক ফার্লং মাত্র। তারপরই তারা আজীবন সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের সম্মুখে গিয়ে পৌছুবে। একথা মনে করে তাদের সমস্ত ক্লান্তি আর অবসাদ এক মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল।

আরেক মোড় ঘুরতেই গলিটা আবার বড়ো হয়ে এলো। কুয়াশা দেখতে পেলো দু'টো ছায়ামূর্তি স্থির হয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে হাতের ইশারায় মান্নানকে থামিয়ে দিলো। দাঁতে দাঁত চেপে কুয়াশা সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো তার অতীতের সহচর নুরবক্স ও ভুলুয়ার কীর্তিকলাপগুলো।

ইচ্ছা করলে কুয়াশা এক মুহূর্তেই শেষ করে দিতে পারে ওদের, কিন্তু তা সে করবে না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। অপেক্ষা করবে। দেখবে নুরবক্সের দৌড়

কতখানি! তারপর এমন শিক্ষা দেবে তাকে, যা আমরণ সবার মনে থাকবে।

নুরবক্স হঠাৎ উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো।

'পেয়েছি, ভুলুয়া, পেয়েছি! চেয়ে দেখ আমাদের সামনে সেই গুপ্তকক্ষের দ্বার। একবার এর ভেতরে ঢুকতে পারলেই—ব্যাস্! তারপর সারা জীবন পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে খেতে পারবি। হাঃ হাঃ হাঃ!'

নুরবক্স পাগলের মতো হাসতে আরম্ভ করলো।

'কুয়াশা তুমি এখন কোথায়? তোমায় কাঁচকলা দেখিয়ে এতসব ধনরত্ন আমিই ভোগ করবো। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'

হঠাৎ ভুলুয়ার আর্তচিৎকারে নুরবক্স সংবিৎ ফিরে পেলো। অনেক বিস্ময় তখন তার জন্যে জমা হয়েছিল। এক জোড়া সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সম্মুখে। সবুজ তাদের গায়ের রঙ। চোখ দু'টো কাঁচের মতো স্বচ্ছ অথচ ক্রূর। সেই চোখে তাদের দিকে চেয়ে দেখছে, আর ভয়ানক রাগে ফুঁসছে। যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত ওদের সামনে দাঁড়িয়ে। ওদের প্রতি নিঃশ্বাস যেন আগুনের ঝলক্। একটা মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন জীবন্ত হয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সাপ যে এতবড় হতে পারে সেটা কল্পনার বাইরে। ওরা যেন বংশ পরম্পরায় এখানে বাস করছে এমনি যুগলভাবে, যুগ যুগ ধরে।

এক মুহূর্তে নুরবক্স মন স্থির করে ফেললো। রাইফেলটা তুলে নিলো হাতে, অব্যর্থ লক্ষ্য। কিন্তু তখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে।

বিকট গর্জনে একটা সাপ এগিয়ে আসতে লাগলো ওদের দিকে। রাইফেল ছুঁড়তে পারলো না নুরবক্স।

হঠাৎ একটা ভয়ানক ঝাপটা এসে লাগলো ওদের গায়ে। মুহূর্তে যেন প্রলয় হয়ে গেল। গাঢ় অন্ধকার। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল নুরবক্স বুঝতেই পারলো না। আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে।

ভুলুয়া তখনও দাঁড়িয়ে। ভয়ে সে কাঁপছে। কিন্তু ক্ষমাহীন কয়েকটা ছোবল এসে পড়লো তার বুকে। একটা আর্তচিৎকার করে উঠলো ভুলুয়া। তার মৃতদেহটা লুটিয়ে পড়লো নুরবক্সের পাশে।

কুয়াশার চোখের সামনেই ঘটে গেল সবকিছু। এবার সে তুলে নিলো তার রাইফেলটা। পর পর দু'টো গুলি ছুঁড়লো। গুলি দু'টো তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছে। সাপ দু'টো লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। কয়েকবার ওরা মাথা তুলবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না।

'অদ্ভুত! আশ্চর্য! চোখে দেখেও যে বিশ্বাস করা যায় না। এরা এভাবে যক্ষের মতো জায়গাটা আগলে বসে ছিলো এতদিন!' মান্নান তার বিস্ময় চাপতে না পেরে বলে

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

উঠলো।

কুয়াশার স্বর গাঢ় হয়ে আছে। 'ঠিক তাই, মান্নান। অনেক কল্পনা আমরা অলীক বলে হেসে উড়িয়ে দিই, কিন্তু একদিন হয়তো সে সত্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সে জন্যে কিছুই এক কথায় উড়িয়ে দেয়া উচিত নয়।'

কুয়াশা এগিয়ে গেল। নুরবক্সের কোমরে সে সাপের যুগল মূর্তি আঁকা ছোরাটা দেখতে পেলো। ভয়ানক দেখাচ্ছে ছোরাটা। মাটিতে যে সাপ দু'টো মরে পড়ে আছে, ছোরাটায় যেন তারই প্রতিচ্ছবি। ছোরাটা হাতে নিয়ে কুয়াশা এগিয়ে যায় দরজাটার কাছে। মান্নানের হাতে জ্বলছে নিয়ন টর্চটা। দরজার উপরে খোদাই করা রয়েছে যুগল সাপের একটা মূর্তি। অদ্ভুত ভাবে কুয়াশা তাকিয়ে থাকে পাথরে খোদাই করা গাঢ় লাল রঙয়ের মূর্তিটার দিকে। ঠিক যেন তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মূর্তিটার সমস্ত গা বেয়ে।

একটা আতঙ্ক শিহরণ ঢেউ খেলে গেল মান্নানের সর্বশরীরে।

চাবির গর্তটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না কুয়াশার। সে হাতের ছোরাটা ঢুকিয়ে দিলো সেই গর্তটার ভিতর। সামান্য একটু চাপ দিতেই দরজার মাঝখানে একটু ফাঁক হয়ে গেল। কুয়াশা সেই জায়গায় দু'দিকে দু'হাতে চাপ দিলো। মনে হলো দরজাটা যেন কতগুলো চাকার উপর গড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। আর একটু চাপ দিতেই সুন্দর ভাবে দু'দিকের দেয়ালে দরজাটা দু'ভাগ হয়ে মিলিয়ে গেল

এক নয়নাভিরাম দৃশ্য অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে। বেশ বড় রকমের চৌকোণা একটা ঘর। ঘরের চতুর্দিকে যেনো দ্যুতি ফুটে বেরুচ্ছে।

বহু বছরের সঞ্চিত মণিমুক্তা চারদিকে থরে থরে সাজানো; অন্ধকারেও তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। কুয়াশা ধীর পদক্ষেপে কক্ষের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। মান্নান পাগলের মতো মুঠো মুঠো হীরা ছড়াতে লাগলো চারদিকে।

কুয়াশার মনে পড়লো নীল নদের কথা। সম্ভ্রান্ত বংশের নষ্টা মেয়ে জেবা ফারাহর বোন দীবা ফারাহর কথা। ম্যান ট্রাপের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল এই দীবা ফারাহ।

রাজা অ্যামন হোটাপের শয়ন মন্দিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে তার প্রেতাত্মা। কুবেরের ঐশ্বর্য ছিলো মিশরের সেই পিরামিডের নিচে। সমস্ত ধনরত্নই পেয়েছিল কুয়াশা। গোগীর কথা মনে হলো তার। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে হয়েছে গোগীকে তার নিজের হাতে। গোগী অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিল তার দিকে।

কিন্তু এখানে যে প্রচুর ঐশ্বর্যের সন্ধান সে পেলো, রাজা অ্যামন হোটাপের ধনরত্ন সে তুলনায় কিছু নয়। অতুলনীয় এ ধনভাণ্ডার। এ রকম দামী মণি-মুক্তা কুয়াশা জীবনে কখনও চোখে দেখেনি।

কতক্ষণ ওরা সেখানে দাঁড়িয়েছিল বলা যায় না। হঠাৎ একটা বিষণ্ন কান্না গুমরে উঠতে লাগলো চারদিকে। কুয়াশা একমনে দাঁড়িয়ে শুনলো কান্নাটা, যেন চারদিকের দেয়াল গুমড়ে মরছে. 'আমাদের মুক্তি দাও! মুক্তি দাও অভিশপ্ত বন্দীশালা থেকে।'

কুয়াশা বিরাটকায় চারটে ব্যাগ বের করলো তার হ্যাভারস্যাক্‌স্‌ থেকে। ধীরে ধীরে ওগুলো পূরণ করলো সাত কুবেরের ধন, মণিমুক্তা দিয়ে। ছোরাটা সে কোমরে রেখে দিলো। শেষবারের মতো চারদিকে চেয়ে দেখলো, তারপর বাইরে বেরিয়ে এলো মান্নানকে নিয়ে। একটু টান দিতেই দরজা আবার যথাস্থানে এসে বন্ধ হয়ে গেল।

ওরা এগিয়ে চললো। মৃত ভুলুয়ার কাছে পড়ে থাকা নুরবক্সের অচেতন দেহটা একবার পরীক্ষা করে দেখলো কুয়াশা। শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে ধীরে ধীরে।

'O.K. মান্নান, ও ঠিক হয়ে যাবে।' ব্যাগ থেকে খানিকটা খাবার নুরবক্সের পাশে রেখে দিয়ে কুয়াশা যাত্রার উদ্যোগ করলো।

'নুরবক্স। ভাগ্যের হাতে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি, তোমার অসহায় অবস্থার সুযোগে তোমায় আমি হত্যা করবো না। যদি কোনদিন আবার সুযোগ আসে সেদিন তোমায় দেখে নেবো।'

ধীর পদে ওরা এগিয়ে চললো একটা মূর্তিমান বিভীষিকা পিছনে ফেলে।

শহীদ খান ড্রয়িংরুমে বসে গল্প করছিল কামালের সাথে।

'তাহলে কুয়াশা এবারও বাজিমাত করে দিল? আর তোরা তাই চেয়ে চেয়ে দেখলি। আর নীরবে সবটুকু অপমান হজম করে নিলি?'

'নারে, পাগলা। এতে মান-অপমানের কি আছে? আর এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে যে একা সংগ্রাম করতে পারে তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। কুয়াশা আমার চোখে এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

"রেখে দে তোর কৃতজ্ঞতা, আমি গেলে খালি হাতে কখনও ফিরতাম না, কিছু একটা করেই আসতাম।'

শহীদ এবার ফোড়ন কাটলো।

'হে বীর পুঙ্গব! সেটা বার বার পরীক্ষিত হয়ে আছে।'

মহুয়া এসে ঘরে ঢুকলো। পিছনে গফুরের হাতে ট্রে। ওতে একগাদা খাবার নিজের হাতে তৈরি করে নিয়ে এসেছে মহুয়া।

'কি পরীক্ষিত হয়ে আছে, কামাল ভাই?'

'সে আর তোমার শুনে কাজ নেই, মহুয়াদি। যে জিনিস সামনে এনে ধরেছো সেটা পরীক্ষা করতেই এখন আমি বেশি উৎসুক হয়ে পড়েছি।'

কামাল খাবারের উপর ঠিক আর্টিলারি কামানের মতোই আক্রমণ করে বসলো।

'তোর ছোট দিদিমণিকে ডেকে দে, গফুর।' মহুয়া গফুরের দিকে ফিরে বললো। সে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর গফুর আবার যখন ঘরে ঢুকলো, তার হাতে একটা প্যাকেট আর তার সঙ্গে একটা চিঠি।

'একটা লোক এসে দিয়ে গেল, দাদামণি, তোমাকে দেবার জন্যে।'

চিঠিটা শহীদ নিয়ে নীরবে পড়লো, তারপর কামালের হাতে দিলো। কামাল দেখলো কুয়াশার লেখা চিঠি।

'প্রিয় শহীদ,

যা চেয়েছিলাম, পেয়েছি। নুরবক্স বেঁচে আছে। সামান্য উপহারটুকু মহুয়ার জন্যে পাঠালাম, গ্রহণ করতে বলো।

ইতি—

কুয়াশা।'

কামাল চিঠিটা ফেরত দিলো শহীদের হাতে। প্যাকেটটা খুলে ফেললো কামাল। সুদৃশ্য কারুকার্য করা ভেলভেটের একটা বাক্স বেরিয়ে এলো।

বোতামটায় একটু চাপ দিতেই বাক্সের ডালাটা খুলে গেল। একটা নিরুত্তাপ দ্যুতি ঠিকরে বেরিয়ে এলো ভিতর থেকে।

শহীদ চেয়ে দেখলো, ভেতরে সুন্দর করে বসানো রয়েছে একটা বড় আকারের পদ্মরাগমণি।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Groups :www.facebook.com/groups/boiliverspolapan

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan